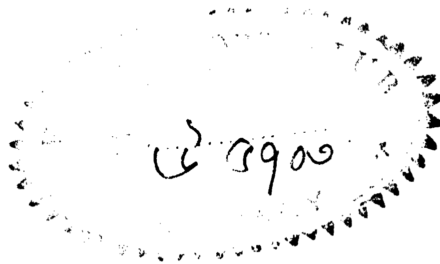
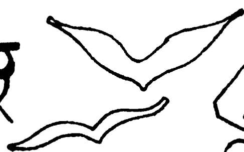
রঙকুট

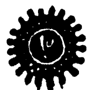


বরেন বসু



রঙরুট



নবপত্র  প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৫০

প্রথম নবপত্র প্রকাশ : জুন, ১৯৮২

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : সন্তোষ দাস ঘোষ
প্রিণ্টারস্ কর্ণার
৪৫এ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

পঁচিশ টাকা

RONGROOT
By
BAREN BASU

মনে পড়ে

ভাবতে অবাক লাগে। নিজেকে না জানিয়ে না বুঝিয়ে চোখের সামনে দিয়ে দিনগুলো কেমন লাফাতে-লাফাতে চলে গেল। সেদিনের সেই তাজা দিনগুলো আস্তে আস্তে কেমন ধূসর হয়ে গেল। তবু মাঝে-মাঝে জীবনের সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নেমে যেতে ইচ্ছে করে। যেমন করছে আজ—বরেন বসুর 'রঙরুট' প্রকাশের মুহূর্তে। একবারের জন্যে হলেও সেদিনের সেই তাজা দিনগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। পার্ক সার্কাসের ভোরের রোদ্দুর-মাখা সেই ঘর আর ঘরের বাসিন্দা শান্ত ঋজু দৃঢ় একটি মানুষ—বরেন বসু।

সেদিনের দিনগুলো ছিল গনগনে আগুনে সেঁকা। চোখে মুখে স্বপ্ন, স্বপ্ন ভাঙার অভিশাপ তখনো আমাদের উপর বর্ষেনি। প্রথম 'রঙরুট' প্রকাশের কিছুদিন পরের কথা। আমরা একদল তরুণ বরেন বসুর মন্ত্রশিষ্য। বাংলা সাহিত্য জগৎকে তোলপাড় করছিল ঐ একটি উপন্যাস। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পটভূমিকায় সৈনিক জীবনের কাহিনী।

স্বভাবে বরেন বসু লাজুক। প্রশংসায় গুটিয়ে যেতেন। উজ্জ্বল চোখের কোণে কেমন যেন একটা অভিমানের হাসি ফুটে উঠত। তারপর একে একে দেশের সীমানা পেরিয়ে যখন বিদেশের পথে পাড়ি দিল 'রঙরুট', তখনো তার স্রষ্টাকে একটুও বিচলিত হতে দেখি নি। ভারতের প্রায় সব ভাষার প্লাবন ডেকে একে একে ইংরাজী, ফরাসী, রুশ, জার্মান, চীনা, চেক, আরো কত ভাষায় আত্মপ্রকাশ করল অমর স্রষ্টার অমর সৃষ্টি। রোদ্দুরমাখা পুবের ঘরে সেই মানুষটি তখনো শান্ত, গম্ভীর, নীরব।

হে চৈয়ের পালা ছিল আমাদের। আমারই বেশি। কেন জানি না সবাই ভাবত আমি তার সহোদর। মনে মনে হাসলেও প্রকাশ্যে আমি কিন্তু অস্বীকার করতাম না। আর আশ্চর্য সেই মানুষটিও। তিনিও ঠোঁটের কোণে হাসি ঝরিয়ে নিশ্চুপ থাকতেন। মনে মনে অবশ্য সেদিন জানতাম, আজও জানি, সহোদরের চেয়েও তিনি ছিলেন আরও আরও কাছের, আরও অন্য কিছু। মনের গভীরের গভীরে ছিল তাঁর স্থান।

আজ এই হিমশীতল জীবনের পরিবেশে এই মুহূর্তে নিজেকে একবার নেড়ে-চেড়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। কান পাতলেই সেদিনের সেই জীবনের স্পন্দন অনুভব করছি। যদি কখনো কোনোদিন আমার মাঝে কোনো উত্তাপের সন্ধান মেলে তবে নিশ্চিতভাবে সেখানে স্পর্শ পাওয়া যাবে একটি মানুষের—বরেন বসুর।

ভয়ে এখনো শিউরে উঠি। আশ্চর্য ঐ মানুষটিকে একটি কঠিন ব্যাধি কীভাবে অক্টোপাশের মতো আষ্টেপৃষ্টে আঁকড়ে ধরেছিল। দম-আটকানো, শরীর-দোমড়ানো সেই ব্যাধির নাম ব্রঙ্কাল অ্যাজমা। আর সেই ব্যাধির কবলেই নিজেকে সঁপে দিতে হল শেষ পর্যন্ত।

ছেড়ে যাওয়ার বেদনার সুর প্রতিনিয়তই আমাকে বিব্রত করে, বিধ্বস্ত করে। তবু জীবনে জীবন যোগ করা সেই মানুষটির ছবি আমাকে আজও উজ্জীবিত করে। মুহূর্তের জন্যে হলেও আগুনের তাপ গায়ে লাগে। মৃত্যু যখন শিয়রে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিচ্ছে তখন বরেনদা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন বাংলা ভাষার গর্ব এই 'রঙরুট' উপন্যাস, দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমি যেন পাঠকের কাছে আবার পেঁাছে দিই তাঁর এই অমর সৃষ্টি। আজ সেই দায়িত্ব পালন করতে পেরে নিজেকে বড় হালকা মনে হচ্ছে। আমার সামান্য দায়িত্বের এখানেই সমাপ্তি।

সত্যিই আজ আমি মুক্ত, আজ আমি তৃপ্ত। 'রঙরুট' প্রকাশে এতকাল আমি ছিলাম দর্শক। সেদিনের সেই দর্শক ছেলেটি আজ পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। অসংখ্য পাঠক-দর্শকের কাছে দু হাত পেতে আজ প্রার্থনা করি আশীর্বাদ। আশীর্বাদে ভরে উঠুক করতল। সকলের আশীর্বাদে ধন্য হোক আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা। 'রঙরুট'-এর মৃত্যু নেই। 'রঙরুট' দীর্ঘজীবি হোক।

প্রসূন বসু

"মস্কো হো গয়া—হিট্‌লার্‌ মস্কো লে লিয়া—"

চলন্ত বাসের মধ্যে যাত্রীরা হেঁকে ওঠে "এই টেলিগ্রাফঅলা ইধর্‌—"

গাড়ী থামল বৌবাজারের মোড়ে। হকারের দল বাসখানাকে ছেঁকে ধরেছে। কণ্ডাক্টর ইতিমধ্যে টাইম নোট করিয়ে ঘন্টি মেরে দেয়। হকারের দল আর একটা ট্রামের পেছনে ধাওয়া করে—জনকয়েক লাফ মেরে চিৎকার ক'রে ওঠে, "মস্কো খতম—হিটলার ইণ্ডিয়া আ রহা"—

বাসের মধ্যে জন দুই কাগজ কিনেছে। ঠুলি লাগানো আলোর তলায় বসে কাগজ পড়ার যথেষ্ট অসুবিধে। তা বললে কি হবে, আশপাশ থেকে আরও কয়েকজন কাগজটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। হেড লাইনটা দেখে নিয়ে এক ভদ্রলোক মরুব্বীয়ানা চালে বলে উঠলেন, "আরে মশাই চাষাভুষোর জারিজুরি আর কতদিন! লড়তে গেছে কিনা জার্মানির সঙ্গে! মস্কো খতম মানে তো ইণ্ডিয়ায় আসার পথ পরিষ্কার—"

"এলেই তো বাঁচি দাদা—এই কলুর ঘানি যে আর টানতে পারি না! আসুক একবার হিটলার, তখন শালাদের কে বাঁচায় তাই দেখব!"

"ঠিক বলেছেন দাদা, বেটাদের মুরোদ তো কত! নিজেদের দেশই সামলাতে পারে না, আবার ইণ্ডিয়াকে সামলাবে! স্লিট ট্রেঞ্চ কেটে আর ব্ল্যাক-আউট ক'রে বসে থাকলে যেন কেউ দেখতে পাবে না! শুনতে পাই লণ্ডন তো গড়ের মাঠ হয়ে গেছে—"

"আরেঃ, তাও বুঝি জানেন না। আমাদের বড় সাহেব প্যাসেজ বুক করেছিল প্রায় মাসতিনেক আগে। আজ আমি গিয়ে টাকা ফেরৎ নিয়ে এলুম। বাছাধনদের আর 'হোমে' ফিরতে হচ্ছে না।"

বাসের কোণে, যে জায়গাটা সবচেয়ে অন্ধকার, সেখান থেকে প্রবীণ গোছের এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ মশাই, মস্কো কি সত্যিই ফল্‌ করল নাকি?"

একজন টিটকারি দিয়ে উঠলেন, "তাতে আপনার কি পাকা ধানে মইটা যাচ্ছে শুনি?"

প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন "তা একটু যাচ্ছে বৈকি! রাশিয়া হেরে গেলে আর হিটলার এখানে এলেই যদি স্বাধীন হয়ে যেতুম, তাহলে মোটেই আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে কেন, হিটলার ব্রিটিশেরই মাসতুতো ভাই, আমাদের কেউই নয়—"

বিজয় উল্লাসে কেমন যেন ভাঁটা পড়ে যায়। জনকয়েক বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে প্রবীণ ভদ্রলোকের দিকে বারেক চেয়ে, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়—কেউ কেউ বিড়ি ধরাতে শুরু করে।

ওয়েলিংটনের মোড়। অমলের নামবার সময় হয়েছে। নামবার আগে আরও একবার সে সেই প্রবীণ ভদ্রলোকের ধীর গম্ভীর মুখখানার দিকে চেয়ে দেখে। বাস থেকে নেমে পড়ে প্রস্রাবখানার দিকে যেতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বিরাট দুই লাইন দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। যুদ্ধের দৌলতে এ এক নতুন ঢঙ হয়েছে—সব কিছুর জন্যেই লাইন লাগাতে হয়! কিন্তু যতক্ষণে তার টার্ণ আসবে, ততক্ষণ অপেক্ষা করার মতো অবস্থা তার নয়। অমল ভাবলে, তার চেয়ে মাঠের মাঝখানে কাজটা সেরে নিলে কেমন হয়। ব্ল্যাক আউটের দৌলতে কেউ তো আর তাকে ওই দুষ্কর্ম করতে দেখতে পাচ্ছে না!

পার্কের কোণে বক্সিং স্টেডিয়াম। ঢাকনি ঢাকা আলোর তলায় দুজন তখন বক্সিং লড়ছে। অমল দাঁড়িয়ে পড়ল, বক্সিং দেখতে তার বেশ লাগে। এককালে তার শেখবার ঝোঁকও হয়েছিল—কিন্তু কি এমন পরমার্থ লাভ হতো! চাকরীর বাজারে বক্সিং তো আর এডিশন্যাল কোয়ালিফিকেশন নয়!

অমল আবার হাঁটতে শুরু করল। পশ্চিম গেট দিয়ে ঢুকে খানিকটা এগিয়ে যেতেই তার মনে পড়ল, কাজটা এবার সেরে নিতে হবে। ব্ল্যাকআউটের রাত, ঠুলি লাগানো আলোর তলায় সমস্ত মাঠটা কেমন যেন ধাঁধাল হয়ে উঠেছে। অমল এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে পড়ে। কাজ সেরে উঠতে গিয়ে শুনতে পেলে চুড়ির ঠুনঠুন শব্দ! কান খাড়া ক'রে, চোখ কুঁচকে সে মাঠময় খুঁজতে লাগল। কিছু দূরে যেন দুটো মানুষ খুব কাছাকাছি বসে! ভাবলে, কি তারা হতে পারে? স্বামী-স্ত্রী—তাই যদি হবে তাহলে মাঠের মাঝে প্রেম করতে আসবে কেন! দুজনে রীতিমত জড়াজড়ি ক'রে রয়েছে। আরও কিছুক্ষণ ওদের কার্যকলাপ দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু হ্যাঙলার মতো দাঁড়িয়ে থাকতেও সংকোচ জাগে। ভাবলে, বসেই পড়া যাক্। বিয়ে-বাড়ীর নেমন্তন্ন—এক-আধঘণ্টা দেরী হলেই বা কি—এ তো আর চাকরীর ইণ্টারভিউ নয়।

আরও একটু এগিয়ে গিয়ে অমল বসতে যাচ্ছিল। হঠাৎ মেয়েটি উঠে পড়ে হন্‌হন্ ক'রে গেটের দিকে চলতে থাকে, আর তার পেছন পেছন স্যুটপরা একটি লোক লম্বা লম্বা পা ফেলে নাগাল ধরবার চেষ্টা করে। অমল অনুতপ্ত হয়ে ওঠে, সেই কি কোন ব্যাঘাত ঘটাল! তার আর বসা হলো না। আনমনা

ভাবে চলতে চলতে ভাবছিল, বিয়ে তো তারও হতে পারত! সমীরণের যখন বিয়ে হচ্ছে, তখন তারই বা হতে পারে না কেন? হাসিতে তার ঠোঁটের কোণটা কুঁচকে ওঠে—বেকার ছেলের আবার বিয়ে!

বিয়েবাড়ীর কানাতের তলায় এক কুঞ্জবন—তার মধ্যে মখ্‌মল্‌ মোড়া এক সিংহাসন। সে কুঞ্জবনের মধ্যে গাছপালা, লতাপাতা, ফলফুল, নদীপাহাড়, চাঁদতারা কিছুই বাদ পড়েনি। অমল ভাবছিল সমীরণ যখন ওই সিংহাসনের ওপর বসেছিল, তখন নিশ্চয়ই তাকে একটা রাজা-গজা ধরনের দেখাচ্ছিল!

কুঞ্জবনের সামনে নিমন্ত্রিতদের আসর। আলো যাতে বাইরে যেতে না পারে, তার জন্য সভাস্থল ডবল তেরপলে মোড়া। বন্‌বন্‌ ক'রে অনেকগুলো পাখা ঘুরছে—তবুও যেন একটা ভেপসা গরম দম বন্ধ ক'রে আনে। নানান রকমের নিমন্ত্রিত লোক, তাদের খাতিরের বহর দেখে বোঝা যায় কে কি রকম দরের। ওরই মধ্যে কতকগুলো দল হয়ে গেছে, আর সেখানে চলেছে তুমুল তর্ক।

অমল কান পেতে শুনলে, "মস্কো মশাই কবে খতম হয়ে গেছে—খবর কি আর এখানে দেয় কিছু! সঠিক খবর দিলে যে এখানে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবে।" অমলের হঠাৎ মনে পড়ে, বাসের সেই প্রবীণ ভদ্রলোকের কথা। ওখান থেকে সরে গিয়ে সে আর এক পাশে বসল। সেখানে চলেছে জন চারেকের মধ্যে চাপা গলায় আলোচনা। একজন বলছে, "এই বেলা ধ'রে ফেলুন মশাই, ব্লেড্‌—যত ধরতে পারবেন, তত লাভ—"

আর একজন বললে, "ব্লেড্‌ কি আর এখনও মার্কেটে আছে—সে সব কবে উধাও হয়ে গেছে।"

"তবে মশাই গভ্‌মেণ্ট কন্‌ট্রাক্ট ধরুন—দুদিনে লাল হয়ে যাবেন। এ যুদ্ধু চট্‌ ক'রে থামছে না, এই তো মশাই মৌকা—"

সমীরণের ছোট ভাই অমলকে দেখতে পেয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল ভেতরের একটা ঘরে। সমীরণ বললে, "কিরে এত দেরী করলি যে? আমি তো প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছি—"

অমল সমীরণের ফোঁটাচন্দন আঁকা মুখখানার দিকে চেয়ে বললে, "তা তুই যে এখানে ঘরের কোণে বসে? তোর সিংহাসন দেখলুম খালি!"

সমীরণ বললে, "সে আর বলিস কেন, রীতিমত জোরজবরদস্তি—বসাবেই ওই শো-কেসটার মধ্যে—কি অদ্ভুত টেস্টরে বাবা! বুঝলি না, ব্লাক-মার্কেটের পয়সা কিনা—তাই আর টাকার জন্যে কোন দুখ-দরদ নেই—

"সে যাই হোক্, কিন্তু তোকে তো বেশ একটা রাজা-রাজা দেখাত!"

"তোর যে রীতিমত লোভ লাগছে দেখছি—তা না হয় আমার সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করে নে—"

বলিস কি রে! আমার মতো হাভাতে একটা বেকারের সঙ্গে! তাহলে তো সিংহাসনের বদলে খাঁচার অর্ডার দিতে হবে।"

বছর বারো বয়েসের একটি বেনারসী জড়ানো মেয়ে এক কাপ চা দিলে অমলের হাতে। চা নিয়ে অমল সমীরণকে জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁরে, তোর শালী নাকি?" অমলের দিকে কটাক্ষ হেনে মেয়েটি দৌড়ে পালিয়ে গেল।

সমীরণ বললে, "হবে ওই রকম একটা কিছু—সমানে পেছনে লেগে আছে। ওদের প্রাণে যে এত রস এল কি ক'রে বুঝি না—"

অমল বললে, "আর বাইরেও দেখলাম, লোকগুলোর প্রাণে ঠিক এদেরই মতো উল্লাস। যুদ্ধ লেগেছে—না, ওদেরই পোয়া বারো।"

সমীরণ অমলের কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, "যেতে দে ওদের কথা, তারপর কাজকম্ম তুই কিছু জোগাড় করতে পারলি নাকি?"

অমল বললে, "কই আর পারলুম, কেবল ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘোরাই সার হচ্ছে।"

সমীরণের মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে, "তাহলে এই যুদ্ধের বাজারে চালাবি কি ক'রে?" কিছুক্ষণ অমলের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, "কি আর করবি বল্, যুদ্ধের কোন একটা কাজে ঢুকে পড়।"

অমল বললে, "যুদ্ধের কাজ মানে—এ. আর. পি-র চাকরী?"

"দূর, ওতে ঢুকে কেবল জাতই যাবে—"

"তবে গভর্ণমেণ্ট কনট্রাক্ট?"

"সে যা পারিস তুই জোগাড় করতে—"

"না যুদ্ধের কোন ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টকে আমি সাহায্য করতে চাই না।"

সমীরণ ঝাঁঝিয়ে উঠল, "ওসব নীতিবাগীশের কথা রেখে দে। তোর ওই প্রিন্সিপ্ল্ নিয়ে আজ তুই বাঁচতে পারবি? এই যুদ্ধের আওতায় পড়ে দেখছিস তো সবই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। কত স্বাধীন দেশ স্বাধীনতা হারাচ্ছে —এক ইভ্যাকুয়েশনের হিড়িকে শহরশুদ্ধ লোক স্ত্রীর গয়না বাঁধা দিয়েও কোলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে—লাখে লাখে তোর মতো লেখাপড়া জানা ছেলে মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছে। এদের থেকে আলাদা আর তুই কি করবি? আমরাও তো মিলিটারী কনট্রাক্ট ধরতে শুরু করেছি—"

বিয়ের পালা চুকে গেছে—অমলেরও খাওয়া হয়ে গেছে। অমল ভাবছিল, এইবার গেলেই তো হয়। কিন্তু বাসরঘরে সমীরণের সঙ্গে একবার দেখা না করলে বোধহয় খারাপ দেখাবে। বাসর ঘরের সামনে যেতেই সমীরণ হাঁক পেড়ে অমলকে ডাকলে, বোধহয় তার স্মার্টনেসের পরিচয় দিতে। অমল তার পাশে গিয়ে বসতেই সমীরণ রীতিমত কেতাদুরস্তভাবে নববধূকে ইন্‌ট্রোডিউস্ ক'রে দিলে। নববধূ হাত তুলে নমস্কার করলে—দুহাত ভরা একরাশ গহনা ঝনঝন ক'রে উঠল। অমলের মনে পড়ল—'ব্ল্যাক-মার্কেটের পয়সা কিনা, তাই আর টাকার জন্যে কোন দুখ-দরদ নেই।

অমলও প্রতিনমস্কার করলে, কিন্তু কি বলবে ভেবে পেলে না, কিছু একটা বলার উদ্যোগ ক'রে আবার ঢোক গিলে নিলে। সমীরণ আরও খানিকটা অমলের পাশ ঘেঁসে বসে তার কানে কানে বললে, "আমার মনে হয়, বিজ্‌নেস্ তুই ঠিক ম্যানেজ করতে পারবি না অমল। তার চেয়ে এক কাজ কর না কেন—মিলটারীতে ঢুকে পড়, বলা যায় না ভালো একটা চান্স পেয়ে যেতেও পারিস—"

অমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "দেখা যাক্, কতদূর কি করতে পারি। এখন চলি তাহলে—রাত তো অনেক হলো।" নববধূর কাছে বিদায় নিতে গিয়ে দেখে, মেয়েটি তারই মুখের দিকে চেয়ে আছে। হাত তুলে নমস্কার ক'রে অমল বেরিয়ে পড়ল।

কেন যেন অমল একটু জোরেই হেঁটে চলেছে। স্কোয়ারের মধ্যে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—সমস্ত মাঠটার ওপর বারেক চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার মন্থর গতিতে হাঁটতে থাকে। কাজলটানা নববধূর চোখ দুটো যেন তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা, অমন ক'রে তার মুখের পানে সে চেয়ে ছিল কেন!

কিন্তু সমীরণই-বা তাকে মিলিটারীতে ঢোকার কথা বললে কেন! সে যা বলতে চায়, তার অর্থ তো এই যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিন্তু কেন, কেন উপায় নেই! এই যুদ্ধের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায়? হচ্ছে ব্রিটিশের সঙ্গে জার্মানি আর জাপানের যুদ্ধ—তার মধ্যে পরাধীন ভারতবাসীর কি স্বার্থ থাকতে পারে!

কিন্তু সমীরণই তো বললে, তারাও মিলিটারী কনট্রাক্ট ধরতে শুরু করেছে। সমীরণের শ্বশুর যুদ্ধের দৌলতে ব্ল্যাক-মার্কেটে এত পয়সা করেছে যে টাকার ওপর তার কোন দুখ-দরদ নেই। সমীরণের বাবা তো এমন একজন লোকের

সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে কুণ্ঠিত হন নি! কিন্তু এই মিলিটারী কনট্রাক্ট নেওয়া, ব্ল্যাক-মার্কেটওয়ালার সঙ্গে মিতালি পাতানো—এ তো ব্রিটিশকেই সাহায্য করা। তাই বুঝি সমীরণ অত সহজে তাকে মিলিটারীতে ভর্তি হতে বললে!

ওয়েলিংটনের মোড় একেবারে ফাঁকা। ট্রাম অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে—বাস অনেকক্ষণ পরে পরে যাচ্ছে। ব্ল্যাক-আউটের ঠুলির তলায় নির্জন নিথর রাস্তাটা ভূতুড়ে হয়ে উঠেছে। বাড়ীর দেওয়ালগুলোয় বড় বড় পোস্টারগুলো কেমন যেন চোখ মিট্‌কি মারছে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অমল চেয়ে থাকে 'ভারতীয় সৈনিকদলে যোগ দিন' পোস্টারের দিকে। এ পোস্টার সে অনেকদিন দেখেছে, কিন্তু আজ যেন সে নতুন চোখে দেখছে। ওই মানুষটিকে যেন তার খুব চেনা বলে মনে হচ্ছে, আর শুনতে পাচ্ছে সমীরণের ফিস্‌ফিস্ শব্দ, 'লাখে লাখে তোর মতো লেখাপড়া জানা ছেলে মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছে—এদের থেকে আলাদা আর তুই কি করবি?'

একা দাঁড়িয়ে থাকতে কেমন যেন ভয় ভয় করে। অমল হেঁটে চলেছে এস্‌প্লানেডের দিকে। ক্বচিৎ একটা ট্যাক্সি একদল বেসামাল এ্যাংলোইণ্ডিয়ান মেয়েপুরুষ নিয়ে ঝনঝনিয়ে চলে যাচ্ছে। রিক্সায় বসা মাতাল যাত্রাটির মাথা পেছনে কাৎ হয়ে পড়েছে। গলির মোড়ে মোড়ে অন্ধকার ওৎ পেতে রয়েছে—এ. আর. পি সেন্টারের নির্দেশগুলো যেন পথ রুখে দাঁড়িয়ে আছে—ব্যাফ্‌ল্ ওয়ালের আড়ালে আড়ালে কারা যেন থাবা মেলে রয়েছে। স্যাল্‌ভেশন্ আর্মি হেড্‌কোয়ার্টারের সিঁড়িতে একটি ছেলে একটি মেয়েকে সশব্দে চুম্বন করছে। ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের মোড় বরাবর আসতেই একটা লোক সন্তর্পণে অমলের পাশে এসে চাপা গলায় বলে, "ইয়ং গার্ল বাবু—এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান"—অমলের মনে হয়, ওই লোকটাই যেন দুপুরবেলায় হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র সামনে প্যারিস্ পিক্‌চার্ বিক্রী করে!

অমলদের সংসার ছোট—কিন্তু তার আয়ের পরিধি আরও ছোট। কাজেই অভাব আর অনাটনের সঙ্গে প্রতিপদে টানা-হেঁচড়া ক'রে চলতে হয়। অমলের বাবা ননীগোপালবাবু গরীব হয়ে পড়লেও দারিদ্র্যকে স্বীকার ক'রে নেন নি—তিনি বংশানুক্রমিক জমিদার। জমিদারী তিনি অনেকদিন করেছেন, জমিদারী মেজাজ আজও তাঁর ছেঁড়া ধুতি আর তালিমারা জামার ফাঁকে ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারে। বংশগৌরব আর ঐতিহ্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর একমাত্র মূলধন।

জমিদারীর পালা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কেবল বেঁচে আছে তার ঠাটটুকু। আয়ের এক কপর্দকও হাতে আসে না, কিন্তু মাঝে মাঝে মামলা-মোকদ্দমার খরচ ঠিকই জোগান দিতে হয়। ছেলেরা চোখে দেখে জোড়াতালি দিয়ে আভিজাত্য বজায় রাখার ব্যর্থ চেষ্টা আর কানে শোনে জমিদার-জীবনের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী দিনগুলির লোভনীয় কাহিনী।

ননীগোপালবাবুর তিন ছেলে, দুই মেয়ে, স্ত্রী গত হয়েছেন, মা বর্তমান। বড়ছেলে বিমল ম্যাট্রিকের বেড়া টপ্‌কাতে পারে নি—সদাগরী অফিসের সরকার, মাসমাহিনা ত্রিশ টাকা। মেজছেলে অমল বুদ্ধিমান, তাই আই. এ. পাশ করার পর তাকে চাকরী নিতে দেন নি—তাঁর ভাঙা সংসারকে গড়ে তোলার আশায় অমলের ওপর জবর বাজি ধ'রে বসেন। যশ ও অর্থ দুইই তিনি অমলের মারফৎ দাদন দিয়ে বসলেন। অমল যদি বি. এ. পাশ করতে পারে, তাহলে বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে, আর বেশী পাশ করার জন্যে চাকরীতে মাইনের অঙ্কটা মোটা হবে। ছোটছেলে কমলের ওপর কোন বাজি না ধ'রে সোজাসুজি কেরাণীগিরি শিক্ষার জন্যে কমার্স পড়াতে শুরু করেন।

বিমলের রোজগারে সংসার চলে না, তাই ননীগোপালবাবুকে সঙ্গোপনে বড়লোক আত্মীয়দের কাছে হাত পাততে হয়। ভরসা এখন অমল, অন্তত একশোটা টাকা সে যদি ঘরে আনতে পারে, তাহলেই তো কিস্তিমাৎ—হাত পাতার দায় থেকে তিনি নিষ্কৃতি পাবেন। তারপর কমলের আয় যখন ঘরে উঠবে, তখন তো হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের দিকে মন দিতে পারবেন। পিতা হিসাবে ননীগোপালবাবু নিশ্চয়ই এমন আশা মনে পোষণ করতে পারেন।

কিন্তু বাদ সাধল পোড়া যুদ্ধ। বোমাতঙ্কে কোলকাতা শহর উজাড় হয়ে গেল—ফকির থেকে আমীর পর্যন্ত লোটাকম্বল সম্বল ক'রে শহরত্যাগী হলো। ননীগোপালবাবুর সংসার অচল হয়ে পড়েছে—বড়লোক আত্মীয়দের অনেকেই দেশত্যাগী হয়েছেন, কাজেই তাঁদের অংশটাতো বাদ পড়ছেই, তার ওপর আবার দিনের পর দিন জিনিসের দাম চড়ছে। সংসার চালানো শুধু দুষ্কর নয়—এক কথায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বি. এ. পাশ করার পর তিনটি মাস কেটে গেছে, চাকরী তো দূরের কথা অমল মাসে বিশ পঁচিশ টাকার বেশী সংসারে দিতে পারে নি। কিন্তু ইভ্যাকুয়েশনের ধাক্কায় তারও দুটি ছাত্র শহর ছেড়ে চলে গেছে। অমলের আয় একেবারে বন্ধ।

সেদিন অমল সকাল সকাল খেতে বসেছে, কোথায় নাকি বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাবে। ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে ঠাকুমা বললেন, "হ্যাঁরা অমি,

চাকরী-বাকরী কি তুই করবি না নাকি ? তিন-তিনটে পাশ করেছিস—তুই তো আর নির্বোধ ন'স্—"

অমল বললে, "তিনটে পাশ কি বলছ ঠাকমা, কত ডজনখানেক পাশ-ওয়ালারাই ফ্যা-ফ্যা ক'রে বেড়াচ্ছে। চাকরীর দরকার থাকলেই তো আর চাকরী পাওয়া যায় না—চেষ্টা করছি, যেদিন জুটবে সেদিন থেকেই করব।"

ননীগোপালবাবু আশেপাশে কোথাও বসে থেকে অমল আর ঠাকুমার কথাবার্তা শুনছিলেন। অমলের উত্তর শুনে ঝড়ের বেগে তিনি একেবারে সামনে এসে বললেন, "গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে কি আর চাকরী পাওয়া যায় ! আছ তো মজায়, দিব্যি দুবেলা পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে অন্ন ধ্বংসাচ্ছ—লজ্জা করে না ? আর আমি কিনা লোকের দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছি। এসব নবাবী আর বেশী দিন চলবে না—এবার থেকে ভাতের বদলে ছাই বেড়ে দেওয়া হবে" —কথাগুলো বলে হন্ হন্ ক'রে ঘরের মধ্যে গিয়ে তিনি গুম্ হয়ে বসে থাকেন।

কিছুদিন যাবৎ অমল দেখছে, তার সঙ্গে ঠাকুমা কেমন যেন খোঁচা দিয়ে কথা বলছেন, কথায় কথায় চাকরীর কথা তুলছেন আর তার উদাসীনতার প্রতি কটাক্ষ করছেন। মিনি আর রিণি মাঝে মাঝে কি যেন বলতে গিয়েও ঢোক গিলে নিচ্ছে। তাহলে আজকের ব্যাপারটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় !

ভাতের থালা থেকে অমল হাত গুটিয়ে নিলে। চোখ দুটো তার জ্বালা করছে, ঠোঁটটা সে কামড়ে ধরেছে। হাতের গ্রাসটা থালার ওপর রেখে দিয়ে অমল উঠে পড়ছিল। ঠাকুমা তার হাতটা চেপে ধরে বললেন, "আমার মাথা খা অমি, বাড়া ভাত ফেলে উঠে যাস নি—মা-নক্ষ্মি বিরূপ হবেন। বাপের কথায় কি রাগ করতে আছে।"

মাথা গুঁজে অমল বাকী ভাতগুলো শেষ ক'রে ফেললে। জামাজুতো পরে যখন সে বেরোচ্ছে, মিনি দৌড়ে এসে তার হাতে সুপারি দিয়ে বললে, "রাগ কর না মেজদা, বাবার শরীরটা আজকাল মোটেই ভালো নেই—তার ওপর সংসারের এই টানাটানি—"

অমল কোন জবাব না দিয়ে সুপারিটা মুখের মধ্যে ফেলে দিলে। বারেক মিনির দিকে তাকিয়ে তার মনটা গজরে উঠল। কেন, চাকরীর চেষ্টা সে কি করে নি, না করছে না ! স্টেটস্‌ম্যানের ওয়াণ্টেড্ কলমে যত রকম চাকরীর খবর থাকে, তার কোনটাই তো সে এই তিন মাসে ঢুঁ মেরে দেখতে কসুর করে নি। তবুও তো সে চাকরী পায় নি ! তার যে খুঁটির জোর নেই। বড়লোক আত্মীয়েরা

দশবিশ টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু তার হয়ে সুপারিশ করতে তাঁদের সম্মানে বাধে !

বাড়ীর চৌকাঠ পার হয়েই অমলের মনে হলো, বাড়ীতে ফেরা আর তার কোন মতেই চলতে পারে না। চাকরীর একটা ব্যবস্থা না ক'রে, এই কথার পর সে বাড়ীতে ফিরবে কোন মুখে ? কিন্তু এ কি জুলুম ! তার নিজেরই নেই কোন ঠিক-ঠিকানা, অথচ তারই ওপর এতবড় দায়িত্ব ! সে রোজগার করতে না পারলে এতগুলো লোক না খেতে পেয়ে মরে যাবে !

রোদের তাপ বাড়ছে—রাস্তার পিচ্ গরম হয়ে উঠছে—হন্‌হন্ করে অমল হেঁটে চলেছে—গল্‌গল্ ক'রে তার শরীর দিয়ে ঘাম ঝরছে। সোজা গিয়ে উঠল সে সমীরণের বাড়ী। সমীরণ বেরিয়ে আসতেই সোজা প্রশ্ন করলে, হঁ্যারে, সেই যে মিলিটারীর চাকরীর কথা বলেছিলি, তার জন্যে কোথায় যেতে হবে, কাকেও পাক্‌ড়াও করতে হবে নাকি ?"

সমীরণ বললে, "আরে চল, বসবি চল ঘরের মধ্যে। ভর্তি হওয়ার কথাতেই যে তোর মেজাজ মিলিটারী মার্কা হয়ে গেছে।"

অমল আর সমীরণ ঘরের মধ্যে গিয়ে বসল। সমীরণ পাখাটা চালিয়ে দিয়ে বললে, "মিলিটারীতে ভর্তি হওয়া কি ঠিক ক'রে ফেললি নাকি ?"

পাখার হাওয়া অমলকে যেন আরও ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছে। তার মনে হয়, এটা যেন তার প্রতি মারাত্মক একটা বিদ্রূপ—ওই ঠাকুমার স্নেহের মতন। কিছুক্ষণ সে গুম্ হয়ে বসে থাকে। সমীরণ আবার বললে, "তাহলে ঠিক ক'রে ফেলেছিস্ ?"

অমল যেন ফেটে পড়ল, "ঠিক আবার করব কি ! আমাকে ঘাড় ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে চলেছে। কি আমি করব বল্ ? যুদ্ধের মৌকায় তোমরা গভর্ণমেণ্ট কনট্রাক্ট ধরছ, ব্ল্যাক-মার্কেট করছ—তোমাদের দিনকাল তো ভালোই পড়েছে। কিন্তু আমরা ?"

ঠিকানা জেনে অমল যখন বেরিয়ে এল, তখন তার মনটা একেবারে দমে গেছে। এতক্ষণ সে জানত, সাধারণ চাকরীর মতো তাকে তদ্বির করতে হবে, উমেদার পাকড়াতে হবে, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। আর শেষ পর্যন্ত যথারীতি চাকরী হবে না—সে-ও এই মারাত্মক স্খলন থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু মিলিটারী চাকরীর জন্যে এর কিছুই করতে হবে না—গিয়ে দাঁড়ালেই চাকরী!

তবুও অমল রাস্তায় রাস্তায় খানিকটা ঘোরাঘুরি করে, কয়েকটা জায়গায় শেষবারের মতো ঢুঁ মেরে দেখে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন কোথাও হয় নি।

'নো ভেকান্সির' বোর্ডগুলো সেই একই উদ্ধত দম্ভে দরজায় দরজায় ঝুলছে, আর অফিসগুলোর দেয়ালে দেয়ালে সেই একটি মাত্র পোস্টার, "ভারতীয় সৈনিকদলে যোগ দিন।"

অবশেষে অমল ফিরে এল বেকার-বিশ্রামাগার কার্জন পার্কে। পড়ন্ত রোদকে আড়াল ক'রে একটা গাছতলায় বসে পড়ল। তার মতো আরও অনেকে এধারে ওধারে ছড়িয়ে রয়েছে। বেকার ছেলের দল, দুপুর বেলায় বাড়ীতে থাকার অধিকার নেই—থাকলেই বাপ-মা সন্দেহ করবে 'পায়ের ওপর পা দিয়ে অন্ন ধ্বংসানোর মতলব।'

আশপাশটা দেখে নিয়ে অমল চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে তার সমস্ত উত্তেজনা উবে গেছে। আর কিছু তার করবার নেই, এইবার তাকে বাড়ী ফিরতে হবে। কিন্তু বাড়ী ফেরার কথা মনে হতেই আতঙ্কে তার সমস্ত শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে ওঠে।

অমলের কাছ থেকে হাত চারেক দূরে দুটি ছেলে অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প করছিল। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন মাটি চাপড়ে জোরে বলে উঠল, "আলবৎ আমি মিলিটারীতে ভর্তি হব—"

অপর ছেলেটি বললে, "কিন্তু দেশের এই অবস্থায় মিলিটারীতে ভর্তি হওয়া মানে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা—"

"কিন্তু তোমরাই-বা কি করছ শুনি? একক সত্যাগ্রহ! বিশ্বাসঘাতকতা যদি বল, সে কাজ শুরু করেছ তোমরাই সবার আগে। আমাদের মতো গরীবদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ, আর ভাইসরয়ের দরজায় ধর্ণা দিচ্ছ। খুব স্বাধীনতার লড়াই করছ! কেন ডাক দাও বিপ্লবের, খতম কর ব্রিটিশের রাজত্ব, তারপর আমরাই রুখব জাপানিদের—"

"না, না, মাথা গরম করার সময় এটা নয়—হিংসাত্মক কোন পথ আমরা নিতে পারি না।"

"তা নেবে কেন! তাহলে যে জারিজুরি সব ফাঁস হয়ে যাবে। দেখো, দেশ দেশ বলে খানিকটা ফাঁকা বুলি কপ্‌চিও না। আমরাই যদি বাঁচতে না পারলুম, তবে দেশ তোমার স্বাধীন হবে কার জন্যে শুনি? এই আমার মতো কত লক্ষ লক্ষ এরই মধ্যে মিলিটারীতে ঢুকে পড়েছে, তা জানো?"

"তারা ভুল করেছে—"

"এই মানুষগুলো তিলে তিলে মরলেই বুঝি তোমার দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে? দেখো, দেশকে যদি স্বাধীন করতে হয়, তাহলে ওই ভিখারীপনা ছেড়ে

দিয়ে রীতিমত লড়াই করতে হবে। সেই লড়াইয়ে যদি তোমরা কোনদিন নামো, তাহলে দেখবে তোমাদের কারও চেয়ে আমরা কম দেশভক্ত নই।"

অমল ক্ষণেকের জন্যে সেই ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তার মনে হয়, এবার সে অনায়াসে বাড়ী ফিরতে পারে।

অমল ভেবেছিল, ক্লাইভ স্ট্রীটে যারা ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়ায়, তারা সকলেই বুঝি রিক্রুটিং অফিসের সামনে এসে ভীড় জমাবে। কিন্তু সেই আশানুরূপ ভীড় না দেখে, কেমন যেন একটু ঘাবড়ে গেল। তবে কি সে ভুল করছে!

একটি বেশ চৌকোস গোছের ছেলে বলছে, "রিক্রুটিং সেণ্টারের অভাবটা কি—মে রোডে রয়েছে সাপ্লাই, অর্ডনান্স—থিয়েটার রোডে রয়েছে হস্‌পিটাল, পাইওনিয়ার—কিন্তু ওগুলোতে কি ছাই কোন প্রস্‌পেক্ট আছে। এ তবুও রেলের কাজ—একটা টেক্‌নিক্যাল লাইন, শিক্ষিতদের তবু এখানে কিছুটা পোষায়—"

অপর ছেলেটি বললে, "তাইতো দেখছি, ভদ্দর লোকের ভীড়টাই যেন এখানে বেশী!"

"সে তো হবেই—পেটে বিদ্যে থাকলে কি আর মাটি কাটার জন্যে সোলজার হতে যায়! তাদের জন্যে তো রিক্রুটিং সেণ্টার পথেঘাটে খুলে বসে আছে।"

অমল এতক্ষণে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারে। তা হলে এইটেই একমাত্র রিক্রুটিং সেণ্টার নয়—আরও অনেক আছে বেড়াজালের মতো! এতক্ষণে যেন তার ভীড়টাকে লক্ষ্য ক'রে দেখার মেজাজ ফিরে এল। সে হিসেবে লোক এমনই বা কম কি! অন্তত ষাট-সত্তর জনতো বটেই। হরেক রকমের লোক—ছোট ছোট কুণ্ডলী পাকিয়ে গল্পগুজব করছে—সবক'টা মিলে একটা ভীড় জমে উঠেছে।

সবচেয়ে চটপটে আর বচনবাগীশ যে দলটা, তাদের অধিকাংশই স্যুটপরা। প্যাণ্ট আর সার্ট পরলে নাকি ভীষণ স্মার্ট দেখায়, সুতরাং যেমন তেমন একটা পরে, তার তলায় সার্ট গুঁজে দিয়ে তারা লম্বা লম্বা পা ফেলে চলাফেরা করছে। সিগারেট অল্পবিস্তর সকলেরই ঠোঁটে লেগে রয়েছে। কথায় কথায় 'শালা' 'মাইরী' সহজভাবেই বলছে। বিদ্যের দৌড় ফোর্থ-থার্ড ক্লাসের এলাকায়—কিন্তু এরা বলে থাকে নন্‌ম্যাট্রিক। কারখানায় মজুর বা অফিসে পিওন অর্ডারলি

হওয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে আরও এক পুরুষের মতো মুলতুবী রাখার উদ্দেশ্যে এঁদের আগমন।

আর একটা দল, তাদের মধ্যে বনেদী গন্ধ যেন এখনো কিছুটা রয়েছে। স্যুট বা জামাকাপড় যা পরে এসেছে, সেগুলো তাদের নিজেদেরই। জুতোর নমুনা অক্সফোর্ড স্যু থেকে বিদ্যাসাগর চটি পর্যন্ত। এদের অনেকেরই পিতা এখনও মাসে শ'-দুশো টাকা রোজগার ক'রে থাকেন। উকিল, ডাক্তার, ব্যারিস্টার, পেটি অফিসার, ছোট খাট ব্যবসাদারদের সন্তান এরা। ম্যাট্রিক, ইণ্টারমিডিয়েট এমন কি অমলের মতো গ্রাজুয়েটও যে আরও দু-একজন নেই, এমন নয়! যুদ্ধের ঠেলায় বেচারাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে শোচনীয়—পিঠছেঁড়া সার্টের ওপর চটকদার কোট প'রে জাত বাঁচানো আর সম্ভব হচ্ছে না। লটারীর টিকিট কিনে জীবনের বাজেট কষতে আর মন বসছে না। তাই এরা এখানে এসেছে ভাগ্যের সন্ধানে, অর্থাৎ জীবনে উন্নতি করতে। সমস্ত ভীড়টার মধ্যে এরাই অস্বস্তি ভোগ করছে সবচেয়ে বেশী—ঠিক সেই জাতের মেয়েদের মতো, যারা ঠেলাঠেলি ক'রে বাসে ওঠে, কিন্তু পাশে কোন পুরুষ বসলে সহ্য করতে পারে না।

বাকী দলটা নীচু তলার সম্প্রদায়। ধোপদুরস্ত জামাকাপড় তাদের জোটে না, জুতোর বালাই অনেকেরই নেই। ফেরিওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, ছেকরাগাড়ীর গাড়োয়ান, রেস্তোরাঁর বয়, বাজারের ফ'ড়ে, এমন কি পকেটমার, গাঁটকাটাও দু'একজন আছে। এদের কেউ কেউ নির্বিকার চিত্তে মাটির ওপর বসে আছে—কতক অসীম কুতূহলে বাবুদের কথাবার্তা শুনছে, আর কেউ অতি সন্তর্পণে অফিসঘরের সুইঙডোরটা একটু ফাঁক ক'রে উঁকিঝুঁকি মারছে।

ভীড়ের মধ্যে নিছক দাঁড়িয়ে থেকে অনেকেই বিরক্ত হয়ে উঠেছে—কর্মাভাবে দু'তিনটে বিড়ি ফোঁকা হয়ে গেছে, এখন গলা জ্বালা করতে শুরু করেছে। একজন বাবুক্লাসের ছেলে তো রেগে চলেই গেল! সে নাকি মজা দেখার জন্যে ভর্তি হতে এসেছিল। আর একজন পেছন থেকে তাকে ভেঙচে ওঠে, "আরে, যাবে আর কোন চুলোয়—কালই আবার সুড়সুড় ক'রে এসে হাজির হবে—দেখগে যা, বাছার হাঁড়িতে এতক্ষণে ইঁদুরে ডন মারছে।"

আর একজন বলে উঠল, "আমরা না হয় পেটের দায়ে এসেছি, কিন্তু এ শালাদেরও তো রাজত্বি রক্ষের দায় আছে। তবে বাবা এত ন্যাজেখেলানোর দরকারটা কি! দেখুন না মশাই, শালাদের বায়নাক্কা কত—একদিন গেল নাম লিখতে, একদিন ডাক্তারী করতে, আজ নাকি বণ্ডে সই করতে হবে—"

"বণ্ড আবার কিসের !"

"কে জানে মশাই অতশত—"

অফিসঘর থেকে কেরাণীবাবু বেরিয়ে এলেন। হাঁকডাক ক'রে সমস্ত ছেলেদের তিনভাগে ভাগ ক'রে ফেললেন। প্রথম দল, মেডিক্যাল এক্সামিন যাদের হয়ে গেছে—দ্বিতীয় দল, মেডিক্যাল এক্সামিন যাদের হবে—তৃতীয় দল, নবাগত। তিনটি দল আলাদা আলাদা ভাবে আবার কথাবার্তা শুরু ক'রে দিয়েছে। নবীন উৎসাহে কেউ কেউ আবার নতুন ক'রে বিড়ি ধরাতে শুরু করেছে।

দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল, "আপনার মাইনে কত হলো ?"

"এখন দেবে একুশ টাকা—আমি শিখব ফায়ারম্যানের কাজ—পাশ করলে আরও পাচ টাকা বাড়বে। তারপর মাইনে নাকি কেবল বাড়তেই থাকবে—হবে দুশো, তিনশো ! যেন ঠাকুরমার ঝুলির গল্প রে—অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যে দেবার জন্যে বসে আছে ! শালাদের সব ধাপ্পাবাজি।"

"ধাপ্পাবাজি জেনেও ভর্তি হলেন ?

"করব কি বলুন মশাই, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। কোন চুলোয়ই-বা আর যাব—তবুও তো এরা দুবেলা দুমুঠো খেতে দেবে, কিন্তু ঘরে যে তাও জুটছে না। দেশে-গ্রামে থাকি, মোটা ভাত-কাপড় হলেই চলে যায়—চাকরী আমার বাপ-দাদা চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও করে নি। কিন্তু জিনিসের দাম যেভাবে চড়ছে, তাতে তো মশাই আর দুদিন বাদে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। বুঝলেন না ব্যাপারটা, এ ব্যাটারা ইচ্ছে ক'রেই জিনিসের দাম চড়াচ্ছে, তাহলেই আমাদের মত গরীবেরা ঢুকতে বাধ্য হবে—"

কেরাণীবাবু আবার হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন, "প্রত্যেক দল সিঙ্গল্ লাইনে ফল্ ইন্—"

ফল্ ইন্ কথাটার অর্থ যারা বোঝে না, তারা কেরাণীবাবুর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে। বিরক্তিতে নাক কুঁচকে কেরাণীবাবু আবার সকলকে একের পেছনে আর একজনকে দাঁড় করিয়ে দেন। একে একে তিনটি দলই অফিসঘরে ঢুকতে থাকে।

নতুন যারা ভর্তি হবে, তাদের এন্‌রোলমেণ্ট ফর্ম ভর্তি করা চলতে লাগল। নাম, ধাম, বর্ণ, গোত্র, জাতি, ধর্ম, কিছুই বাদ পড়ল না। যারা চোখ-কান বুজিয়ে টপাটপ না বলতে পারে, সেখানে কেরাণীবাবুই কলমের ডগায় যা আসে তাই বসিয়ে দেন—সময় বড় কম, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হয়। ফর্ম ভর্তি

হলে সেই ফর্ম হাতে করে নবাগতের দল আর একটি ঘরের সুইঙ-ডোরের সামনে আবার লাইন লাগায়।

অমল সুইঙ-ডোরের সামনে যেতেই মিলটারী উর্দিপরা চাপরাশী নীরবে হাতটা সোজা তুলে ধরে। অমল দাঁড়িয়ে পড়ল। ট্রাফিক পুলিশী ঢঙে চাপরাশী হাতটা তুলেই রইল। ঘরের মধ্যে থেকে একটি ছেলে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে আওয়াজ এল, "নেক্সট্—"

চাপরাশী হাত নামিয়ে বললে, "যাও, সাবকো সেলাম দেও।"

ঘরে ঢুকে অমল হাত দুটো জোড়া ক'রে কপালে ঠেকাল। ক্যাপটেন সাহেব হাত বাড়িয়ে ফর্মটা নিয়ে বললেন "সিট্ ডাউন্ প্লিজ্—"

অমল পাশের চেয়ারটায় যথাসম্ভব সহজ হয়ে বসবার চেষ্টা করে—তবুও অস্বস্তিতে তার সমস্ত শরীরটা ঘেমে ওঠে। অফিসার, অর্থাৎ অন্নদাতা—তাঁর সামনে চেয়ারে বসাটাই তো ঔদ্ধত্য! তার ওপর আরও অস্বস্তি, সেলামের বদলে সে নমস্কার করে ফেলেছে!

ক্যাপটেন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "কতদূর পড়াশুনা করেছেন?"

অমল বললে, "এই বছর বি. এ. পাশ করেছি।"

"তাই নাকি!" ক্যাপটেন সাহেব ঝট ক'রে চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসলেন। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "তাহলে তো আপনাকে ভালো একটা চান্স দিতেই হবে—গুণের কদর আমাদের ডিপার্টমেণ্ট পুরোমাত্রায় করে। আচ্ছা, আপনি কি ধরনের কাজ পছন্দ করেন?"

অমল বললে, "রেলের কাজ সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।"

"সে তো বটেই—সে তো থাকবার কথাই নয়। তা থাকলে তো আপনাদের আমরা নিদেন পক্ষে ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ক'রে ভর্তি করতুম—আপনার স্টার্টিং হতো আড়াই-শো টাকা। আমার মনে হয় গার্ডের কাজটাই আপনি পছন্দ করবেন?"

খুশীর আতিশয্যে অমল যেন হাঁপিয়ে ওঠে। এতবড় একজন অফিসার, সাধারণ একটি রিক্রুটের ওপর এত সহানুভূতি! আর ওই কেরাণীগুলো, ওরাই যেন এক একটা অফিসার! অমল হাত কচলে বললে, "আমার ওপর পুরো একটা ফ্যামিলি নির্ভর করছে স্যার—দয়া ক'রে এমন একটা কাজে আমায় লাগিয়ে দিন যাতে স্টার্টটা মোটামুটি ভালোই হয় আর উন্নতিরও স্কোপ থাকে।"

ক্যাপটেন সাহেব অমলের কথাগুলো যেন হাঁ ক'রে গিলছিলেন—তার কথা শেষ হতেই টপ্ ক'রে একটা ঢোক গিলে বললেন, "স্কোপ! আপনার জন্যে

রাস্তা একেবারে খোলা। গার্ড থেকে আপনি ট্রাফিক ইন্সপেক্টর হতে পারবেন—তারপরই কিংস্‌কমিশন্! আর কিংস্ কমিশন পেলেই লেফটেনাণ্ট, ক্যাপটেন, মেজর, লেফটেনাণ্ট কর্ণেল, কর্ণেল এ্যাণ্ড সো অন্—পথ একেবারে পরিষ্কার—ইট্ অল্ ডিপেণ্ডস্ অন্ ইওর পেসেন্স এ্যাণ্ড এন্‌ডিওরেন্স।"

অমলের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে—তারই মাঝে দেখে সুবিস্তীর্ণ এক পথ, তার কোথাও বুঝিবা কোন বাঁক নেই! ক্যাপটেন সাহেব ক্ষণেক অপেক্ষা ক'রে বললেন, "আপনি কি বিবাহিত?"

অমল ঘাড় নেড়ে জানাল, "না"।

ক্যাপটেন সাহেব কাৎ হয়ে ব্ল্যাক-বোর্ডের ওপর চোখটা বুলিয়ে বললেন, "আচ্ছা, আপনাকে আমি ডিরেক্ট থার্ড গ্রেড গার্ডে ভর্তি ক'রে নিলুম, আর লিখে দিলুম গার্ডশিপ্ পাশ করলেই আপনি সেকেণ্ড গ্রেড পাবেন—" লেখা শেষ ক'রে ফর্মটা অমলের হাতে দিয়ে বললেন, "পাশের ঘরে ক্লার্ককে এটা দিয়ে দিন আর জেনে যান আপনার নেক্সট্ কাজ কি।"

অমল কেরাণীবাবুর হাতে ফর্মটা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ দাদা, থার্ড গ্রেড গার্ডের মাইনে কত?"

কেরাণীবাবু মুখ না তুলেই বললেন, "উপস্থিত ছাপান্ন, পরে আরও এলাওয়েন্স পাবেন, যখন ওভারসীজ যাবেন।"

"আর সেকেণ্ড গ্রেড?"

ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠলেন, "কত আবার! লাখ-পঞ্চাশেক মনে করেছেন নাকি? এই একশো'র মতো, আবার কত চান মশাই?"

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে অমল শুনতে পেলে, "বুঝলেন হেমন্তবাবু, এই সব বাবুরা মনে করেছেন মিলিটারিতে ভর্তি হয়ে বুঝি গভ্‌মেণ্টের মাথা কিনছেন—"

উত্তর এল, "গভ্‌মেণ্টেরই তো বোকামো মশাই। এত মোটা মোটা মাইনে দেওয়ার কোনই দরকার ছিল না। দশবিশ টাকা দিলেও বাছাধনরা এমনই সুড় সুড় ক'রে আসতেন। হাঁড়ি যে মশাই শিকেয় উঠেছে—"

পরদিন মেডিক্যাল এক্সামিন। অমল মেডিক্যাল ইন্সপেক্‌শন্ রুমের বাইরে একটা বেঞ্চে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী ডাক পড়ছে। লাইনের শেষের দিক থেকে একটি ছেলে উঠে এসে জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ মশাই, আমার বাঁ হাতটাতো ভাঙা—আমাকে নেবে তো?"

আর একটি ছেলে মাঝখান থেকে টপ্ করে বলে উঠল, "খুব নেবে মশাই —খুব নেবে। হাতভাঙা কি বলছেন, কয়েকটা কবন্ধ এনে দিন না, তাও পার হয়ে যাবে।"

হাতভাঙা ছেলেটি স্ব-স্থানে ফিরে গেল আর আশ্বাসদাতা ছেলেটি আপন মনে গজ্ গজ্ ক'রে চলেছে। অমলেরও চুপচাপ বোকার মতো বসে থাকতে কেমন যেন খারাপ লাগে। পাশের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলে, "এখানে লোক নেওয়া হচ্ছে—এ খবর পেলেন কোথায় ?"

ছেলেটি বললে, "কেন, আমাদের গ্রামে যে এই কিছুদিন আগে ঢেঁড়া দিয়েছে।"

ক্রমিক নম্বর 'এক' জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে বেরিয়ে এল। বয়েস তার অন্তত পঞ্চাশ, স্বাস্থ্য তালপাতার সেপাই। অমল তাকে জিজ্ঞেস করলে, "পাশ হয়ে গেছেন তো ?"

"পাশ না হয়ে উপায় কি ভাই—তাই কিছু দক্ষিণা দিতে হলো।"

অমল প্রশ্ন করে, "কেন !"

"আর কেন, ডাক্তার তো বলে দিলে, চোখ আমার খারাপ—আনফিট্ ফর স্টেশন মাস্টার। এখন আমি যাই কোথায়—এক পাল ছেলেপিলে নিয়ে কি পথে দাঁড়াব ! তা দেখলুম ডাক্তার সাহেব সরল লোক আর খাঁইও কম—এক টাকাতেই কার্যসিদ্ধি হলো।"

আশ্বাসদাতা সেই ছেলেটি ফেটে পড়ল, "ওরে শালা, যে যার মৌকা নিচ্ছে ! আমরা এসেছি পেটের দায়ে, আর এরা সেই সুযোগে টু-পাইস ক'রে নিচ্ছে ! আমি কিছুতেই দেব না—দেখি শালারা ভর্তি করে কিনা !"

অমল ভাবনায় প'ড়ে গেল, তার কাছে তো টাকা নেই। কিছুটা উস্‌খুস্ ক'রে, বার কয়েক গলা ঝেড়ে, কয়েকটা ঢোক গিলে পাশের ছেলেটিকে বললে, "আপনার কাছে একটা টাকা বেশী হবে ? তাড়াতাড়িতে টাকা নিয়ে বেরোতে ভুলে গেছি। কালই আপনাকে দিয়ে দেব।"

ছেলেটি কোঁচার খুঁট থেকে একটি টাকা বার ক'রে দিয়ে বললে, "ভর্তি যখন হচ্ছি, তখনতো একসঙ্গেই থাকতে হবে, তবে আর ভয়টা কি ! কাল কিন্তু মনে ক'রে আনতে ভুলবেন না যেন।"

এম. আই. রুম্ থেকে ফিরে জানা গেল, লোক আমদানি বেড়ে গেছে—ভর্তির কাজ তাড়াতাড়ি সারতে হবে। সুতরাং মেডিক্যাল এক্সামিন আর বণ্ডে সই একই দিনে সারা হবে। ছেলের দল বাইরে অপেক্ষা করছে। বণ্ড কথাটার

মধ্যে এমন নিগূঢ় একটা অর্থ লুকিয়ে রয়েছে যে ছেলেরা সাধারণভাবে একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। একটি ছেলে অমলকে জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁ মশাই, বণ্ড-ফণ্ড আবার কিসের! দাসখত লিখিয়ে নেবে নাকি?"

অমল বললে, "তা বণ্ড একটা নেবে বৈকি—আমাদের তো আর এরা বিশ্বাস করে না।"

রুক্ষমেজাজ সেই ছেলেটি তেড়ে-ফুঁড়ে উঠল, "মামার বাড়ী আর কি! চাকরী করতে এসেছি—চাকরীর মতো এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার চাই—বণ্ডে সই করব কি জন্যে?"

অমল বললে, "ডাক্তারকে তো টাকা দেবেন না বলেছিলেন, কিন্তু দিতে তো হলো। অযথা লম্ফ-ঝম্ফ ক'রে লাভ কি বলুন?"

ছেলেটি কেমন যেন একটু মিইয়ে যায়, অভিমানভরে বলে, "তা বলে যা খুশী তাই করবে?"

কেরাণীবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, "আপনারা সিঙ্গল লাইনে আমার পেছন পেছন আসুন—"

অমলের বুকের মধ্যে কেমন যেন টিপটিপ করছে। বণ্ডে সই করার কথাটা বারবার ঘুরেফিরে মনটাকে বিরোধী ক'রে তুলছে। তবুও উপায় নেই! বণ্ডে সই না দিলে এত সুলভ মিলিটারী চাকরীও পাওয়া যাবে না।

ক্যাপটেন সাহেবের ঘরের মধ্যে ঢুকে ছেলেরা টেবলের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। আঙুল তুলে এক এক ক'রে সকলকে গুনে ক্যাপটেন সাহেব বললেন, "ওনলি নাইন, বড্ড কম—" কেরাণীবাবুকে নির্দেশ দিলেন, "ভালো ক'রে পাবলিসিটির ব্যবস্থা করুন—আমাদের সেণ্টারের কথা হয়তো লোকে জানতেই পারে নি।"

কেরাণীবাবু চলে গেলেন। ক্যাপটেন সাহেবের মুখের ওপর বিরক্তির ছায়া কালো হয়ে উঠেছে। এনরোলমেণ্ট ফর্মগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে পাশে সরিয়ে রেখে মুখ তুললেন। পেছনে একটু হেলে পড়ে বললেন, "এনরোলমেণ্ট ফর্মে একটা ক'রে সই দিলেই আপনাদের ভর্তি হওয়ার কাজ শেষ।"

রুক্ষমেজাজ সেই ছেলেটা বললে, "কিন্তু কিসে আমরা সই দিচ্ছি সেটা তো আমাদের জানা দরকার।"

"অফ কোর্স—" ঝট ক'রে ক্যাপটেন সাহেব সোজা হয়ে বসেন—বিরক্তির ছায়া তাঁর মুখ থেকে চকিতে সরে যায়। হেসে সামনে ঝুঁকে বললেন, "নিশ্চয়ই—সই করার আগে শর্তগুলো আপনাদের জানা এবং বোঝা দরকার!

সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এবং খোলামনেই আপনাদের সই দিতে হবে। আমাদের মধ্যে কোথাও লুকোচুরি নেই।"

ছেলেরা নড়েচড়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। ক্যাপটেন সাহেব টেবিলের ওপর হাতদুটো রেখে বলতে শুরু করলেন, "আপনারা ভর্তি হবেন ইণ্ডিয়ান আর্মি এ্যাক্ট অনুসারে—এখন থেকে কেবল এই আইনই আপনাদের ওপর খাটবে। মনে রাখবেন, জলপথ, স্থলপথ বা আকাশপথ, যে কোন পথে, যে কোন দেশে যখনই যাওয়ার হুকুম হবে—তখনই সেই পথে, সেই দেশে, বিনা ওজর-আপত্তিতে আপনাদের যেতে হবে। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে আপনাদের একসঙ্গে থাকতে ও খেতে হবে। ওপরওয়ালা অফিসারের আইনসঙ্গত হুকুম বিনা বাক্যব্যয়ে মানতে হবে। চাকরীর মেয়াদ—যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন, তারপরও আরও বারোমাস—যদি ততদিন আপনাদের রাখার প্রয়োজন পড়ে।"

বলা শেষ ক'রে ক্যাপটেন সাহেব নীরব, স্তব্ধ ছেলেদের প্রতিটি মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে চললেন। কতকটা আশ্বস্ত হয়ে সেই রুক্ষমেজাজ ছেলেটিকে বললেন, "আর কিছু আপনার জানবার আছে?"

ছেলেটি বললে, "যুদ্ধক্ষেত্রে যদি আমরা মারা পড়ি, তাহলে আমাদের বাড়ীর লোকের কি হবে?"

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপটেন সাহেব উত্তর দিলেন, "সে ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট আপনার উত্তরাধিকারীকে আজীবন পেন্সন দেবে।" ছেলেদের মুখ থেকে দুশ্চিন্তার ছায়া সরে যায়, আশ্বস্ত হয়ে তারা নড়েচড়ে দাঁড়ায়।

ক্যাপটেন সাহেব বললেন, "আশা করি আর কিছু বোধ হয় আপনাদের বলবার নেই।" সকলকে নীরব দেখে, রিভল্‌ভিঙ চেয়ারে হেলান দিয়ে পেছনে কাৎ হয়ে বলতে শুরু করলেন, "আপনাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ হয়তো উচ্চশিক্ষা ছেড়ে এসে ভর্তি হচ্ছেন। মনে মনে হয়তো ভাবতে পারেন, আপনাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেল। ধরলাম, আপনারা বি. এ. বা এম্‌ এ. পাশ করলেন, তাতেই বা আপনাদের কি এমন বড় বড় চাকরী জুটত—বড়জোর তিরিশ টাকায় স্কুল মাস্টারী না হয় চল্লিশ টাকার কেরাণীগিরি। জানেন তো তাদের অবস্থা—একশো টাকার মুখ দেখতে তাদের চুল পেকে যায়। আর এখানে যা আপনারা শুরুতেই পাচ্ছেন, তা নিশ্চয়ই স্কুল মাস্টার বা কেরাণীর চেয়ে খারাপ নয়। তার ওপর প্রত্যেকটা ক্যাটেগরির আছে তিনটে ক'রে গ্রেড। একটা গ্রেড থেকে আর একটা গ্রেডে গেলেই কুড়ি, ত্রিশ থেকে নব্বই টাকা পর্যন্ত একবারেই বেড়ে যাবে। আর আপগ্রেডিঙ-এর জন্যে আপনাদের

মোটেই ভাবতে হবে না—আপগ্রেডিঙ হবে অটোম্যাটিক্যালি। ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে যখন কোম্পানিতে পোস্টেড হবেন, তখন হবে আপনাদের সেকেণ্ড গ্রেড —আর ওভারসীজ যখন যাবেন, তখন হবে ফার্স্ট গ্রেড। বলা যায় না, হয়তো আর তিন চার মাসের মধ্যেই আপনারা ফার্স্ট গ্রেড পেয়ে যেতে পারেন।"

সস্মিত মুখে ছেলেদের ওপর আবার একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "মনে রাখবেন, মাইনে হিসেবে যে টাকাটা হাতে পাবেন, ইচ্ছে করলে তার একটি পয়সাও খরচ না-ও করতে পারেন। কারণ, মাইনে ছাড়াও গভর্ণমেণ্ট আপনাদের খাওয়া, পরা, থাকা, চিকিৎসা, যাতায়াত সমস্ত খরচই দেবে।"

অমল মনে মনে হিসেব করলে, ছাপ্পান্ন টাকা থেকে চল্লিশ টাকা সে বাড়ীতে দেবে, দশ টাকা পোস্ট অফিসে জমাবে আর ছ'টাকায় হাত খরচ চালাবে।

"শুধু তাই নয়, গভর্ণমেণ্ট আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও চিন্তা করেছে। লড়াই আর কতদিন, বড়জোর দুবছর কি তিন বছর। তারপর যখন বেরিয়ে আসবেন, তখন গভর্ণমেণ্ট আপনাদের জন্যে চাকরী রিজার্ভ ক'রে রেখেছে। আপনারা আর্মির যে ডিপার্টমেণ্টে কাজ করবেন, পোস্ট-ওয়ার লাইফে আপনাদের জন্যে সেই সেই ডিপার্টমেণ্টে চাকরী রিজার্ভ রাখা হবে। এই যেমন আপনারা রেলের কাজে ঢুকেছেন, রেলওয়েতেই আপনাদের জন্যে চাকরী রিজার্ভ থাকবে।"

অমলের কেমন যেন খটকা লাগল। মুখস্ত করা গৎ বলে যেন মনে হচ্ছে! তার মনে পড়ল সেই ফায়ারম্যানটির কথা, 'যেন অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যে দেবার জন্যে বসে আছে!'

ক্যাপটেন সাহেব উঠে বসে ঘন্টি মারলেন। বেয়ারা এসে সেলাম ক'রে দাঁড়াল। ক্যাপটেন সাহেব বললেন, "এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি।" তারপর এক একজনকে ডেকে এনরোলমেণ্ট ফর্মের ওপর সই আর টিপসই করিয়ে নিলেন। সই করার কাজ শেষ হলে হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা সকলেই কি বাড়ীতে জানিয়েছেন?"

দুজন বাদে আর সকলেই বাড়ীতে জানিয়েছে। তাদের দুজনকে আলাদা দাঁড়াতে বলে বাকী সকলকে অফিস ঘরে যেতে বললেন। বেয়ারা এসে কাচের গ্লাসে বরফজল দিয়ে গেল। একচুমুকে জলটুকু খেয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বাকী দুজনকে বললেন, "তাহলে তো আপনাদের একদিন ছুটি দিতে হয় দেখছি। বাড়ীতে জানাতে হবে, তাছাড়া অন্য কোথাও মান-ভঞ্জনের পালা তো আছেই, কি বলেন?"

অমল ভ্রূ কুঁচকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ক্যাপটেন সাহেবের মুখের দিকে

চাইলে—লোকটা রসিকতা করছে নাকি !

ক্যাপটেন সাহেব সিগারেট কেসের ওপর সিগারেটটা ঠুকতে ঠুকতে দাঁত বার ক'রে হেসে বললেন, "তা দাওয়াই হিসেবে নিতান্ত মন্দ হবে না। বাঙলা দেশের মেয়ে তো, মিলিটারীতে ভর্তি হওয়ার কথা শুনলে একেবারে মূর্ছা যাবে !"

অমলের কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে, ঘৃণায় তার সমস্ত শরীরটা কুঁচকে উঠেছে। লোকটার সামনে থেকে বিদেয় হতে পারলে যেন বাঁচে !

ক্যাপটেন সাহেব তুটুকরো কাগজের ওপর তুটো ছুটির চিঠ্ লিখে তাদের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, "সে আমরা বুঝতে পারি—বহু ছেলেকেই তো এখান দিয়ে পার করলুম। সকলেই কি আর পেটের দায়ে মিলিটারীতে ঢোকে ! প্রেমের দায়েও বড় কম আসে না। হাউএভার, আই উইশ্ ইউ সাকসেস্—"

ক্যাপটেন সাহেবের হাত থেকে চিঠ্ নিয়ে অমল টপ্ ক'রে নমস্কার করল। ক্যাপটেন সাহেব হেসে বললেন, "তা বেশ, শেষবারের মতো ক'রে নিন। এরপর থেকে কিন্তু স্যালিউট্—নাউ ইউ আর এ সোলজার—"

অমল যখন রাস্তায় এসে দাঁড়াল, তখন সে ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছে—মিলিটারীতে ভর্তি হওয়ার পর্ব শেষ হয়েছে—আর কি, সে তো এখন সৈনিক !

বাড়ীতে এইবার জানাতে হবে, কিন্তু কথাটা সে পাড়বে কেমন ক'রে ! হঠাৎ তার চোয়ালটা শক্ত হয়ে ওঠে, দাঁতগুলো কড়মড় করতে থাকে। বাড়ীর সকলে ব্যথিত হবে। সে তো কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে। তারপর টাকা যখন হাতে পড়বে, তখন সব ব্যথার উপশম হয়ে যাবে, স্নেহের চাপ যাবে বেড়ে। টাকার অঙ্ক যত বাড়বে স্নেহের মাত্রাও সেই পরিমাণে বাড়তে থাকবে। তবে আর বলতে ভয়টা কিসের !

আচ্ছা বাবা কি করবেন ? রাগ ? তাতেই বা কি এসে গেল। ছাই খেয়ে তো আর একটা মানুষ বাঁচতে পারে না—হ্যাঁ সোজাসুজি এই কথাই সে বলবে। কাকেও সে ছেড়ে কথা কইবে না—স্নেহ-ভালোবাসায় মুখোশ টেনে খুলে দেবে।

হেঁটেই সে চলেছে। বাড়ীর যত কাছাকাছি এসে পড়ছে, ততই তার গতি মন্থর হয়ে আসছে। মনের কোন এক নিভৃত কোণে এই রূঢ় চিন্তার পাশাপশি অতি কোমল, আবেগময় একটা চিন্তা দানা বেঁধে উঠছে। ক্রমেই

যেন সে ভীরু হয়ে পড়ছে। তার মিলিটারীতে ভর্তি হওয়ার খবরে তো বাড়ীতে মড়া-কান্না পড়ে যাবে!

কিন্তু সে-ই বা করবে কি! অতি সাধারণ একটা চাকরী জোগাড় করার জন্যে তো সে অক্লান্ত চেষ্টা করেছে। অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরেছে, আত্মীয়-অনাত্মীয়ের খোশামোদ করেছে, ঘুষ দিতে রাজি হয়েছে—তবুও তো তার চাকরী হয় নি!

দেশের লোক তাকে বিশ্বাসঘাতক বলবে? তা তো বলবেই। কিন্তু কেবল তাকেই বলবে, যেহেতু সে সাধারণ সৈনিক হয়ে চাকরী নিয়েছে। হতো সে একটা বড় অফিসার, লোকে তাকে খাতির করত। ব্রিটিশকে সে সাহায্য করছে? তা তো করছেই। কিন্তু যেহেতু তার অন্ন জুটছে না, তার বাড়ীতে হাঁড়ি শিকেয় উঠেছে—তাই সে হলো বিশ্বাসঘাতক! আর সমীরণেরা মিলিটারী কনট্রাক্ট ধরেও দেশভক্ত রয়ে গেল! মানুষের জীবন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে, তারা মহামানবেরই মর্যাদা পেল। বড়লাটের বাড়ী ধর্ণা দিয়ে যারা ভিখিরীপনা করছে, তারা হলো জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা আর বিশ্বাসঘাতকের তকমা এঁটে দেওয়া হলো তাদেরই গায়ে—যারা হাভাতের দল!

বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে কড়ায় হাতটা দিতেই অমলের বুকের মধ্যে দুরদুর ক'রে উঠল। একটু ইতস্তত ক'রে সে কড়া নাড়লে। ভেতর থেকে রিণি সাড়া দিলে, "কে?"

অমল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। রিণি দরজা খুলে দিলে। ভেতরে ঢুকে অমল দরজা বন্ধ করার সময়টুকু অপেক্ষা ক'রে রইল। তারপর রিণির সঙ্গে চলতে চলতে তার কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলে। অসহায় সে হাতের স্পর্শ রিণিকেও কাতর ক'রে তোলে। বিষণ্ণ মুখে রিণি অমলের দিকে চোখ তুলে চায়।

জুতোজামা খুলে অমল রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে বসল। ঠাকুমা জপে বসেছেন; অমলকে দেখেই মালা ঘুরিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "হ্যাঁরে, কিছু হলো নাকি? তোর বাপ তো আর পেরে উঠছে না—"

অমল বললে, "হ্যাঁ ঠাকমা, হয়েছে একটা—পরশু জয়েন করব।"

ঠাকুমা মালাটা নামিয়ে রেখে বলে উঠলেন, "তাই নাকি! তাই বুঝি মেজকর্তার আজ ঠাকমার কাছে বসবার ফুরসৎ হলো?"

অমল বললে, "খাবার-দাবার কিছু আছে? বড্ড খিদে পেয়েছে।"

ঠাকুমা তারস্বরে হেঁকে উঠলেন, "অরে অ মিনি-রিণি, বলি তোরা গেলি

কোথা! ছেলেটা তেতেপুড়ে এল, কোথায় তাকে খাবার-দাবার দিবি, তা না ঘরের কোণে বসে দিনরাত ফুস্থর-ফুস্থর—কি যে তোদের এত কথা বুঝি না বাবা—"

অমলের ঠোঁটের কোণে মৃদু একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে। এই তো রঙ বদলাচ্ছে! ঠাকুমা একটু অপেক্ষা ক'রে আবার হাঁকলেন, "বলি অ মেয়েগুনো —বলি তোরা মরেছিস নাকি?"

মিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁঝিয়ে উঠল, "বাবারে বাবা, এমন চেঁচাও তুমি কানের পোকা বেরিয়ে যায়—কি, হলো কি?"

ঠাকুমা অমলকে বললেন, "দেখলি তো, আমাকে গেরাহ্যিই করে না, আমি যেন বাড়ীর দাসী-বাঁদী কি একটা। আমি যে চেঁচিয়ে মলুম, তা কথাটাও কানে তুলল না—"ঠাকুমা অনর্গল ব'কে চললেন।

মিনি অমলকে জিজ্ঞেস করলে, "বুড়ি কি বলছিল গো মেজদা?"

অমল বললে, "আমাকে খেতে দিতে—"

"ব্যাপার কি, তোমার ওপর যে দরদ উথ্‌লে উঠল!"

"আমায় কিছু খেতে দে, বড্ড খিদে পেয়েছে।"

মিনি অমলকে রুটি তরকারি দিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিলে। ঠাকুমার মেজাজ ততক্ষণে ঠাণ্ডা হয়েছে। মিনিকে বললেন, "শুনেছিস, অমির চাকরী হয়েছে, পরশু থেকে যাবে। এতদিনে ভগবান বুঝি মুখ তুলে চাইলেন। হ্যাঁরা অমি, তা মাইনে কত হলো—পাকা চাকরী তো?"

অমল বললে, "উপস্থিত গোটা পঞ্চাশ—তা একরকম পাকা বৈ কি।"

অমলের পাতের দিকে নজর পড়তে ঠাকুমা বললেন, "হ্যাঁরা, রুটি আর একখানা দেবে নাকি, আর একটু পাটালি?"

মিনি ঝংকার দিয়ে উঠল, "নাতির চাকরী হয়েছে শুনে খুব যে খাতির করছ দেখছি, আর এতদিন কি করতে একটু ভেবে দেখ তো। ওঃ, তোমরা কি সাংঘাতিক মানুষ!" মিনি যেন আক্রোশে ফেটে পড়ছে।

ঠাকুমা মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠলেন, "তা ছুঁড়ি, আমায় বলছিস কেনর্‍যা। এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম—যে গরু দুধ দেয়, তার চাঁট লোকে সহ্য করে।"

মিনি বললে, "সেই জন্যেই তো বলছি। এখন থেকে মেজদাও দুধ দেবে শুনে খুব যে তার খোসামোদ করতে শুরু করেছ।"

অমল ধমক দিয়ে উঠল, "আঃ মিনি, কি হচ্ছে—"কিন্তু তার গলাও কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি চা খাওয়া শেষ ক'রে সে উঠে পড়ে। ঘরের মধ্যে ঢুকে

তক্তপোশের ওপর শরীরটাকে এলিয়ে দেয়। ওঃ, তার সমস্ত শরীরটা যেন টন্‌টন্‌ করছে।

রিণি অমলের মাথার কাছে বসে তার চুলের মধ্যে আঙুল দিতে দিতে বললে, "সত্যি মেজদা, তোমার চাকরী হয়েছে?"

অমল বললে, "হ্যাঁরে হ্যাঁ—"

রিণি খুশিতে হাততালি দিয়ে বললে, "তাহলে আর কেউ তোমায় বকবে না, না?"

অমল বিস্মিত দৃষ্টিতে রিণির মুখের দিকে চাইলে। আট বছরের রিণির এই সরল প্রশ্নের কি উত্তর সে দেবে! গভীর কৃতজ্ঞতায় তার মনটা যেন কানায় কানায় ভ'রে ওঠে—এই তো রয়েছে সহানুভূতি, আর বুকভরা দরদ।

মিনি অমলের পাশে বসে বললে, "কোথায় চাকরী হলো মেজদা?"

অমল খুব হাল্কাভাবে বললে, "মিলিটারীতে।"

মিনি বলে উঠল, "কক্ষণো না। তুমি মিলিটারী হতেই পার না। মাগো, মিলিটারীতে তো যত সব ছোটলোক ভর্তি হয়!"

কড়া নাড়ার শব্দ হলো। রিণি চলে গেল দরজা খুলতে। মিনি উঠে পড়ে বললে, "যাই, বাবার জন্যে চায়ের জল বসাইগে—"

ননীগোপালবাবু জামা ছাড়ছেন। ঠাকুমা খবর পেয়েই হাঁকাহাঁকি শুরু ক'রে দিলেন, "ওরে ননী, অমির চাকরী হয়েছে রে—"

রান্নাঘরের দাওয়ায় রিণি একটা মোড়া পেতে দিলে। ননীগোপালবাবু বসতে বসতে বললেন, "না হওয়ার তো কিছু নেই, চেষ্টা করলেই হবে।"

ঠাকুমা রিণিকে বললেন, "কই, ডাক না অমিকে—"

রিণি দৌড়ে গিয়ে অমলের হাতটা ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল। অমল যেন আঁতকে উঠল। মিলিটারীতে ভর্তি হওয়াকে কি এঁরা চাকরী বলে মেনে নিতে পারবেন!

ঠাকুমা হেঁকে উঠলেন, "কই রে, অমিকে একটা পিঁড়ি পেতে দে না—"

অমল মাটির ওপরই বসে পড়ল, রিণি বসল তার কোল ঘেঁষে। মিনি ননীগোপালবাবুর হাতে চায়ের কাপ দিয়ে অমলকে জিজ্ঞেস করলে, "আর একটু খাবে নাকি মেজদা?"

অমল বললে, "থাকে তো দে—"

ননীগোপালবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "কবে জয়েন করতে হবে?"

অমল বললে, "পরশু সকাল থেকে।"

"সকাল নয়তো সন্ধ্যে বেলায় আবার কোন অফিস খোলে নাকি! কোথায় হলো—এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেয়েছিস—মাইনে কত?"

অমল উত্তর দিলে, "উপস্থিত ছাপ্পান্ন, পরে আরও বাড়বে।"

ননীগোপালবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, "একজন গ্রাজুয়েট হয়ে ছাপ্পান্ন টাকার চাকরী নিতে তোমার লজ্জা করল না? আর ওই টাকাতে সংসারের কতটুকু সুরাহা হবে?"

আমতা আমতা ক'রে অমল বললে, "আমার জন্যে সংসারে এক পয়সাও খরচ হবে না—থাকা, খাওয়া, পরা, সমস্ত খরচই তারা দেবে। মাইনের টাকাটা পুরোই হাতে থাকবে।"

ননীগোপালবাবু চোখ কুঁচকে অমলের দিকে চেয়ে বললেন, "এ আবার কোন ধরনের চাকরী?"

অমল মরিয়া হয়ে বললে, "মিলিটারীর চাকরী।"

"তার মানে!"

"আমি মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছি।"

ননীগোপালবাবু আঁতকে উঠলেন, মুখ দিয়ে তাঁর এক অব্যক্ত যন্ত্রণাকাতর গোঙানি বেরিয়ে এল—স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। মৌন আশঙ্কায় আর সকলে ননীগোপালবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে।

হঠাৎ ননীগোপালবাবু অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, "বাঃ বাঃ চরৎকার! আমার ছেলে সেপাই, 'আমার গ্রাজুয়েট ছেলে ছাপ্পান্ন টাকার সেপাই, বন্দুক ঘাড়ে ক'রে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াবে। জমিদার বংশের ছেলে সেপাই সেজে রাস্তায় ঘাটে মাতলামো করে বেড়াবে। বেশ করেছ বাবা, বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছ, আমার মুখ উজ্জ্বল করেছ, তোমাব নিজেরও মুখ উজ্জ্বল করেছ—বাঃ, চমৎকার—" উঠে তিনি ঘরের মধ্যে চলে গেলেন—তাঁর চোখ দুটো চক্ চক্ করছে।

জপতপের ফাঁকে ঠাকুমা সব কথা শুনতে পান নি। রিণিকে জিজ্ঞেস করলেন, "ননী ওরকম করছে কেন? অমির কোথায় চাকরী হয়েছে?"

মিনি ঝংকার দিয়ে উঠল, "কোথায় আবার—মিলিটারীতে। এইবার তোমাদের সাধ মিটেছে তো?"

"এঁ্যা, কি বললি!" ঠাকুমা উঠে এসে অমলকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন, "একি করলি দাদা—"

মিনি পাশে দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে রয়েছে, তবুও তার চোখ দিয়ে

কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। রিণি এতক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল, মিনিকে জড়িয়ে ধরে সে ফুঁপিয়ে উঠল।

দুই

ট্রেনিং ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে অমল কেমন যেন একটু ঘাবড়ে গেল। বিরাট এক এলাকা নিয়ে ক্যাম্প চৌহদ্দি, চারিদিকে বারো ফুট উঁচু কাঁটা-তারের বেড়া, ভেতরে সারি সারি লাল রঙের ব্যারাক, মাঝখানে প্রকাণ্ড এক মাঠ। প্রথম দৃষ্টিতেই জেলখানা বলে মনে হয়।

কাঁটাতারের বেড়ার ধার ঘেঁষে পায়ে চলায় পথ, সেই পথ ধরে অমল গেটের দিকে এগুচ্ছে—হাতে তার ছোট্ট একটি স্যুট্‌কেশ। বেড়ার ধারে ছোট একটি দল মাটি কোপাচ্ছে, গাছের গোড়া খুঁড়ছে, চারা পুঁতছে—তাদের সকলেরই পরনে মিলিটারী ইউনিফর্ম। অমলকে দেখে সব ক'টি ছেলে কাজ থামিয়ে তার দিকে চোখ পাকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। অমল কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, ত্রস্তে বারেক নিজের জামাকাপড় দেখে নিয়ে আবার ছেলে-গুলোর দিকে তাকায়। তাদের মধ্যে থেকে একটি ছেলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে, আরও একটা ভেড়া এসে জুটলরে—" বাকী সকলে হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

অমলের মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল—কি অভদ্র ছেলেগুলো! বারেক তাদের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়েই অমল হন্ হন্ ক'রে হেঁটে চলল। কিছু দূর গিয়ে দুটো ব্যারাকের ফাঁক দিয়ে দেখলে, প্রায় জন ত্রিশ ছেলে মাথার ওপর হাত তুলে দৌড়চ্ছে। তাদের সামনে একটা লোক ছোট্ট একটা ছড়ি নেড়ে খুব হম্বিতম্বি করছে, "আ বে গিধ্ধড়, ঠিকসে কদম্ রাখ্—" এদেরও পরনে মিলিটারী ইউনিফর্ম!

অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কেমন যেন তার সন্দেহ হয়, রেলওয়ে ইউনিট বোধহয় এটা নয়! এদিক ওদিক চাইতে চাইতে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলে, একটি ছেলে লম্বা একটা লাঠি হাতে বেড়ার ধারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখলেই বোঝা যায়, সে প্রহরী। অমল তাকে জিজ্ঞেস করলে, "মিলিটারী রেলওয়ে ইউনিটের ট্রেনিং ক্যাম্পটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?"

প্রহরী বললে, "এইটাই।"

অমল বিস্ময়ে বেসামাল হয়ে পড়ে, "এইটাই—!"

প্রহরী বললে, "হ্যাঁ এইটাই। বাইরে থেকেই ঘাবড়ে গেলেন? এখনও তো ভেতরে ঢোকেন নি!"

অমল ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে রইল। ছেলেটি এক পা এগিয়ে এসে চাপা গলায় বললে, "কেটে পড়ুন মশাই, যদি প্রাণে বাঁচতে চান—এই খাঁচার মধ্যে ঢুকলে কিন্তু এক্কেবারে দফা শেষ।"

অমল ক্ষণেকের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোথায় সে পালিয়ে যাবে? বাড়ীতে! অসম্ভব। গেটের দিকেই সে পা বাড়াল। প্রহরী বিড়বিড় ক'রে উঠল, "পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।"

ক্যাম্পের গেট। জনা কুড়ি ছেলে বেল্চা গাঁইতি নিয়ে বিরাট এক ঢিবি কেটে সমতল করছে। অমলকে দেখে জনকয়েক কাজ থামিয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে, "এসেছেন দাদা? আসুন—আসুন—"

অমল থমকে যায়। তার আসার কথা কি এরা জানে নাকি! আর একজন বলে ওঠে, "ওরে বাবা, আর কত শালা আসবে রে!"

সকলে যেখানে কাজ করছে, তারই মধ্যে একজন পরম নিশ্চিন্তে বসে গোঁফে তা দিচ্ছে। এতক্ষণে বোধহয় তার খেয়াল হলো—হঠাৎ সে খেঁকিয়ে উঠল, "এই, বকোয়াস্ মৎ কর্—"অমলের দিকে অঙ্গুলি সংকেত ক'রে বললে, "এই বাবু ইধর আ—"

সম্ভাষণটা অমলের কাছে মোটেই মনঃপুত হয় নি। ইচ্ছে করছিল, কান ধরে লোকটাকে শিখিয়ে দেয়, ভদ্দরলোকের সঙ্গে কেমন ক'রে কথা কইতে হয়। অমলের বিরক্তি দেখে একটি ছেলে বলে উঠল, "চটে লাভ নেই দাদা, উনি হচ্ছেন হাবিলদার সাহেব—আমাদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা—"

সুটকেশটা নামিয়ে রেখে অমল হাবিলদার সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হাবিলদার সাহেব বললে, "ক্যা, রঙরুট হো?"

বিমূঢ় দৃষ্টিতে অমল হাবিলদার সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে রইল। একজন বলে দিলে, "রঙরুট হচ্ছে রিক্রুট কথাটার মিলিটারী সংস্করণ। যত্তো আকাট মুখ্যুর পাল্লায় পড়ে ইংরেজী ভাষার এমনি হাল হয়েছে।"

অমল বললে, "জী সাব, দু'রোজ আগে ভর্তি হুয়া হ্যায়—"রিক্রুটিং অফিসারের চিঠটা হাবিলদার সাহেবের হাতে দিলে। ছেলেদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, "এই রে, ভালো বিপদ বাধিয়েছেন দাদা—কাগজটা হয়তো

উল্টো ক'রে ধরবে—ওসব চাষ-আবাদ কি বাছাধনদের আছে!" পাশের দিকে চেয়ে আর একজনকে বললে, "ওরে রজত যা না বাপু, কাগজটা একটু ভিজিয়ে দে।"

রজত অবশ্য বেরিয়ে এল না। অমল ভাবছিল, এমন নিরক্ষর একটা মানুষ এতগুলো লোকের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হলো কেমন ক'রে! কাগজটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে হাবিলদার সাহেব অমলকে বললে, "ঠিক হ্যায়, রাহ্‌ধারী দপ্তরমে দে দেও—ঔর্ তুম্ আজ আপনা সামান্‌বগেরা ঠিক কর্ লেও—" একটু থেমে আশেপাশে চেয়ে বললে, "মুখার্জি, তুম্ ইস্ বাবুকো আপনা ব্যারিকমে লে যাও, ঔর উধরই এক সীট্ ঠিক কর্ দেও—"

জনকয়েক কপালে হাত ঠেকিয়ে বললে, "জয় মা ধান্যেশ্বরীর জয়—এলেম আছে তোর রজত।"

রজত মুখার্জি বেরিয়ে এসে টপ্ ক'রে অমলের স্যুট্‌কেশটা তুলে নিয়ে বললে, "আসুন আমার সঙ্গে—"

অমল চলতে শুরু ক'রে বললে, "আহা, তা আপনি কেন স্যুটকেশটা নিচ্ছেন—ওটা আমায় দিন।"

রজত নির্বিকার ভাবে চলতে চলতে বললে, "কেবল তো এই প্রথম দিনটার জন্যে—এরপর আপনি মরে গেলেও কেউ আপনার দিকে ফিরেও চাইবে না। কাকেও কোন সাহায্য করা ফৌজি-শাস্ত্রে মহা অপরাধ।"

মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে অমল বললে, "আমাকে পৌছে দিয়ে আবার আপনি ফিরে যাবেন বোধহয়।"

রজত বলে ওঠে, "ক্ষেপেছেন নাকি! সারাদিনের মধ্যে আর মুখটি বার করছি না।"

"হাবিলদার যদি খোঁজাখুঁজি করে?"

"তা যাতে না করে, সে ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছি। শুনলেন না ওরা বললে, 'এলেম আছে তোর রজত'—"

অমল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে রজতের মুখের দিকে চাইলে। রজত বললে, "ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন না বোধহয়?" একটু থেমে আবার বললে, "তা কিছুদিন সময় লাগবে বৈকি। আমিও মশাই পাক্কা একটি মাস হালে পানি পাইনি—তারপর না ঘাঁত্‌ঘোঁত্ সব বার করলুম। ওই হাবিলদারটি হচ্ছে আমাদের ইমিডিয়েট বস্—ওর ওপর আছে এক জমাদার, সে শালা তো কেবল ছোঁড়া জোগাড়ের ধান্দায় থাকে। কাজেই হাবিলদারকে খুশি রাখতে পারলেই আমার

পোয়াবারো। মাঝে মাঝে এক-আধ পাট খাওয়াই—দিনকাল আমার ভালোই কাটছে।”

ব্যারাকের মধ্যে ঢুকে অমল চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। হাসপাতালের ওয়ার্ডের মতো দু সারিতে খাটিয়া, তার ওপর বিছানাগুলো একই কায়দায় সাজানো। লম্বালম্বি একই সারিতে কম্বলগুলো ভাঁজ ক'রে রাখা, তার ওপর মশারী গোল ক'রে পাকানো, কম্বলের সামনে মগ আর প্লেট। খাটিয়ার তলায় সুটকেশ, ট্রাংক, তার ওপর জুতো—

আপন মনে অমল বলে ওঠে, “বাঃ কেমন সুন্দর।”

রজত বললে, “কি?”

অমল বললে, “বিছানা সাজানোর কায়দাটা—”

“সত্যিই সুন্দর! কিন্তু এমনই মজা, আর দু'দিন বাদে আপনিও বিরক্ত হয়ে উঠবেন।”

সুটকেশটা মেঝেয় রেখে অমল একটা খাটিয়ার ওপর বসল। রজত বললে, “বসার আগে চলুন কাজগুলো সেরে আসা যাক—”

“আবার কি কাজ!”

“তেমন মারাত্মক কিছু নয়। অফিসে আপনার এ্যারাইভ্যাল রিপোর্ট করতে হবে, আর স্টোর থেকে কীট্‌ নিতে হবে—তাহলেই আজকের মতো আপনার কাজ শেষ—সেই রোল কলের আগে আর কেউ আপনার খোঁজ করবে না।”

অফিসের দিকে যেতে যেতে অমল রজতকে জিজ্ঞেস করলে, “আপনি এখানে কতদিন এসেছেন?”

রজত বললে, “আর বলবেন না দাদা, পুরোনো পাপী—সেই প্রথম দিনকার ভর্তি। তা আজ মাস পাঁচেক হলো বোধহয়।”

“তা হলে তো ভালোই হলো। আইন-কানুন আপনি সবই জানেন—আমাকে একটু সাহায্য করবেন কিন্তু—”

রজত হেসে উঠল, “এখানে আইনও নেই আর কানুনও নেই। এখানকার আইন আর কানুন হলো কর্তাদের খেয়াল আর মর্জি। একটি কথা সব সময়ে মনে রাখবেন, আপনি হচ্ছেন একটি ভেড়া—ভিড় দেখলেই চোখ বুজে ভিড়ে পড়বেন। ব্যাস্‌, আপনাকে আর কোন মিয়াঁ ধরা-ছোঁয়ায় পাবে না।”

অমল চমকে উঠল, তাহলে ছেলেগুলো তাকে ভেড়া বলে নিছক রসিকতা করেনি!

অফিসঘরের রোয়াকে পৌঁছে রজত হাঁক দিয়ে উঠল, "ওহে মিত্তির, নাও হে তোমার আর একজন নতুন কয়েদী।"

অমলের বুকের মধ্যেটা ছ্যাং ক'রে ওঠে। কয়েদী! ক্যাম্পটা দেখে তারও তো মনে হয়েছিল জেলখানা!

মিত্তির অফিসের হেডক্লার্ক, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ধমক দিয়ে উঠল, "মনে ভেবেছিস কি রজত! এটা কি তোর হাবিলদার সাহেবের ঘর নাকি?"

রজত চট ক'রে যেন সপ্তমে চ'ড়ে গেল, "দেখ্, সব সময়ে হাবিলদার হাবিলদার করিস নি। জানা আছে আমারও কে কাকে কতখানি তেল মাথায়, আর তুমিই বা কি ক'রে জেমস্ খুড়োর পুষ্যিপুত্তুরটি হয়েছ! কেন ক্ষেপাচ্ছিস মাইরি আমাকে, শেষকালে দেব হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে—" অমলের দিকে নজর পড়তেই টপ ক'রে পরের কথাগুলো গিলে নিলে। নরম হয়ে বললে, "যাক্, এঁর নামটা লিখে নাও, আর কীট্ ইন্‌ভেণ্টরিটা দিয়ে দাও দেখি।"

যথারীতি সইসাবুদ দিয়ে, অমলের নাম খাতায় উঠল। কীট ইনভেণ্ট্‌রি নিয়ে স্টোরের দিকে যেতে যেতে রজত হঠাৎ বলে উঠল, "শালারা হিংসেয় মরে যাচ্ছে! আরে বাবা, এলেম্ যদি থাকে, তোরাও ব্যবস্থা ক'রে নে না। আমি কি তোদের মাথার দিব্যি দিয়েছি!"

অমল বুঝতে পারে, রজতের মেজাজ বিগড়েছে। স্টোর থেকে কীট্ নেওয়া পর্যন্ত অমল আর কোন কথা বলে নি। ব্যারাকে ফেরার পথে রজত বললে, "আহা, তা আপনি গুম্ মেরে গেলেন কেন?"

অমলেরও একেবারে চুপচাপ আর একটা মানুষের পাশাপাশি চলতে কেমন বিশ্রী লাগছিল। রজতের মেজাজ পরিবর্তনের আঁচ পেয়ে সে আবার প্রশ্ন করলে, "আচ্ছা রজতবাবু, ট্রেনিং-এর কোর্স কতদিন?"

রজত বললে, "কোর্স-টোর্স বলে এখানে কিছু নেই। প্রতি মাসে অবশ্য একবার ক'রে ট্রেড্ টেস্ট হয়। তেমন তদ্বির যদি করতে পারেন, তাহলে দশদিন ক্লাস এ্যাটেণ্ড ক'রেও আপনি পরীক্ষা দিতে পারেন। আর পাশ করা তো পকেটের জোরের ওপর নির্ভর করে। যারা উন্নতি করার স্বপ্ন দেখে, তারা সাত তাড়াতাড়ি টেস্ট দিয়ে কোম্পানিতে যায়। লাভের মধ্যে সেখানে গিয়ে দিনরাত রগড়ানি খায়।"

"কিন্তু কোম্পানিতে গেলেই তো সেকেণ্ড গ্রেড পায়?"

"ক্ষেপেছেন নাকি! ওসব ছেলে ভুলানো ছড়া। রিক্রুটিং অফিসারের

আর কি—একটি ছেলেকে ভর্তি করতে পারলেই তার পকেটে কর্‌করে তিনটি টাকা। তাই দেখেন না, দয়ার অবতারটি সেজে বসে আছেন।"

অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, "ওঃ, কী সাংঘাতিক!"

ব্যারাকে এসে অমল বোঁচকাটা খাটিয়ার ওপর ফেলতেই একরাশ ধুলো উড়ে এল। পাশের সীট থেকে ছেলেটি তড়াক্‌ ক'রে লাফিয়ে উঠে খেঁকিয়ে উঠল, "আচ্ছা লোক তো মশাই! একটু কমনসেন্সও নেই!"

লজ্জায় অমলের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। রজত রুখে দাঁড়িয়ে বললে, "তুই থাম্‌ দিবাকর—ভারী কমনসেন্সঅলারে! তোমার এটুকু কমনসেন্স হলো না যে, উনি একজন নতুন লোক, কেমন ক'রে জানবেন তোমাদের ওই কম্বলে দেড়মণ ধুলো ভর্তি?"

দিবাকর অমলের সামনে এসে বললে, "কিছু মনে করবেন না মশাই, হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। রাগ কি আর সাধে হয়! শালারা মনে করে কি! ইণ্ডিয়ানরা কি পরিষ্কার বিছানায়ও শুতে জানে না! খোঁজ নিয়ে দেখুন, ওই কম্বলটায় এর আগে অন্তত দুশো জন শুয়ে গেছে—কার কি ব্যামো ছিল, কে জানে!"

অমলের সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠল। হাতের ধুলোগুলো তাড়াতাড়ি ঝেড়ে ফেললে, চট্‌ ক'রে খানিকটা পিছিয়ে গেল।

দিবাকর কাঁধ কুঁচকে বললে, "উপায় নেই মশাই, কোন উপায় নেই—এই হচ্ছে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড।"

রজত অমলকে বললে, "যাক, বিছানাটা লাগিয়ে ফেলুন, তবুও একটু আরাম ক'রে বসতে পারবেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি ঘুরে আসছি, তারপর ক্যানটিনে খেয়ে নেব। এ বেলাটা এদের অল-ইণ্ডিয়া কারি আর ঘুঁটে ব্র্যাণ্ড রুটি নাইবা খেলেন।"

অমল তখনও কম্বলটার দিকে চেয়ে রয়েছে—ঘৃণায় আর আতঙ্কে তার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। দিবাকর তার পিঠের ওপর একটা হাত রেখে বললে, "বুঝলেন মশাই, এখানকার এই হলো ব্যবস্থা, আর এ ব্যবস্থা আমাদের মানতেই হবে।"

অমল হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, "মানতেই হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এই রকম একটা অস্বাস্থ্যকর ব্যাপারের দিকে যদি আমরা অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, তাহলে নিশ্চয়ই একটা বিহিত হবে।"

রজত হো হো ক'রে হেসে উঠল, "নতুন নতুন এই রকম মনে হবে

অমলবাবু, আর কিছু দিন যাক্, তখন দেখবেন বিহিত করার কথা মনের ধারে-কাছেও আসবে না। যাক্, আপনি আপনার কাজগুলো সেরে ফেলুন, আমি আসছি ঘুরে—"রজত ব্যারাক থেকে বেরিয়ে গেল।

দিবাকর আবার তার খাটিয়ার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। অমল তখনও সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে কম্বলটার দিকে চেয়ে।

ঘাড়টা কাৎ ক'রে দিবাকর বললে, "বুঝলেন মশাই, এক কাজ করুন। কম্বলটা মাঠে নিয়ে গিয়ে বেশ ক'রে ঝেড়ে ফেলুন, তারপর ঘাসের ওপর পেতে দিন। ঘণ্টা তিন-চার কড়া রোদ পেলে ডিসইন্‌ফেক্‌টেড হয়ে যাবে।"

অমল যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তখনই কম্বলটা নিয়ে বেরিয়ে গেল—ঝেড়েঝুড়ে রোদে দিয়ে আবার ফিরে এল। দিবাকর ইশারা ক'রে অমলকে কাছে ডেকে বললে, "আজ সকালে এসেছেন বুঝি ?"

অমল মাথা নেড়ে জানাল, "হ্যাঁ।"

"তা ওই রজতটা আপনার সঙ্গে ভিড়ল কি ক'রে ?"

সমস্ত ব্যাপারটা শুনে দিবাকর বললে, "ওই চীজ্‌টির সঙ্গে একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন।"

"কেন বলুন তো ?"

"সে কথা বুঝতে আপনার খুব বেশী দেরী লাগবে না। আপনাকে তো ক্যানটিনে নেমন্তন্ন করেছে, দেখুন কোন দিক থেকে টোপ্ ফেলে—"

ব্যারাকের দক্ষিণপ্রান্ত থেকে একটি ছেলে হাঁক পাড়ল, "কিরে দিবাকর, খেয়াল আছে কটা বাজল ?"

দিবাকর আপন মনে বলে উঠল, "কলুর বলদের আবার খেয়াল থাকাথাকি কি ! ঘানিতে তো জোতাই রয়েছি—ল্যাজমলা দিলেই চলতে শুরু করব—" কয়েকটা আড়ামোড়া ভেঙ্গে সে উঠে পড়ল। স্যুটকেশের চাবি খুলতে খুলতে অমলকে বললে, "এমন আকালের জায়গা আর কোথাও পাবেন না মশাই, তেলের শিশি, দাঁতের মাজন, সাবান, এমনকি টুথ্‌ব্রাশটা পর্যন্ত বাইরে রাখার উপায় নেই— তেল মেখে, সাবান আর গামছা নিয়ে বললে, "চলুন স্নানটা সেরে আসা যাক্—এখন তবুও কলের টাট্‌কা জল পাবেন—"

অমল্ জামা ছেড়ে গেঞ্জিটা খুলতে ইতস্তত করছে। দিবাকর তাড়া লাগল, "নিন মশাই তাড়াতাড়ি, আবার তো দশটায় ঘণ্টা পড়বে।"

অমল জিজ্ঞেস করলে, "কিসের ঘণ্টা ?"

"আর কিসের ! খাওয়ার—খেয়েই ছোটো ক্লাসে। এগারটা থেকে চারটে

পর্যন্ত ক্লাস। দেখুন না, সকালে একঘণ্টা পি. টি. হওয়ার কথা, তার জায়গায় সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত করাবে "ফেটিগ্।"

বিস্মিত কণ্ঠে অমল প্রশ্ন করে, "ফেটিগ্!"

মাথার তালুতে বাঁহাতের চেটো দিয়ে তেল ঘষতে ঘষতে দিবাকর বললে, "হ্যাঁ মশাই ফেটিগ্—মিলিটারীতে এইতো মাত্র দুটি কাজ—প্যারেড্ আর ফেটিগ্। বাঁধন ছিঁড়ে যাবে মশাই, মাটি কাটতে কাটতে আর কুলির মতো বস্তা বইতে বইতে—এরই নাম ফেটিগ্।"

অমল আর দিবাকর স্নানের জায়গায় এসে পৌঁছল। প্রকাণ্ড লম্বা হৌজ্, ডজনখানেক কল দিয়ে তোড়ে জল পড়ছে—চারপাশে তার সিমেণ্ট বাঁধানো চত্বর। ছেলেরা চারিদিক ঘিরে স্নান করছে। অমল দেখলে, সকলেই সাবান মাখছে, টুথ্ব্রাশে দাঁত মাজছে। মনে পড়ল তার, রিক্রুটিং অফিসের সামনের সেই ভিড়—সেখানে মানুষগুলোকে কেমন আলাদা আলাদা চেনা গিয়েছিল—কিন্তু এখানে সব যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

একটা রব উঠল, "এইরে দেবদাস আসছে!"

একটি বছর ত্রিশের যুবক টুথ্ব্রাশ মুখে চৌবাচ্চার চাতালে এসে দাঁড়াল। অমল ভেবে পেলে না, এর আগমনটা হঠাৎ এমন উদ্বেগের সৃষ্টি করল কেন!

দিবাকর বললে, "দোহাই দেবদাস, আমার স্নানটা হয়ে যাক্"।

দেবদাস মুখভর্তি ফেনা নিয়ে বললে, "তুমি কি এমন ষোল বছরের ছুঁড়িটি যে তোমার লজ্জা করবে?"

দিবাকর তার চুলভরা বুকে সাবান ঘষতে ঘষতে বললে, "কেন, লজ্জাসরম বুঝি কেবল ছুঁড়িদের বেলায় আর তুমি একটা বুড়োমদ্দ এতগুলো লোকের সামনে উলঙ্গ হয়ে নাচবে, সেটা বুঝি খুব বাহাদুরী!"

দেবদাস ভারিক্কি গলায় ঘোষণা করলে, "এখানে যারা লজ্জাবতী লতা আছ—তারা চোখ বন্ধ কর।"

অমল সবিস্ময়ে দেখলে, দেবদাস সত্যিই উলঙ্গ হয়ে মাথায় জল ঢালছে।

স্নান সেরে ব্যারাকে ফিরে দিবাকর মগ আর প্লেট নিয়ে খেতে চলে গেল। অমল ভাবছিল, খাওয়াটা সেরে নিলেই হতো। রজত সম্বন্ধে এই সময়টুকুর মধ্যে সে যতটুকু জেনেছে, তাতে তার সঙ্গে এইটুকু আলাপই যেন তাকে সংকুচিত করে তুলেছে। খাওয়া সেরে ফিরে এসে দিবাকর ধীরে ধীরে ইউনিফর্ম পরলে। কম্বলের ভাঁজের মধ্যে থেকে বইখাতা বার করলে। যাওয়ার সময় অমলকে বললে, "খেয়ে নিলেই পারতেন—রজতের কথা তো!"

ধীরে ধীরে ব্যারাক থেকে সমস্ত ছেলেই বেরিয়ে গেল। কেবল একটি ছেলে আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে। তার জ্বর হয়েছে। অমল ভাবছিল, অসুখ-বিসুখ করলেও কি কেউ দেখে না! তার ইচ্ছে হচ্ছিল, ছেলেটির কাছে বসে তার একটু শুশ্রূষা করে।

হন্তদন্ত হয়ে রজত ব্যারাকে ঢুকে বললে, "চলুন অমলবাবু, খাওয়াটা সেরে আসা যাক্—"

অমল বললে, "স্নানটা সেরে নিন্—"

রজত বললে, "না, সেটা না হয় বিকেলে করা যাবেখন।"

ব্যারাক থেকে বেরিয়ে অমল বললে, "আচ্ছা রজতবাবু, ওই যে ভদ্রলোকটির জ্বর হয়েছে—ওঁকে দেখাশোনা করার কি কোন ব্যবস্থা নেই?"

"কেন, সিক এন. সি. ও. তো সকালে ওষুধ দিয়ে গেছে, আবার ঠিক এগারোটার সময় ডায়েট দিয়ে যাবে। সে বিষয়ে ভাববার কিচ্ছু নেই—অনুষ্ঠানে ত্রুটি এখানে পাবেন না।"

ক্যানটিনে ঢুকে ভাত আর ফাউল-কারির অর্ডার দিয়ে রজত বললে, "জানেন অমলবাবু, শুধু এই ক্যানটিনটার জন্যে আমাদের লঙ্গরের রান্না অত খারাপ। ক্যাম্পের অর্ধেক ছেলে বোধহয় তাদের মাইনের সবটাই এখানে খরচ করে, আর মাইনের তো ওই বহর—পঁচিশ, তিরিশ, পঞ্চাশ—তা থেকে আর বাড়ীতেই বা পাঠাবে কি?"

অমল বললে, "এটা কিন্তু ছেলেদের খুব অন্যায়।"

"অন্যায় তো আপনি বললেন, কিন্তু তারাই বা করে কি? খাওয়ার জন্যেই তো মিলিটারীতে ঢোকা, আর খেতেই যদি না পারল, তাহলে তো মশাই বাড়ীতে প'ড়ে প'ড়ে মরতে পারত!"

"লঙ্গরের রান্না এত খারাপ হওয়ার কারণ?"

"কারণটা অতি সরল। একেবারে ত্রিশক্তি অনাক্রমণ চুক্তি। ক্যানটিনের মালিক টাকা খাওয়ায় ও. সি-কে, খদ্দের পাওয়ার জন্যে। আবার ওদিক থেকে লঙ্গরের কনট্রাকটর খারাপ রান্না চালু রাখার জন্যে টাকা দেয় ও. সি-কে। আর আমাদের ও. সি. দুদিক থেকে টাকা খেয়ে ছেলেদের ডাণ্ডার ডগায় ঠাণ্ডা রেখেছেন। কেমন চমৎকার ব্যবস্থাটা বলুন তো?"

অমল আরও একবার আঁতকে উঠল, "কী সাংঘাতিক!"

মাংস আর ভাত দিয়ে গেল। আহা, মাংসের কী চেহারা—গন্ধেই যেন জিভে জল আসে! রজত খেতে আরম্ভ ক'রে বললে, "আপনার ওসব চলে-

টলে নাকি অমলবাবু?"

"কি সব?"

"এই একটু-আধটু তরল পদার্থ আর কি!"

অমল শক্ত হয়ে ওঠে—কৃতজ্ঞ চিত্তে দিবাকরকে স্মরণ ক'রে বললে, "না।"

রজত কথার ওপর মোচড় দিয়ে বললে, "আপনি যে দেখছি নিতান্তই বেরসিক মশাই! এটা না চলে, ডব্লিউ স্কোয়ারের অপরটাতে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না?"

অমল বিরক্তির সুরে বললে "না আমার কোনটাই চলবে না।"

আপনি যে দেখছি একেবারে নাবালক—নাঃ, আমাকেই দেখছি শেষ পর্যন্ত আপনাকে গড়েপিটে মানুষ করে নিতে হবে।"

খাওয়ার স্পৃহা অমলের উবে গেছে। ভাতের প্লেট থেকে ঝট ক'রে হাত সরিয়ে নিয়ে বললে, "তার মানে?"

রজত মুচকি হেসে বললে, "আপনি তো দেখছি আচ্ছা ছেলেমানুষ! রাগ না হয় আমার উপর করুন, কিন্তু ভাতগুলো কি দোষ করল?" একটু থেমে কনুই দুটো টেবলের উপর রেখে বললে, "ব্যাপারটা কি জানেন? যস্মিন দেশে যদাচারঃ। মিলিটারীতে ঢুকেছেন, মিলিটারীই আপনাকে হতে হবে। এখন না হয় ট্রেনিং ক্যাম্পে আছেন—বেশ মজায় আছেন! কিন্তু কোম্পানিতে যখন পোস্টেড হবেন, ওভারসীজ যখন যাবেন—তখন তো কেবল প্যারেড আর প্যারেড—ওঠাও রাইফেল—নামাও রাইফেল। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা—প্রাণটা যে হাঁপিয়ে উঠবে। তাই ফুর্তি চাই, সৈনিকের জীবনে ফুর্তি চাই—কোম্পানিই আপনাকে মদ, মাগী, সবই যোগাবে। তা না হলে কয়েদীর জীবন আর গরু-ভেড়ার মতো ব্যবহার পেয়ে যে ক্ষেপে উঠবেন মশাই! সহ্য করতে পারবেন না, কোন সহজ মানুষই পারে না—তখন তো ছুটবেন বিহিত করতে? ব্যস, হয় ফাঁসিতে লটকে, না হয় গুলি ক'রে আপনার ভবযন্ত্রণা শেষ ক'বে দেবে।"

অমলের সমস্ত শরীরটা যেন বারকয়েক কেঁপে ওঠে—চাপা একটা আর্তনাদ বুকের মধ্যে আছাড়িপিছাড়ি খেতে থাকে। রজতের আবেগময় মুখখানার দিকে সে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে।

রজত আবার বলতে আরম্ভ করলে, "মদ খাওয়ার অভ্যেস আমারও কোনদিন ছিল না। আরে মশাই, বিড়ি খাওয়ার পয়সা জুটত না, তা আবার মদ! কিন্তু এখানে আসার মাসখানেকের মধ্যেই মদ ধরেছি। বেড়ে আছি মশাই! সারাটা দিন ফাঁকিফুঁকি দিয়ে কোন রকমে কাটিয়ে দিই। সন্ধ্যের পর

আপনারা যখন ওই মড়ার খাটগুলোর ওপর শুয়ে জাবর কাটেন, আমি তখন একটি পাঁট টেনে বুঁদ। তখন আমিই বা কে আর শালা লাটসাহেবই বা কে!"

অমলের কানদুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে। রজত যেভাবে বলছে, তাতে যেন সত্যিই লোভ জাগে!

রজত ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ এঁটো হাতেই অমলের ডান হাতটা চেপে ধরে বলে উঠল, "চলুন মাইরি, একটা দিন না হয় চেখেই দেখুন। কোন রোগ যে হবে না, সে বিষয়ে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি"—রজতের চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে উঠেছে, মুখটা থম্‌থম্ করছে, কথাও কেমন জড়িয়ে গেছে।

অমল ঘেমে উঠেছে—আর রীতিমত ভয় করছে। ঝট ক'রে উঠে পড়ে সে বললে, "আমি চললুম রজতবাবু—"

বিকেল বেলা। টেকনিক্যাল ক্লাস থেকে ছেলেরা ফিরে এসেছে—ব্যারাক আবার সরগরম। অসীম ব্যস্ততার সঙ্গে জনকয়েক বিছানা পাতছে। কেউ কেউ স্নান সেরে ধুতি-পাঞ্জাবী পরছে। অমল দিবাকরকে জিজ্ঞেস করলে, "এরা সব যাচ্ছে কোথায়?"

দিবাকর বললে, "নানান লোকের নানান যাওয়ার জায়গা। কেউ যাবে বাড়ী, যাদের বাড়ী কাছেই। কতক এমনি খানিকটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ফিরে বেড়াবে—হোটেল, রেস্টুরেণ্টে মুখ বদলে আসবে। কতক যাবে মদ আর মাগীর সন্ধানে, আর কতক স্টেশনে বসে মেয়ে দেখবে।"

অমল বললে' "তা আপনি যে কোথাও গেলেন না?"

"না, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ভালো লাগে না, তাছাড়া বেরুলেই পয়সা খরচ। আর 'ম'কার ব্যাধিটা এখনও ধরেনি। শনিবার দুপুরে ক্লাসের পর বাড়ী যাই আর সোমবার পি. টি-র সময় ফিরে আসি। আমি মশাই ছাপোষা মানুষ, মাগছেলে নিয়ে ঘর করতে হয়, ওসব উড়নচড়েমি আমাদের মানায় না।"

অমলের মনে হয়, দিবাকরের কথা বলার ধরনটাই কেমন যেন অশ্লীল। এরকম ভাষায় আলাপ করতে তার কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকে। কিন্তু অনেকবার অনেকভাবে লক্ষ্য ক'রে দেখেছে, নিছক অশ্লীলতা করার জন্যে তো দিবাকর এভাবে কথা বলে না!

দিবাকর অমলের খাটের দিকে নজর ক'রে বললে, "কই অমলবাবু, আপনার কম্বল তুলে নিয়ে এলেন না?"

অমল বললে, "এই যা, একেবারে ভুলে গেছি।"

"তা ভালোই হয়েছে, বেশ গরম হয়েছে—শুয়ে আজ বেশ আরাম পাবেন। রোজই ভাবি, কম্বলটা রোদে দেব। তা কি ছাই দেওয়ার যো আছে! ড্রেসিঙের জন্যে চব্বিশ ভাঁজ আপনাকে রোজ করতেই হবে!"

অমল কম্বলটা তুলে এনে ভাঁজ করতে লাগল। দিবাকর বললে, "ওরকম ভাঁজ করবেন না। প্রথমে চওড়া দিক থেকে দু'ভাঁজ ক'রে ফেলুন, তারপর লম্বালম্বি তিন ভাঁজ। ব্যস, এইভাবে পেতে রাতটা কোন মতে কাটিয়ে দিন। সকাল বেলায় উঠে, ওটাকে আবার চার ভাঁজ ক'রে দেবেন, তাহলেই আপনার ড্রেসিঙের ভাঁজ হয়ে গেল।"

দিবাকরের নির্দেশ মতো ভাঁজ ক'রে কম্বলটা খাটিয়ার ওপর পেতে অমল বললে, "এ যে অনেক ছোট হয়ে গেল, পা বেরিয়ে পড়বে যে!"

"তা একটু পড়বে বৈকি—রাত্তিরে আর কতক্ষণই-বা আরাম ক'রে ঘুমোবেন! একদিন দু'দিন অন্তর অন্তর মাঝরাতে উঠে দু'ঘণ্টা করে লাঠি ঘাড়ে টহল দিতেই হবে—তার ওপর কোয়ার্টার গার্ড ডিউটি আছে সপ্তাহে একদিন, সেদিন তো আপনার কোয়ার্টার গার্ডেই রাত্রিবাস—"

কম্বল পেতে কীট্‌গুলো নাড়াচাড়া ক'রে দেখলে, বিছানার সরঞ্জাম ওইখানেই শেষ! আর যা কিছু রয়েছে, সে তো জামাকাপড়! অমল বললে, "চাদর-বালিশ আবার কবে দেবে?"

দিবাকর হো-হো ক'রে হেসে উঠল, "তবুও ভালো যে শুধু চাদর আর বালিশ চেয়েছেন—একটা বৌ যে চান নি, এই রক্ষে। আরে মশাই, ওরা জানে, আমরা লোটা-কম্বলওয়ালার জাত। তবুও আমাদের বরাত ভালোই বলতে হবে যে, গান্ধীজীকে দেখে একটা ক'রে ল্যাঙোট দিয়েই পোশাক শেষ করে নি। চাদর-বালিশ আপনাকে বাড়ী থেকে আনতে হবে।"

অমল হতভম্ব হয়ে দিবাকরের দিকে চেয়ে আছে—শুধু একটা কম্বলের ওপর একটা মানুষ শোবে কি ক'রে!

দিবাকর বললে, "এক কাজ করুন, ফালতু জামাকাপড়গুলো ভাঁজ ক'রে আর একটা জামার মধ্যে পাকিয়ে ফেলুন, আর আপনার গামছাটা পেতে দিন কম্বলটার ওপর। ব্যস, আপনার বালিশ আর চাদর দুইই হয়ে গেল।"

ব্যারাক প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। বাকী যারা আছে, তারা ছোট ছোট দলে নানান জায়গায় ছড়িয়ে আছে। কোথাও দুটো খাটিয়া জোড়া লাগিয়ে চলেছে তাস, কোথাও জনচারেকের মধ্যে রাজনীতির তর্ক, কোথাও 'সঞ্চয়িতা'

থেকে একজন কবিতা পড়ছে আর জন দুই-তিন গালে হাত দিয়ে বসে শুনছে, কোথাও একজন নাতিউচ্চ স্বরে গান ধরেছে আর জনকয়েক দেশলাইয়ের খোলে আঙুল ঠুকে তাল দিচ্ছে, জনকয়েক লম্বা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, জনকয়েক খাটিয়ার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে চিঠি লিখছে। অসুস্থ সেই ছেলেটি মুখ থেকে কম্বলের ঢাকা সরিয়ে আর একটি ছেলের সঙ্গে গল্প করছে—অপর ছেলেটি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ব্যারাকের ছোট্ট জানালাগুলো দিয়ে খানিকটা আলো এসে তখনও ব্যারাকের মধ্যে ঢুকছে। আলো আর অন্ধকার পাশাপাশি যেন ব্যারাকের দেয়ালে দেয়ালে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যারাকের মধ্যেকার সবকটি ছেলেই প্রায় চুপ হয়ে গেছে, কেবল গায়ক সেই ছেলেটির গানের স্তিমিত সুর তখনও ভেসে বেড়াচ্ছে। অমলের মনটা ভারী হয়ে উঠেছে—এই আবহাওয়ার বাইরে ছুটে যাওয়ার জন্যে তার মনটা আকুলিবিকুলি করছে।

খন্‌খন্‌ ক'রে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল! অমল দিবাকরের দিকে ফিরে চাইলে। দিবাকর বললে, "খাওয়ার ঘণ্টা।"

এ দরজা, সে দরজা, ও দরজা দিয়ে অনেকগুলো ছেলে হুড়মুড় ক'রে ব্যারাকে এসে ঢুকল—যার যার খাটিয়ার তলা থেকে মগ আর প্লেট নিয়ে আবার তারা তেমনি হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে গেল। দিবাকর মগ ভর্তি জল আর প্লেটটা নিয়ে বললে, "চলুন অমলবাবু, দুটি খেয়ে আসা যাক্—এ বেলা তো আর রজতের নেমন্তন্ন নেই"।

লজ্জায় অমল কুঁচকে উঠল। রজতের নেমন্তন্ন-রহস্য দিবাকরও জানে নাকি! কে জানে, হয়তো সে-ও একজন ভুক্তভোগী!

ওরা দুজনে লম্বা একটা লাইনের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অমল দেখলে, কিছু দূরে আরও একটা লাইন। জিজ্ঞেস করলে, ওদিকে আবার লাইন দিয়েছে কারা?"

"মুসলমানেরা—তাদের আলাদা লঙ্গর কিনা।"

"কেন, মুসলমানেরা বুঝি আমাদের সঙ্গে খেতে চায় না?"

"মোটেই তা নয়—ওদের জাত আমাদের মতো এত ঠুন্‌কো নয়।"

"তবে যে আমরা বণ্ডে সই করলাম, জাতিধর্ম নির্বিশেষে একই সঙ্গে থাকতে ও খেতে হবে!"

"বুঝলেন না, ওটা হচ্ছে কর্তাদের সুবিধের জন্যে। যতদিন ডাইনিং হল তৈরি হয় নি, ততদিন দিব্যি আমরা একই সঙ্গে খেয়েছি। কিন্তু যেই ডাইনিং

হলটি তৈরি হলো অমনি ধর্মের ওপর ওঁদের দরদ উথলে উঠল। জানেন তো এদের ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল পলিসি।"

এক পা এক পা ক'রে ওরা এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে পাশে কাৎ হয়ে দেখে নিচ্ছে, সামনে আর কতজন। দিবাকর ফোঁস ক'রে উঠল, "দেবে তো শালারা এক চাঙড়া ভাত আর এক হাতা কেলে ডাল—"

অমল বললে, "শুধু ডাল আর ভাত!"

"তা ছাড়া আর কি! কে আপনার কোলের মাগটি এখানে আছে যে আপনার জন্যে পাঁচ-ব্যান্নন ভাত রাঁধবে! তাও যদি আবার ডাল ভাতের চেহারা দেখেন, আপনার অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত উঠে আসবে।"

অমল পরিবেশনকারীর সামনে এসে পড়েছে। প্লেট পাততে বিরাট এক ডেলা ভাত একটা খোস্তা ক'রে তুলে তার প্লেটের ওপর ধপ ক'রে ফেলে দিলে। নিরেট ডেলাটা প্লেটের একপাশে পড়তে, প্লেটটা বেসামাল হয়ে পড়ল —দু-হাতে ধরে অমল প্লেটটা সামলে নিলে। পরিবেশনকারী খ্যাঁক ক'রে উঠল, "ক্যারে, বিলকুল নয়ি রঙরুট হো?"

ভাত রাখার জন্যে বিরাট এক বাথটাব্—তার পাশে টিনের ক্যানেস্তারায় ডাল। ডাল পরিবেশনকারী গানের সুরে হাঁক পাড়ল—

আরে আ যা রঙরুট,
ঘরমে মিলতা শুখা চাপাটি,
ফৌজমে মিলেগা ফ্রু-রুট,
আরে আ যা রঙরুট।

অমল এগিয়ে গিয়ে ভাতসুদ্ধ প্লেটটা পেতে ধরলে। একহাতা ডাল প্লেটের ওপর ঢেলে দিতেই, খানিকটা উপচে তার গায়ে পড়ল। অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—তার মুখখানা রাগে থম্‌থম্ করছে, সমস্ত শরীরটা কাঁপছে থরথর ক'রে। দাঁতে দাঁত চেপে সে লোকটার মুখের দিকে কটমট ক'রে চাইলে। খোশ মেজাজে পরিবেশনকারী ততক্ষণে তার পরের কলি ধরেছে—

আরে আ যার ঙরুট,
ঘরমে মিলতা ফাট্টা কাপ্‌ড়া,
ফৌজমে মিলেগা স্যু-উ-ট,
আরে আ যা রঙরুট।

দিবাকর পেছন থেকে অমলকে আস্তে ঠেলা দিলে। অমল এগিয়ে গেল। তখনও তার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে রয়েছে। সে ভাবছিল, দরিদ্রনারায়ণ

সেবার নামে কাঙালীভোজনের মতো বর্বর অনুষ্ঠান সে অনেক দেখেছে। কিন্তু এরা অন্ন বিতরণ করছে কাদের !

খানা নিয়ে দিবাকর অমলের পাশে এসে বললে, "প্রথম প্রথম দিনকতক একটু কষ্ট হবে অমলবাবু, তারপর এই সমস্তই গা-সহা হয়ে যাবে।"

চমৎকার সান্ত্বনা—অমল একথা এই একটি দিনের মধ্যে বহুবার শুনেছে। মন বিরোধী হয়ে উঠলেও সে চুপ ক'রে থাকে। দিবাকর বলে চলেছে, "এই হলো ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড। একজন ইণ্ডিয়ানের জন্যে দৈনিক খাই-খরচ বাবদ গভর্ণমেণ্ট বরাদ্দ করেছে পাঁচ আনা। বেচারা কনট্র্যাক্টর তো আর অন্নছত্তর খুলে বসে নি !"

ডাইনিং হলে এসে ওরা ঢুকল। লম্বা একটা হল, সিমেণ্ট করা মেঝে। বসার বন্দোবস্ত, ছেলেরা ইট কুড়িয়ে এনে নিজেরাই ক'রে নিয়েছে—খাচ্ছে উবু হয়ে বসে সামনে প্লেট রেখে। দিবাকরকে দেখতে পেয়ে একটা কোণ থেকে একটি ছেলে হেঁকে উঠল, "এই দিবাকর, কাঁচা লংকা আছে রে ?"

দিবাকর অমলকে বললে, "আসুন ওইদিকে।" হাফ প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা কাঁচা লংকা বার ক'রে ছেলেটির হাতে দিয়ে তার পাশের ইটটায় বসে পড়ল। দূরে একটা ইট দেখিয়ে অমলকে বললে, "ওইটা টেনে নিয়ে বসে পড়ুন অমলবাবু।"

ইট না নিয়ে অমল এমনি উবু হয়ে বসল। দিবাকর বললে, "জানেন অমলবাবু, এই সমর প্রথম দিন ভাতের প্লেট ছুড়ে লাঙ্গরীদের মেরেছিল—তার জন্যে ওর শাস্তি হয়েছিল পিঠ্‌ঠু প্যারেড।"

অমল জিজ্ঞেস করলে, "পিঠ্‌ঠু প্যারেডটা আবার কি জিনিস ?"

দিবাকর বললে, "জিনিস অতি মনোহর। একটা প্যাকের মধ্যে অন্তত আধমণ ইটপাথর পুরে পিঠের ওপর ঝুলিয়ে দেবে। তারপর করাবে মার্চিং। প্রথমে কুইক মার্চ—তারপর ডবল মার্চ—তারপর মাথার ওপর দুহাত তুলে ডবল মার্চ। সমর বলেই তাই সামলাতে পেরেছিল। কত ছেলে যে মশাই লটকে পড়ে—"

সমর বললে, "কিন্তু ছেলেরা এ সব জুলুম খুব বেশীদিন সহ্য করবে না—সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে !"

দিবাকর বললে, "কি আর করবে! একটু ট্যাঁ-ফুঁ করলেই তো দেবে কোম্পানিতে চালান ক'রে।"

সমর বললে, "দু'একজনের বেলায় ওই রকমই হবে, কিন্তু সব ছেলে মিলে

একবার বেঁকে দাঁড়ালেই বাছাধনরা ঠাণ্ডা।”

দিবাকর বললে, “ওই আনন্দেই থাক—তোমার বিশমণ তেলও পুড়েছে আর রাধাও নেচেছে! শালা কনট্র্যাক্টর তো জমাদার, হাবিলদার, আর তার লেজুড়দের জন্যে আলাদা রান্না ক'রে খাওয়াচ্ছে। তুমি ও. সি-র কাছে গিয়ে নালিশ করবে, ‘খাবার খারাপ’—আর জমাদার, হাবিলদার গিয়ে বলবে, ‘বহুৎ আচ্ছা খানা সাব, ঘরমেভি ঐসা নহি মিলতা।’ ব্যস, তুমি হয়ে যাবে রিঙ-লিডার—ও. সি. দিব্যচক্ষে দেখতে পাবে ক্যাম্পের মধ্যে চলেছে কনসপিরেসি ফর মিউটিনি! অমনি তুমি চালান হয়ে যাবে ঠাণ্ডি গারদ। আর আমরা, বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলব, ‘সমরটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ—স্থান, কাল, পাত্তর বোঝে না!’ আমি তো যা বুঝি, মুখটি বুজে কোনমতে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে যাও—আরে বাবা বুঝলে না, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।”

ভাতের প্লেট অমলের সামনে যেমনকে তেমনি প'ড়ে রয়েছে। সে শুনছে দিবাকরের কথা, আর দেখছে তার থেকে কিছু দূরে একটি ছেলে ভাতের প্লেটটা উল্টে দিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, “শালারা যদি আমাদের কয়েদী মনে ক'রে থাকে, তাহলে তো লপসী দিলেই পারে—”ক্ষণেকের জন্যে সে তার চারপাশের ছেলেগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ সে এক লাফে খানিকটা এগিয়ে যায় ডাইনিং হলের পাশে লঙ্গরখানার দিকে—ক্রোধে ফেটে পড়ে, “চল, শালাদের লঙ্গরে আজ আগুন ধরিয়ে দেব—”

দিবাকর অমলকে ঠেলা দিয়ে বললে, “খেয়ে নিন অমলবাবু—ও ব্যাপার এখানে হামেশা ঘটছে। লাভের মধ্যে ছোঁড়াটার আজ আর খাওয়া হলো না।”

খাওয়ার পালা শেষ ক'রে সব ব্যারাকে ফিরেছে। আবার সব আপন দলে ভাগ হয়ে আড্ডা জমিয়েছে। অমল আশ্চর্য হয়ে দেখে, ব্যারাকে ফেরার পর খানার কথা বোধ হয় কারও একবর্ণও মনে নেই—

দিবাকর হাতমুখ মুছে গামছাটা মশারির দড়ির ওপর মেলে দিয়ে বললে, “এততেও শালাদের মন ভরে না। এরপরও আবার রোলকল—যেন খোঁয়াড়ে গরু গিনতি করবে।”

দিবাকর আর অমলকে এক এক খিলি পান দিয়ে সমর বললে, “জানিস, জগৎ সিংহিটা দেখি রেলওয়ে কোয়ার্টারের রকে বসে রয়েছে।”

দিবাকর বললে, “টেঁশো ছুঁড়িগুলো নাকি সব ওর প্রেমে পড়ে গেছে!”

“হ্যাঃ, আর লোক পেলে না কিনা! কোনদিন মারধোর খাবে আর কি!”

“তা কি আর করবে বল। সারাদিনটা তো কাটছে এদের হুকুম তামিল

করতে। যে সময়টুকু ফাঁক পায়, সে সময়টা নিয়ে কি করবে তাই বল ?" অমলের দিকে ফিরে বললে, "আচ্ছা অমলবাবু, আপনিই বলুন, একটা জোয়ান-সোমত্ত পুরুষ ব্যাটাছেলে, তার মনের খোরাক তো কিছু চাই। কিন্তু এরা তার কোন ব্যবস্থাটা করেছে? তাই মন তাজা রাখার জন্যে মদ, মাগী, গুণ্ডাবাজি ক'রে বেড়ায়—"

অমল বললে, "কেন, আমরা নিজেরাই তো এক জায়গায় বসে একটু-আধটু পড়াশুনো, গান বাজনা, খেলাধুলো ক'রে সময় কাটাতে পারি—"

দিবাকর বললে, "আপনি যতটা সহজ ক'রে বললেন অমলবাবু, কাজটা কিন্তু অত সহজ নয়। ওরকম কিছু একটা করতে পারলে তো আমরা মানুষ হয়ে যেতুম—" দিবাকর যেন ঝিমিয়ে যায়, আপন মনেই বলতে থাকে, "বুঝি, কাজগুলো খুবই খারাপ—আমি ওকে বারণও করেছি। কিন্তু বার বার মনে হয়, এই ছেলেগুলো তো আগে এমন বদ ছিল না—কিন্তু মিলিটারীতে ঢুকেইবা এমন কেন হয়?"

হুইসিল বেজে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে হাঁক, "রুলকলকে লিয়ে ফল্-ইন—"

ছেলেরা আড়ামোড়া ভেঙে, মাথায় ফোরেজ ক্যাপ লাগিয়ে গজগজ করতে করতে মাঠের দিকে চলল। একজন ল্যান্স-নায়েক ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ব্যারাকের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হেঁকে চলল, "ব্যারিকমে কোই নাহি রহেগা—চলো সবকোই রুলকলমে—"

রোলকলে দাঁড়িয়ে অমল দেখলে, অনেক লোক, অন্তত পাঁচ ছ'শো তো বটেই। ব্যারাক ব্যারাক ভাগ হয়ে চতুষ্কোণ আকারে দাঁড়িয়েছে। হাবিলদার সাহেব হাঁকলেন, ঠিকসে স্কুকের ফরমেশনমে ফল্-ইন—"

দিবাকর অমলকে বললে, "হাবিলদার কি বললে বলুন তো ?"

অমল বললে "ওই যে স্কুকের ফরমেশন না কি যেন—"

"বললে, স্কোয়ার ফরমেশন—"

অমল খুঁক খুঁক করে হেসে উঠল। দিবাকর বললে, "সাবধান, ও বেটা যদি দেখতে পায়, তাহলে আর রক্ষে রাখবে না।"

যথারীতি বারকয়েক এ্যাটেনশান, স্ট্যাণ্ড-এ্যাট-ইজ হওয়ার পর পার্ট ওয়ান অর্ডার পড়া শুরু হলো। একটি লোক অনর্গল অদ্ভুত একটা শব্দ ক'রে চলল। অমল ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞেস করলে, "কি ভাষা বলছে ?'

দিবাকর বললে, রোমান উর্দু।"

তারপর ব্যারাক-কমাণ্ডারদের রিপোর্ট। ব্যারাকের নম্বর ধরে হাবিলদার

ডাক দেয়, আর ব্যারাক-কমাণ্ডাররা তড়বড় ক'রে কি সব যেন বলে। অমল তার একবর্ণও বুঝতে না পেরে দিবাকরের শরণাপন্ন হলো, "কি বলছে ওরা ?"

দিবাকর বললে, "ব্যারাকের লোকের হিসেব দিচ্ছে। ওই যে বললে, 'দো রাহধারী—তিন সিক—বাকী ঠিক', তার মানে, দুজন ছুটি নিয়ে বাইরে গেছে, তিনজনের অসুখ, বাকী সকলে রোলকলে হাজির।"

অমল বললে, কিন্তু বাইরে গেছে তো অনেকে !"

দিবাকর বললে, "বুঝলেন না ব্যাপারটা, চোরেরাই যদি কনস্টেবল হয়—তাহলে আর চোর ধরবে কে !"

রিপোর্টিংয়ের পালা শেষ হলে হাবিলদার সাহেব কোথায় যেন গেলেন। দিবাকর বললে, "গেল জমাদার সাহেবের কাছে রিপোর্ট দিতে। তিনি হয়তো উপুড় হয়ে পড়ে গা ডলাই মলাই করাচ্ছেন ! যাক, সে শালা যে আসেনি সেই মঙ্গল—এলেই তো আবার তাঁকে একটা সেলাম করতে হতো।"

অমল জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা দিবাকরবাবু, এই হাবিলদার জমাদাররাও কি রেলের কাজে ভর্তি হয়েছে ?"

দিবাকর বললে, "মোটেই না, এরা হচ্ছে রেগুলার ফোর্সের লোক—এদের এনেছে আমাদের মিলিটারী ট্রেনিং দিতে—"

"কিন্তু এরা যে একেবারে অশিক্ষিত !"

"সেই জন্যেই তো ডিসিপ্লিন এত ভালো রপ্ত করতে পারে—"

মিনিট খানেকের মধ্যেই হাবিলদার সাহের ফিরে এসে হুকুম দিলেন, "রুলকল—স্ট্যাণ্ড-এ্যাট-ইজ—স্ট্যাণ্ড-ইজি।" সবক'টা লাইন থেকে জামার খসখস শব্দ, গলাঝাড়া, নাকঝাড়ার শব্দ একই সঙ্গে মুখর হয়ে উঠল।

দিবাকর বললে, "এইরে মেরেছে ! এইবার শালার লেকচার শুরু হবে—অন্তত আধটি ঘণ্টার গর্ভযন্ত্রণা—"

হাবিলদার সাহেব গলা ঝেড়ে বললেন, "শুনো জোয়ান, ডিসপিলিনকা বারেমে লেচকর। সিরফ দো বাত। পহেলি বাত—হুকম মানো। হুকম মাননেকা তরিকা ক্যা হ্যায় ? কান খুলো—মতলব, গওরসে হুকম্ শুনো। আঁখ্ খুলো—মতলব, আচ্ছাসে দেখ্ কর্ আপনা কাম সমঝ্ লেও। মুহ্ মত্ খুলো—মত্লব, কভি কোইভি কাম্ ইন্কার মত্ করো।"

অমলের পাশ থেকে চাপা গলায় কে যেন বললে, "ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে এমন টনটনে জ্ঞান না হলে আর তোমার মতো মেড়াকে হাবিলদার বানিয়েছে ! ছিলে তো যাদু ঝাড়ুদার—হিটলারের দৌলতে হয়েছ হাবিলদার !"

"দুসরী বাত্," হাবিলদার সাহেব বারকয়েক পায়চারী ক'রে বললেন, "ফৌজমে কভি কিসিকি সাথ্ ভাই-বন্দি মত্ করো—"

আবার চাপা স্বর, "তা করবে কেন! কেবল ছোঁড়ার তালে ঘোরো।"

"কেঁ্যা কি ইসকা নতিজা বহত্ বুরা হোতা হ্যায়"—দাঁড়িয়ে পড়ে হাবিলদার সাহেব বলে চললেন, "তব শুনো য়েক কিস্সা—"

চাপা স্বর সরব হয়ে উঠল, "তোমার গুষ্টির পিণ্ডি—শালা কিস্সা বলার আর জায়গা পেলে না—ভেবেছে, দুনিয়াটা বুঝি ওরই মতো আকাট—"

কিস্সা শুরু হলো, "রাম সিং হিন্দুস্তানী ফৌজকা য়েক সিপাহি। ছুট্টিপর যব ঘর গয়া, উসকো ওয়ার্দিবগেরা দেখ্কর উসকা ভাই শ্যাম সিংকা বহত্ লালচ পড়া। য়োভি ফৌজমে ভর্তি হোনেকে লিয়ে রাম সিংকো কহা। রাম সিং উসকো বহত্ মানা কিয়া ঔর বহত্ কুছ্ সমঝায়া। শ্যাম সিং নহি মানা। রাম সিং ছুট্টি খতম হোনেকো বাদ উসকোভি সাথ লায়া। শ্যাম সিং ফৌজমে দাখিল হো গয়া।"

একটু থেমে নীরব শ্রোতাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে চললেন, "শ্যাম সিংকা বহত্ সরাপ পিনেকা আদত্ থা। য়েক রোজ শ্যাম সিংনে রাম সিংকো কহা, 'ভাইয়া, রুলকলমে মেরা হাজরী দে দেনা, ম্যায় থোড়া দেরকে লিয়ে বহার যাউঙ্গা।' রাম সিং ভাই-বন্দিসে শ্যাম সিংকো হাজির কর দিয়া। উধর হুয়া ক্যা? শ্যাম সিং মাতোয়ালা হালত পর রেলমে কাট গয়া। সবেরে ও. সি. সাবকে পাস রিপুট আয়া। রাম সিং ঝুটা হাজরী দেনেকো লিয়ে পকড় গয়া। উসকা বহত্ শকত্ সাজা মিলা ঔর সাথই সাথ নোকরিসেভি বরখাস্ত কর্ দিয়া—"

কয়েকটি সরব দীর্ঘশ্বাস পড়ল, "তুমিও তো সরাপ-টরাপ খাও বাবা—তুমি কবে কাটা পড়বে?"

হাবিলদার সাহেব স্বরের পর্দা আরও খানিকটা চড়িয়ে বললেন, "আভি দেখো জোয়ান, ভাই-বন্দিকা ক্যা নতিজা হুয়া। য়্যাদ রাখো, আইনদা কভি কিসিকা সাথ ভাই-বন্দি মত্ করো।"

রোলকল শেষ হলে ব্যারাকে ফিরে অমল তার খাটিয়ার ওপর বসে পড়ল—শরীরটা বিষম ক্লান্তিতে ঘিরে ধরেছে—ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়তে। কিন্তু গামছা-পাতা বিছানা দেখে, তার সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে ওঠে। ব্যারাকের মধ্যে কর্মতৎপরতা আবার যেন কিছুটা বেড়ে গেছে। জনকয়েক তাড়াতাড়ি মশারি ফেলে দিয়ে ছোট ছোট দলে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। অমল

জিজ্ঞেস করলে, "এত রাতে আবার এরা কোথায় যাচ্ছে ?"

দিবাকর বললে, "কোথায় আর যাবে—শিকারের সন্ধানে।"

অমলের মনটা খিঁচড়ে যায়—সব ছেলেই কি বেশ্যাবাড়ী যায়! না, না, সকলেই তো যায় না, দিবাকর যায় নি, সমর যায় নি, আর ওরাও তো যায় নি —ওরা কেমন সুন্দর ঢাকনি-ঢাকা আলোর তলায় বসে তাস খেলছে!

দিবাকর অমলের কাঁধে একটা টোকা মেরে বললে, "দেখতে যদি চান দেখুন ডানদিকের ওই কোণটায়।"

সেদিকে অমল চেয়ে দেখে বললে, "ওখানটাতো অন্ধকার।"

"চেয়ে থাকুন কিছুক্ষণ তবে তো দেখতে পাবেন।"

অমল চেয়ে রইল। দেখলে, ছোট্ট একটা লাল আলো ঘুরে ঘুরে দপ্ করে জ্বলছে আর নিভছে। জিজ্ঞেস করলে, "ব্যাপারটা কি ?"

দিবাকর বললে, "ওটা হলো আমাদের ব্যারাকের আবগারী বিভাগ। এখন চলেছে গঞ্জিকাপর্ব—"

অমল আঁতকে ওঠে, "গাঁজা খাচ্ছে! এরা কারা ?

"এরা ? এরা আপনার আমার মতোই ভদ্রলোক।"

অমলের যেন কথাটা বিশ্বাস হয় না। মনে পড়ে তার মিলিটারী চাকরী নেওয়ার কথায় মিনির মন্তব্য, 'মাগো, মিলিটারীতে তো যত ছোটলোক ভর্তি হয়।' এইটাই কি সত্যি!

দিবাকর জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে মশারির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বললে, "নিন, শুয়ে পড়ুন অমলবাবু—খামখা বসে থেকে আর লাভ কি। এসব ব্যাপার যত দেখবেন ততই মন খারাপ হবে।"

অমলও শুয়ে পড়ল। হঠাৎ তার মনে হলো, "এ কোথায় সে এল!"

দিবাকর ডাকলে, "অমলবাবু ?"

"বলুন—"

"আপনি কেন এখানে এলেন বলুন তো ?"

"এছাড়া আর যে কোন রাস্তা খুঁজে পাই নি—"

"বলেন কি! বি. এ. পাশ করেছেন, তবুও রাস্তা খুঁজে পেলেন না! তাহলে তো আমার কথাই ওঠে না। চাকরী একটা করছিলাম বটে মার্চেণ্ট অফিসে। চারবছর ধ'রে চাকরী করেছি, একপয়সাও ইনক্রিমেণ্ট পাই নি। যে কুড়ি টাকাতেই শুরু, অনাদি অনন্ত কাল ধরে সেই কুড়ি টাকাই চলেছে। জানেন তো বাঙালী বাড়ীর কারবার! খেতে পাও আর না পাও, আগে-

ভাগে বিয়েটি ঠিক দেওয়া চাই। একুশ বছর বয়সে বাবা আমার বিয়ে দিলেন। তখন কিছু কি আর ভাববার সময় পেয়েছি। উঠতি যৌবন, রক্ত গরম—বিয়ে মানে, একটি মেয়ে আমার পাশে শোবে! ভাবতেই যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। নতুন চাকরীতে ঢুকেছি—কত আশা! চার বছর কেটে গেছে, দুটি ছেলেমেয়ে, একটি পয়সাও আয় বাড়ে নি। জিনিসপত্তর আক্রা হতে শুরু হলো, সংসার ক্রমেই অচল হয়ে পড়তে লাগল। প্রথমে বড় মেয়েটার দুধ বন্ধ হলো, তারপর কচিটারও। তাতেও কি শানায় মশাই! বাবা ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করলেন। সবই যেন আমার দোষ—মাইনে বাড়ছে না, তাও আমার দোষ! জিনিসপত্তরের দাম বাড়ছে—তাও আমার দোষ! আর দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েছি, সেইটাই বোধহয় আমার সবচেয়ে বড় দোষ! আমার মতো অবস্থায় নিশ্চয়ই আপনি পড়েন নি?"

অমল বললে, "না, আমার অবস্থা একটু অন্যরকম। কিন্তু আপনি বিবাহিত, ছেলেমেয়ে আছে, আপনাকে কেউ বাধা দিলে না?"

"আরে মশাই হ্যাঃ। বাধা সব শালাই দেয়! বাধা দিয়ে কি তারা উপোষ ক'রে থাকবে নাকি! উপায় নেই মশাই, যুদ্ধের ঠেলায় মরতে আমাদের হবেই, সে বাড়িতে বসে উপোষ ক'রেই হোক, আর লড়াইয়ের মাঠে গুলি খেয়েই হোক—"

বাইরে থেকে সোরগোলের একটা শব্দ এল। ব্যারাক-সেন্টি খুব কড়া মেজাজে কাকে যেন ধমক দিচ্ছে। একটু পরেই গোঙানির একটা শব্দ বারান্দা থেকে ছিটকে এল, "কোন শালা বলে আমি মাতাল।"

ব্যারাক-সেন্টি হাঁকপাড়ল, "যাও চুপ ক'রে শুয়ে পড়—মাতলামো করার জায়গা এটা নয় রজত।"

দিবাকর বললে, "এই হল এখানকার রাতের জীবন অমলবাবু। রজতটা রোজ মদ গিলে আসবে আর এমনি হল্লা করবে। এরপর জগৎ সিংহিটার পালা—তার সে প্রেমকাহিনী শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে। তারপর এ-লাইনেই নিত্যনতুন রঙরুট তো আছেই। তাদের কেউ এসে হড়হড় ক'রে বমি করবে, কেউ পায়খানা-পেচ্ছাব করবে, কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে, কেউ হাঃ হাঃ ক'রে হাসবে—সে যেন এক আজব ব্যাপার শুরু হয়ে যাবে—"

রজতকে জনকয়েক ছেলে ধরাধরি করে নিয়ে আসছে—রজত ধস্তাধস্তি করছে আর পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। দিবাকর বললে, "ওদিকে কান দেবেন না অমলবাবু—আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন—"

চোখ বন্ধ করতেই অমলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "ওঃ—মাঃ—"

সপ্তাহখানেক কেটে গেছে।

সকালের ফেটিগ শেষ হয়েছে—ছেলেরা একে একে ব্যারাকে ফিরছে। দিবাকর আর অরুণ কথা কইতে কইতে দরজা খুলে ঢুকল—দিবাকর বলে উঠল, "দেখলে তো রজত শালা কতবড় হারামি!"

অরুণ বললে, "হারামির আর কি হলো! বলো, কেমন ওস্তাদ—নিজের কাজটি কেমন গুছিয়ে নিলে।"

দিবাকরের কথা শুনে অমল ভেবেই পেলে না, রজত ল্যান্স-নায়েক হওয়ায় দিবাকর হঠাৎ এমন ক্ষেপে উঠল কেন! দিবাকরই তো তাকে কতবার মতলব দিয়েছে, দরখাস্ত লেখার জন্যে টাকা নিতে। দিবাকর বলেছে 'কেন নেবেন না মশাই! অন্য কেউ হলে তো নিত। অফিসের হেডক্লার্ক মিত্তির তো শুধু দরখাস্ত পেশ করার জন্যেই সিকিটা, আধুলিটা নেয়। আরে মশাই, আপনি তো আর দেশের কাজ করার জন্যে এখানে আসেন নি, এসেছেন টু-পাইস করতে। তবে রজতের বেলাতেই তার এত রাগ কেন!

সমর উত্তেজিত দিবাকরের কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "শুধু রজতের দোষ দিলে চলবে কেন দিবাকর, দোষ হচ্ছে আমাদের এই মধ্যবিত্ত জাতটার—আমরা যে কুত্তার জাত!"

অরুণ সমরের দিকে তেড়ে গিয়ে বললে, "কুত্তার জাত মানে? খবরদার, জাত তুলে কথা বলবেন না।"

সমর বললে, "নিশ্চয়ই, আমাদের জাতটারই দোষ। আজ আমি রজতের মতো বাগাতে পারি নি বলেই হিংসেয় তাকে গাল দিচ্ছি। আপনি কি বলতে পারেন, রজতের রাস্তা ধরতে আপনার ইচ্ছে করছে না?"

অরুণ পা ঠুকে বললে, "কক্ষণো না—আপনার মতো ইতর আমি নই।"

সমর হেসে বললে, "এই তো মশাই, সত্যি কথাটাও স্বীকার করতে সাহস হলো না!"

অরুণের হাঁক-ডাক একটু জোরেই হয়েছিল। ঝগড়া মনে ক'রে অনেকে এসে ঘিরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। কোথা থেকে রজত ভিড় ঠেলে একেবারে মাঝখানে এসে বললে, "আমি বারণ ক'রে দিচ্ছি, এসব আলোচনা যেন আর কোনদিন আমার কানে না আসে!"

রজতের কথা শুনে অমল তার মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। রজতের ডানহাতে নতুন স্ট্রাইপটা যেন ঝকঝক করছে।

দিবাকর বললে, "তুই থাম রজত, স্ট্রাইপ তো একটা লাগিয়ে নিয়েছিস—তোর তো কেল্লা ফতে!"

রজত দিবাকরকে লক্ষ্য না ক'রে সমরকে বললে, "আমার সম্বন্ধে কেউ কোন আলোচনা করতে পারবে না—এ আমি সাফ বলে দিচ্ছি।"

অমল খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একটা মানুষ এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন সাংঘাতিক বদলে যায় কেমন ক'রে! রজতকে আরও কাছ থেকে দেখার জন্যে সে ভিড় ঘেঁষে দাঁড়াল।

সমর বললে, "চোখ রাঙিয়ে মুখ বন্ধ করাবে নাকি?"

রজত চিৎকার ক'রে উঠল, "আলবৎ"।

অমল ফস ক'রে বলে ফেললে, "এতখানি ক্ষমতা একজন ল্যান্স-নায়েককে দেওয়া হয় নি—"

দিবাকর বলে উঠল, "ত্মাখ রজত, তোর কেরামতি জানতে আর আমাদের বাকী নেই। যে উপায়ে তুই ল্যান্স-নায়েক হয়েছিস, সেই উপায়ে তুই হাবিলদারও হবি। সেই ব্যবস্থাই করগে যা—"

রজত হুংকার দিয়ে উঠল, "দিবাকর, খুব বেশী বাড়াবাড়ি করছ। বলে দিচ্ছি, তোমার মুখ থেকে যেন আর একটা কথাও না শুনি।"

দিবাকর থতমত খেয়ে গেল। আজ প্রায় তিন মাস সে মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছে। মিলিটারী আইন ও শৃংখলার যেটুকু নমুনা সে এই সময়ের মধ্যে দেখেছে, তাতে সে বুঝল, এরপর আর এক ইঞ্চিও এগোনো চলে না।

রজত ভিড় ফাঁক ক'রে অমলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে, "এখানে একজন গ্রাজুয়েটের কদর একটা ঝাড়ুদার বা লাঙ্গরীর চেয়ে এক কাণাকড়িও বেশী নয়। এখানে কদর হচ্ছে এই ফিতের—বুঝলেন?"

অরুণ এতক্ষণ সিগারেট ধরিয়ে রিঙ প্র্যাকটিশ করছিল। রজতের কথাটা তার খুব মনঃপুত হওয়ায় খুঁক খুঁক ক'রে হেসে উঠল। আর জনকয়েক অধীর আগ্রহে অমলের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অমলের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে। রজতকে সে বললে, "গ্রাজুয়েটের কদর মানুষের কাছেই হয়—মদের বোতল আর বেশ্যাবাড়ীতে নয়—"

রজত মারমুখো হয়ে অমলের দিকে একপা এগিয়ে গেল। অন্য সকলের খুশীতে ফেটে পড়া হাসির চোটে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু ইতস্তত

ক'রে বললে, "আচ্ছা, সে মীমাংসা এখনই হয়ে যাবে—" হন হন ক'রে সে বেরিয়ে গেল।

একটি ছেলে দৌড়ে এসে অমলের হাতটা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "বড় জব্বর বলেছেন দাদা—" বাকী ছেলেরা ব্যাপার-গতিক দেখে সুড় সুড় ক'রে ছড়িয়ে পড়ল।

দিবাকর বললে, "তাইতো ব্যাপারটা বড় গোলমেলে হয়ে গেল—"অমলের হাতটা ধরে তাকে টেনে এনে নিজের খাটিয়ার ওপর বসিয়ে দিয়ে বললে, "আপনি কেন কথা কইতে গেলেন বলুন তো।"

অমল বললে, "সকলের কথার মধ্যে আমিও কথা বলেছি—হঠাৎ আমার ওপর ক্ষেপে ওঠার কারণ কি!"

দিবাকর বললে, "সে আপনি বুঝবেন না অমলবাবু। একজন গ্রাজুয়েট হয়ে কেন যে আপনি মিলিটারীতে ঢুকলেন!"

সমর এসে দিবাকরের সামনের খাটিয়াটায় বসল। দিবাকর বললে, "কি করা যায় বল তো সমর?"

সমর বললে, "দ্যাখ দিবাকর, যা করলে অমলবাবু শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারেন—সে কাজ আমি ওঁকে করতে বলতে পারব না—তার চেয়ে আমি বলব শাস্তি মাথা পেতে নিতে—"

অমল আঁতকে উঠল, তাহলে তার শাস্তি হবেই! কি শাস্তি হতে পারে? পিঠঠু প্যারেড! বুকের মধ্যেটা তার টিপ টিপ ক'রে উঠল—ক্যাম্পসুদ্ধ ছেলে তাকে দেখবে পিঠ্‌ঠু প্যারেড করতে! ওই অরুণ আর তার দল তাকে টিটকিরি দেবে! আর রজত প্রাণখুলে তার ওপর মাতব্বরী করবে! হঠাৎ অমল সোজা উঠে দাঁড়াল। নাঃ, এখনই সে রজতের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে ফেলবে—নাহয় সে ক্ষমাই চাইবে। কিন্তু পিঠ্‌ঠু প্যারেড, না—না—তা সে পারবে না!

সমর আর দিবাকর একই সঙ্গে অমলের মুখের দিকে চাইলে। অমল দেখলে বিষণ্ণ মুখে সমর তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে, আর দিবাকরের মুখখানা ব্যথায় ম্লান হয়ে গেছে। অমল ধপ ক'রে বসে পড়ল—অন্তত এই দুজন সমব্যথীর সামনে দিয়ে সে কাপুরুষের মতো রজতের কাছে গিয়ে ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়াতে পারবে না।

দিবাকর বললে, "আমার আজ হঠাৎ কেমন মেজাজটা চড়ে গেল। নিজেদের মধ্যে যা ইচ্ছে কর না কেন, আমি সইতে রাজি আছি। কিন্তু বিভীষণদের আমি বরদাস্ত করতে রাজি নই।"

অমল খাটিয়ার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল, পা দুটো তার ঝুলছে, সমস্ত শরীরটা থরথর ক'রে কাঁপছে। কি তার ভাগ্যে ঘটতে চলেছে, সে কিছুই আন্দাজ করতে পারছে না। দিবাকর বলে উঠল, "বোধহয় এ যাত্রা আপনার ফাঁড়া কাটল অমলবাবু—জেমস খুড়ো তো গাড়ীতে স্টার্ট দিচ্ছে।"

সমর একটা আড়মোড়া ভেঙে বললে, "সময়ও তো হয়ে এল—আবার তো স্নান করতে হবে।" অমলকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, "উঠুন অমলবাবু, স্নানটা সেরে আসা যাক। জেমস সাহেব যখন চলেই গেল, তখন নিশ্চয়ই রজতটা তেমন সুবিধে করতে পারে নি।"

সমর উঠে গেল। দিবাকর উঠে তেল মাখতে শুরু করেছে। অমল উঠি উঠি ক'রেও যেন উঠতে পারছে না। মাথায় তেল ঘষতে ঘষতে দিবাকর বলে উঠল, "ও মশাই, জল্লাদ ব্যাটা যে এই দিকেই আসছে—"

জল্লাদটি হলো রেল কোম্পানির ওয়াচ্ এ্যাণ্ড ওয়ার্ড ডিপার্টমেণ্টের সেপাই। ট্রেনিং ক্যাম্পের সে দারোয়ান, তার উপরি কাজ হলো পিঠ্ঠু প্যারেড্ করানো। এ বিষয়ে সে এমনই কর্তব্যপরায়ণ যে ছেলেরা তার পিতৃদত্ত নামটাকে সংশোধন ক'রে নিয়েছে। জল্লাদ বাইরে থেকে হাঁকল, "অমলবাবু, মিত্তিরবাবু সেলাম দিয়া।"

দিবাকর খিঁচিয়ে উঠল, "সেলাম কেন বলছ বাবা, বল বাঁশ দিয়া—"

মাঠের ওপর দিয়ে যেতে যেতে অমল ভাবছিল, কি হতে পারে! শাস্তি যদি কিছু হতো, তাহলে তো জেম্স সাহেব নিশ্চয়ই ডেকে পাঠাতেন। অফিসঘরের জানলা দিয়ে অমল মুখ বাড়াল—বুকটা তার দুর দুর করছে।

মিত্তির অমলকে দেখেই তেড়ে উঠল, "মনে করেছেন কি আপনারা?"

অমলের কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, দাঁত দিয়ে সে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। মিত্তির বললে, "এরকম ছেলেমানষি করলেন কেন বলুন তো?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে অমল মিত্তিরের মুখভাব যাচাই করতে থাকে—মিত্তিরের স্বরে যেন সহানুভূতির ছোঁয়াচ। অমল বললে, "ছেলেমানষি মানে!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—ছেলেমানষি। এখানে ওসব চলে না। এখানে গুণের কদর নেই মশাই—এখানে কদর তাদেরই, যারা কুকুরের মতো প্রভুভক্ত।"

অমল বললে, "কিন্তু আমি তো কোন অন্যায় করি নি। রজতবাবুর সঙ্গে খানিকটা বচসা হয়েছে—সেটা তো আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার!"

মিত্তির বললে, "ব্যক্তি-ফ্যক্তি এখানে কিছু নেই মশাই। এখানে—একদল হুকুম করবে আর অপর দল মুখ বুজে হুকুম তামিল করবে। রজত এখানকার হালচাল সুন্দর বুঝেছে, কিন্তু আপনি কিছুই বোঝেন নি।"

অমল মাথা নীচু করলে। তার মুখ থমথম করছে। এমন একটা ব্যবস্থা আজকের এই সভ্য জগতেও কেমন ক'রে চলতে পারে!

মিত্তির বললে, "যাক, অল্পের ওপর দিয়েই আপনার ফাঁড়া কেটেছে। আপনার সবচেয়ে বড় দোষ কি জানেন? আপনার ওই ডিগ্রী। একে আপনি বাঙালী, তায় আবার গ্রাজুয়েট! আপনি তো মশাই মারাত্মক জীব। যাক, শেষ পর্যন্ত আপনাকে কেবল কোম্পানিতে পোস্ট করেছে।"

অমলের চোখ কপালে উঠে গেছে—মুখটা হাঁ হয়ে গেছে—অস্ফুট একটা শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "আমার বিচার হয়ে গেছে!"

মিত্তির অমলের কাঁধে হাত রেখে বললে, "হ্যাঁ অমলবাবু, এখানকার রীতিই এই। রজত যে ল্যান্স-নায়েক, তার কথার আবার যাচাই কি?"

ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে অমল সোজা বাড়ীর পথ ধরল।

কোম্পানিতে পোস্ট হওয়া মানেই তো লড়াইয়ের মাঠে যাওয়া! অমলের মনটা দমে গেছে। বাড়ীর সকলকে মনে পড়ছে, চেনাজানা সককেই যেন তার সামনে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে—আর তো এদের সঙ্গে দেখা হবে না!

অন্যমনস্কভাবে ভাবতে ভাবতে অমল এগিয়ে চলেছে। পথে চেনা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। অমল আঁতকে ওঠে—ত্রস্তে নিজের জামাকাপড় দেখে নিয়ে যেন আশ্বস্ত হয়। ভাগ্যে সে মিলিটারী পোশাকে রাস্তায় বেরোয় নি—তাহলে হয়তো এই ভদ্রলোক তার সঙ্গে কথাই বলতেন না। মিলিটারী পোশাকে দেখলে কি আর তিনি ভাবতেন না যে, সে-ও একটি লম্পট, মাতাল, গুণ্ডা! এই তো দিনকয়েক আগে তার ব্যারাকের জনকয়েক ছেলে সন্ধ্যের অন্ধকারে একটি মেয়ের ঘরে জোর ক'রে ঢুকেছিল। মেয়েটি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। বস্তির লোক জমা হয়ে ছেলেগুলোকে আচ্ছা ক'রে মার লাগায়। এতে নাকি তাঁদের সৈনিকোচিত মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়; তারা ক্যাম্পে ফিরে দল পাকিয়ে সেই বস্তি আক্রমণ করে। রীতিমতো মারামারি হয়—জনকয়েক জখমও হয়। এ কথা কি আর কোলকাতা শহরে জানাজানি হয়ে যায় নি!

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "কি অমল, কি করছ এখন?"

অমল বললে, "এই একটা রেলের কাজ!"

ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন, "তা বেশ, তা বেশ। যা হোক্ একটা কাজে লেগে পড়া ভালো। আর আমার ছেলেটা এতদিন বসে বসে আড্ডা দিয়ে,

এখন গিয়ে ঢুকেছে মিলিটারীতে। ছি ছি, কি কাণ্ড বলো তো, লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না। তাছাড়া সে কি আর বেঁচে ফিরবে! যদি একান্তই বাঁচে, তখন কি আর ভদ্র সমাজের যোগ্য থাকবে! কি করব বাবা, যার যেমন কপাল—”ভদ্রলোকের চোখদুটো ছলছল ক'রে উঠল। অমলের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, “মানুষ হও বাবা—বাপের মুখ উজ্জ্বল কর।”

অমলের ইচ্ছে করে ছুটে পালিয়ে যেতে। ঢোক গিলে, ফ্যাকাশে মুখে ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিয়ে সে হনহন ক'রে হাঁটতে থাকে। কোন রকমে ট্রামে উঠতে পারলে যেন সে বাঁচে।

বাড়ী পৌঁছে কড়া নাড়তে, রিণি দরজা খুলে দিলে। অমলকে দেখে কয়েকটা পলকের জন্যে রিণি স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর দৌড়ে খানিকটা ভেতরে গিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল, “ও বাবা, মেজদা এসেছে—” মাঝপথে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, শেষে ছুটে এসে অমলকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে।

অমল রিণিকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, “কিরে, ভেবেছিলি বুঝি মেজদা মরেই গেছে—”

রিণি চোখ মুছে বললে, “ধ্যেৎ—”

“তবে যে কেঁদে ফেললি?”

“কেঁদেছি বুঝি—”অমলের হাতটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে রিণি ঘরের দিকে চলতে থাকে।

সকলেই রিণির হাঁকডাকে উঠে এসেছেন। ঠাকুমা বললেন, “কই, দাদার আমার ধড়াচুড়ো কই—এযে দেখছি ভদ্দরলোকের পোশাক!”

“কেন, মিলিটারী পোশাকে বুঝি ভদ্দরলোকের মতো দেখায় না?”

“ও বাবা, গোরাপল্টনের নামে আমরা মূচ্ছা যেতাম—”

অমল বুঝল, মিলিটারী সম্বন্ধে ধারণা, তার বাবা, ঠাকুমা, পিতৃবন্ধু আর মিনি সকলেরই এক—বোধহয় তার নিজেরও ওই একই ধারণা। সৈনিকের সপক্ষে বলার মতো প্রবৃত্তি তারও মনে জাগে না।

ননীগোপালবাবু বললেন, “তা এখন বাড়ী এলি যে! আজ ছুটি নাকি?

“না, আজ ছুটি নিয়েছি, কালকে কোম্পানিতে বদলি হচ্ছি কিনা!”

“এই তো ক'দিন মাত্র ভর্তি হলি, এরই মধ্যে বদলি করছে যে?”

“কাজ শিখে নিয়েছি কিনা—তাই বোধহয় কোম্পানিতে পাঠাচ্ছে।”

ননীগোপালবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, “বোধহয় মানে কি? তোকে বদলি

করছে, আর তুই জানবি না, বদলি করার কারণটা কি !"

ক্ষণেকের জন্য অমল দমে গেল। মনে পড়ল তার এই ক'দিনের সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা আর আজকের ব্যাপারটা। এই রূঢ় সত্যকে আর যেন সে চেপে রাখতে পারে না, বললে, "মিলিটারীতে কাজ চলে হুকুমের ওপর— কারণ তারা কাকেও জানায় না।"

"তাহলে মাইনেও নিশ্চয়ই বাড়বে ?"

"তার কোন ঠিক নেই—"

রান্নাঘব থেকে ঠাকুমা ননীগোপালবাবুকে ডাকলেন। যাওয়ার জন্যে উঠে ননীগোপালবাবু বললেন, "কিছুই তো দেখছি তুমি জান না—তুমি কি তবে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছ নাকি !"

মিনি চা নিয়ে এল, রিণি এসে অমলের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। চায়ে চুমুক দিয়ে অমল রিনিকে বলল, "অমন চোখ পাকিয়ে কি দেখছিস রে ?"

রিণি চাপা গলায় যথাসম্ভব অমলের কানের কাছে মুখটা নিয়ে বললে, "আচ্ছা মেজদা, মিলিটারীতে ঢুকলে মানুষ নাকি খারাপ হয়ে যায় ?"

অমল বললে, "কে বললে ?"

রিণি বললে, "আমরা শুনেছি—বলো না ?

অমল ভাবছিল, কি কৈফিয়ৎ সে দেবে ! আজ তো আর সে আলাদা একটা মানুষ নয়—আজ সে সমস্ত সৈনিকের প্রতিনিধি। কৈফিয়ৎ তাকে একটা দিতেই হবে। জিজ্ঞেস করলে, "কি রকম খারাপ শুনি ?"

রিণি মিনিকে ঠেলা দিয়ে বললে, "তুই বল দিদি—"

মিনি চোখ নামিয়ে বললে, "তারা সকলেই নাকি মদ খায় ?"

অমল মিনির গাম্ভীর্য দেখে হেসে বললে, "তুর বোকা, সকলে মদ খেতে যাবে কেন ? যাদের ইচ্ছে হয় খায়, আবার আমার মতো আরও অনেকে আছে, যারা মদ খায় না।"

রিণি হাততালি দিয়ে নেচে উঠল, "দেখলি তো, আমি বলেছিলুম—"

মিনি বললে, "আমিও তো বলেছিলুম—"

পাশের ঘর থেকে ঠাকুমা ডাকলেন, "অরে অ অমি, বলি শোন না এদিকে —তোর মিলিটারীর গল্প শুনি।" অমল এলে বললেন, "হ্যাঁরা, তোদের খেতে দেয় কেমন রে ?

ক্ষণেকের জন্যে অমল ইতস্তত করে, তারপর বলে যায়, "খাওয়া ? অঢেল— রোজ মাংস, তরিতরকারি প্রচুর, সকাল-বিকেল জলখাবার—"

ঠাকুমা বললেন, "কিন্তু তোর শরীর তো খারাপ হয়ে গেছে—"

অমল বললে, "ভীষণ খাটুনি কিনা—"

ঠাকুমা রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, "কি খাবি বল—তোর বাপ বাজারে গেছে মাছ আনতে।"

অমল বললে, "জিনিস অঢেল হলে কি হবে—রাঁধতে কি আর তারা জানে। তুমি যা রেঁধে দেবে, তাই ভালো লাগবে ঠাকুমা।"

মার্চেণ্ট অফিসের কেরাণী বিমল বাড়ী ফিরল সন্ধ্যে উৎরে। এরকম সন্ধ্যে তার প্রায়ই হয়। সে বাড়ীতে ফিরলেই মিনি রিণির মুখ শুকিয়ে যায়। একে তার মাইনে কম, তায় আবার খাটুনি বেশী—কাজেই তার মেজাজটা খিটখিটে। অমলকে জিজ্ঞেস করলে, "কতক্ষণ এলি রে?"

অমল বললে, "তা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হলো।"

"আজ থাকবি, না আবার চলে যাবি?"

"নাঃ, খেয়েদেয়েই চলে যাব।"

বিমল জামাকাপড় ছাড়তে চলে গেল। অমল উঠে এসে বসল রান্নাঘরের দাওয়ায়। তার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে—সকলেরই ব্যবহারের মধ্যে কেমন যেন একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব। কোথা দিয়ে কেমন ভাবে যেন একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে।

জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে বিমল অমলের কাছে এসে বসল। জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁরে, তোর মাইনে কত তারিখে দেয়?"

"শুনেছি তো তিন-চার তারিখ।"

"তাহলে টাকাটা বাড়ী পাঠাবার কি ব্যবস্থা করবি?"

"নিজেই এসে দিয়ে যাব, এখন তো কাছাকাছি রয়েছি। আর যদি একান্তই না আসতে পারি, তাহলে মণি-অর্ডার করে দেব।"

"না না, মণি-অর্ডার করতে হবে না। আমি না হয় নিজেই গিয়ে—"

বিমলকে কথা শেষ করতে না দিয়েই অমল বললে, "না না, তোমার যেতে হবে না—হয় তো আমার সঙ্গে দেখাই করতে দেবে না—"

"দেখা করতে দেবেনা মানে? আব্দার নাকি! সোলজার হয়েছিস বলে তো আর স্লেভ্ হয়ে যাস নি?

অমল চমকে উঠল, সোলজার আর স্লেভ, এই দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য থাকা উচিত, তা কি তাদের মধ্যে আছে!

বিমল আবার জিজ্ঞেস করলে, "তোদের তো ওভারসীজ যেতে হবে?"

অমল বললে, "তা তো হবেই।"

"তাহলে এই বেলা একটা ইন্সিওর ক'রে ফ্যাল—"

"ইন্সিওর! আমি করব! তার কি দরকার পড়ছে?"

বিমল গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বারকয়েক কেশে বললে, "ভেবেছিলুম, কথাটা তুমি বুঝবে। তোমার ওপরই ছিল আমাদের ভরসা সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তুমি যখন মিলিটারীতে ঢুকেছ, তখন তো আর ভরসা করা যায় না। এখন যদি তোমার একটা ভালো-মন্দ কিছু হয়— তাহলে তো সংসারটা ভেসে যাবে। ইন্সিওর একটা করা থাকলে, তবুও দুটো দিন যোঝা যাবে।"

এ কথার পর বিমল উঠে ঘরের মধ্যে চলে গেল। অমল একা বাইরে বসে আছে। অনেক কথাই সে এতদিন ভেবেছে—মিলিটারীতে ভর্তি হওয়ার আগে থেকে আজকের দুর্দৈব পর্যন্ত। কিন্তু মৃত্যু যে তার এত কাছে, একথা তো কোনদিন মনে হয় নি।

ঠাকুমাকে তাড়া দিয়ে অমল খেতে বসল! আর যেন সে পারছে না এই বাড়ীর মধ্যে থাকতে! অমলের খাওয়ার মাঝামাঝি কমল ছেলে পড়িয়ে ফিরে এল। জুতোটা খুলেই খাওয়ার জায়গায় এসে অমলকে বললে, "তুমি কিন্তু ভীষণ ভুল করেছ মেজদা। অনায়াসে কিংস কমিশন পেতে পারতে।"

ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, "সেটা আবার কি?"

কমল বললে, "মিলিটারী চাকরী—তবে অফিসার হয়ে—স্টার্টিংই হচ্ছে সাড়ে তিনশো। আমি তো ভাবছি, ঢুকে পড়ব—"

হাতের ভাত অমলের হাতেই রয়ে গেল। চমকে উঠে সে কমলের দিকে চাইলে। তার ইচ্ছে হলো, প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে, 'না না কমল, মিলিটারীর মধ্যে তুই কিছুতেই ঢুকিস নি—আমার মতন করে তুই নিজেকে বিকিয়ে দিসনি—শুধু দুমুঠো ভাতের জন্যে তুই স্লেভ হতে যাস নি'—কিন্তু গলা দিয়ে তার একটি কথাও বেরিয়ে এল না। কেবল আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

তিন

স্যুটকেস সাজিয়ে অমল আবার তার অভিযানের জন্যে তৈরি হলো। মুভমেণ্ট অর্ডারটাকে আর একবার দেখে নিয়ে সযত্নে পকেটের মধ্যে রাখলে। ব্যারাকটার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত আরও একবার চেয়ে চেয়ে দেখলে। তার মনে হলো, সৈনিকের জীবনটাই বুঝিবা যাযাবরের জীবন!

ব্যারাক থেকে বেরিয়ে মাঠে নামতেই দেখলে, একটা দল ডবল্ মার্চ করে মাঠটা প্রদক্ষিণ করছে। অমল চোখ কুঁচকে দেখলে, দিবাকর তার মধ্যে আছে কিনা। বারবার তার দিবাকরের কথা মনে পড়ছে। কিন্তু আর কি কোন দিন দিবাকরের সঙ্গে দেখা হবে! সত্যিই এই ট্রেনিং সেণ্টারটা একটা সরাইখানা! মনটা তার হাঁপিয়ে ওঠে। ক্যাম্পের এই কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে যেন তার দম আটকে আসছে। জোর কদমে সে গেটের দিকে এগিয়ে চলল। একটি ছেলে হন্‌হন্ করে হেঁটে যাচ্ছিল, বারেক থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কি দাদা চললেন? কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, সেকথা জানার জন্যে সে অপেক্ষাও করল না। বোধহয় তারা সকলেই জানে, এই ট্রেনিং সেণ্টার থেকে মানুষগুলো কোথায় যায়।

অমল এগিয়ে চলেছে গেটের দিকে—গতি তার মন্থর হয়ে গেছে। গেটের কাছাকাছি সড়কের দুইপাশে গুটিকয়েক ছেলে ইট বসাচ্ছে। তাদের মধ্যে থেকে একটি ছেলে বলে উঠল, "চললেন তো দাদা স্লটার হাউসে?"

অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার ইচ্ছে হলো ছেলেটির কাছে কৈফিয়ৎ চায়, কেন সে কোম্পানিকে স্লটার হাউস্ বললে। কিন্তু উপায় নেই, তাদের এক ল্যান্স-নায়েক ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে। ক্যাম্প এলাকার বাইরে এসে স্যুটকেসটা নামিয়ে অমল রেল লাইনের ওপর বসল। তার মনের মধ্যে ওই একটা কথা বারবার ঘোরাফেরা করছে— স্লটার হাউস্! এই কথাটার সঙ্গে সঙ্গে একটি দৃশ্য তার চোখের উপর ভেসে ওঠে। একটি লোক একপাল ছাগল ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে চলছে। পরদিন সকালে সেগুলোকে কেটে, ছাড়িয়ে, 'ফার্স্ট ক্লাশ', ছাপ মেরে ঝুলিয়ে রাখবে মাংসের দোকানে। মাংসাশী মানুষের দল ভিড় করে দাঁড়াবে সেগুলোকে ঘিরে। অকস্মাৎ তার মনটা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। আতঙ্কে তার সমস্ত শরীর শিরশির্ করতে থাকে। সত্যিই তো স্লটার হাউস! যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া মানেই তো মৃত্যু!

মনে পড়ে প্রথম দিনেসেই প্রহরীর সাবধান বাণী, 'এখনো পালিয়ে বাঁচতে পারেন!' কিন্তু কোথায়? পালানোর কথা ভাবতে ভাবতে অমল আবার চলতে লাগল। কিছু দূরেই দেখা গেল রেল কোম্পানির মাঠ, লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা—তার ভেতরে সার সার তাঁবু, দূর থেকে কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয়। দেখতে দেখতে অমল গেটের দিকে এগোচ্ছিল। মাঠের মধ্যে চলেছে প্যারেড, ছোট ছোট অনেকগুলো দল একই তালে পা ফেলে, হাত দুলিয়ে, একই সঙ্গে ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে যাচ্ছে-আসছে। সকলেরই পরনে মিলিটারী পোশাক, খাকি প্যাণ্ট-সার্টের ওপর সোলার হ্যাট—একেবারে পাকা পল্টন।

"হল্ট্—হু কামস্ দেয়ার—"

অমল আঁতকে উঠে পেছনে সরে যেতে গিয়ে প্রায় পড়ে গিয়েছিল আর কি! বুকের ভেতরটা তার ধড়াস্ ধড়াস্ করছে—একেবারে বুকের ওপর সঙ্গিন উচানো! রাইফেলধারী লোকটি তার বুকের মধ্যে সঙ্গিনটাকে বসিয়ে দেওয়ার জন্যে এবেবারে তৈরি!

সান্ত্রী হুংকার দিলে, "বোলো—কোন্ হ্যায়?"

গেটের পাশ থেকে একজন নায়েক বেরিয়ে এল। সান্ত্রীর উদ্যত রাইফেলটা এক ঝটকায় নামিয়ে দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, "খুব বাহাদূরী হয়েছে—দিন দুপুরে হু কাম্‌স্ দেয়ার! কেন, চোখের মাথা খেয়েছ নাকি?"

সান্ত্রী জিভ কেটে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "এই যাঃ, আমি একেবারে ভুলে গেছি—"

নায়েক সাহেব খিঁচিয়ে উঠল, "তা যাবে না, তা না হলে আমার পাছায় বাঁশটা যাবে কি ক'রে? তোমার এই কীর্তি যদি কোন অফিসারের চোখে পড়ত, তাহলে এতক্ষণে এই ফিতে দুটো খুলে রাইফেলটি ঘাড়ে নিয়ে তোমার মতো দারোয়ানী করতে হতো।"

সান্ত্রী মরমে মরে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে। নায়েক সাহেব অমলের সামনে এসে বললে, "আপনার কি দরকার মশাই এখানে?"

অমল বললে, "আমি এই কোম্পানিতে পোস্টেড হয়েছি—" মুভমেণ্ট অর্ডারটা তার হাতে দিলে। মুভমেণ্ট অর্ডার দেখে নিয়ে নায়েক সাহেব বললে, "আসুন আমার সঙ্গে।"

গেটের মধ্যে ঢুকে, কয়েকটা তাঁবু পাশ কাটিয়ে একটা তাঁবুর সামনে গিয়ে ওরা দাঁড়াল। নায়েক সাহেব অমলকে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে চলে গেল।

একটু পরেই বেরিয়ে এসে বললে, "আসুন, জমাদার সাহেব ডাকছেন।"

তাঁবুর মধ্যে ঢুকতেই জমাদার সাহেব খেঁকিয়ে উঠলেন, "সুটকেসটা বাইরেই রেখে এস—তোমার ওই মহামূল্য রত্ন কেউ চুরি করবে না।"

কথাটা অমলের সমস্ত শরীরে যেন বিষ ছড়িয়ে দিলে। সুটকেসটা বাইরে রেখে সে আবার তাঁবুর মধ্যে ঢুকল। জমাদার সাহেব হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকলেন। টেবিলের সামনে গিয়ে অমল হাত তুলে নমস্কার করল।

জমাদার সাহেব তাড়া দিয়ে উঠলেন, "ওসব সিভিলিয়ানী কায়দা এখানে চলে না, বুঝলে ?" বারকয়েক অমলের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, "তা বাবুর চেহারাটি তো দেখছি বেশ নাড়ুগোপালের মতো, আর সাজপোশাকটিও একেবারে লক্কা পায়রা মার্কা ! কিন্তু ওসব তো এখানে কোন কাজে লাগবে না।

বিস্ফারিত চোখে অমল জমাদার সাহেবকে দেখতে থাকে। জমাদার সাহেব অমলের চোখের উপর চোখ রেখে বললেন, "বিষ তাহলে একটু-আধটু আছে দেখছি ! আচ্ছা, বিষদাঁত ভাঙার বন্দোবস্তও এখানে আছে। তোমার ওই কাকের বাসার মতো চুলে আজই কদম ছাঁট দিতে হবে, বুঝলে ?"

অমলের পাশে দাঁড়িয়ে নায়েক সাহেব হাসি চাপবার চেষ্টা করছিল। অমল বারান্তরে জমাদার সাহেব আর নায়েক সাহেবের মুখের দিকে ফিরে ফিরে চাইছিল—এটা রসিকতা না অন্য কিছু !

জমাদার সাহব বললেন, "চাটুয্যে, তোমার উপর ভার রইল, এর চুল যেন আজই কাটা হয়।"

নায়েক চাটুয্যে বললে, "আমি যে স্যার আজ গার্ড কমাণ্ডার—"

"কুছ পরোয়া নেই, অর্ডারলি এন্. সি. ও'কে বলে দেবে এটা আমার হুকুম। আর একে অর্ডারলি এন্. সি. ও'র কাছে হ্যাণ্ডওভার ক'রে দাও।"

অর্ডারলি এন. সি. ও-র কাছে অমলকে হ্যাণ্ডওভার করে দিয়ে নায়েক বললে, "তুমি যেন আবার এঁর ওপর দরদ দেখাতে যেও না—কেন স্ট্রাইপটা ঘোচাবে, জানই তো এখানকার হালচাল !"

ল্যান্স-নায়েক দত্ত অমলকে বললে, "চলুন, একে একে কাজগুলো সেরে ফেলা যাক—" চলতে চলতে অমলের বিমর্ষ মুখখানার দিকে তাকিয়ে বললে, "খুব ঘাবড়ে গেছেন বোধহয় ?"

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে অমল বললে, "না না, ঘাবড়াবার কি আছে !"

"আছে বৈকি। যেখানে মানুষ নিয়ে কারবার অথচ মনুষ্যত্বের নামগন্ধও নেই, সেখানে যে কোন মানুষ নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাবে।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে অমল ল্যান্স-নায়েক দত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ভাবে, এও তো একজন ল্যান্স-নায়েক, তবে!

ল্যান্স-নায়েক দত্ত বললে, "জমাদার দাশগুপ্তটি একটি অপূর্ব চীজ। লোকটার মন এত নোংরা যে আমার তো সন্দেহ হয়, ও কোনদিন কোন ভদ্রপরিবারে মানুষ হয়েছে কিনা!"

অমল তখনও নিজেকে সামলাচ্ছে, ভাবপ্রবণ হওয়ার জায়গা এটা নয়। নিছক ভদ্রতার খাতিরে বললে, "এতটা রূঢ় হবেন না।"

ল্যান্স-নায়েক দত্ত হেসে বললে, "ঠিকই বলেছেন। এতটা রূঢ় বোধহয় হওয়া উচিত নয়—কিন্তু প্রতি পদে রূঢ় ব্যবহার সহ্য করে আর রূঢ় ব্যবহার করার শিক্ষা পেয়ে, মনটা সত্যিই অনেক রূঢ় হয়ে গেছে।"

কোম্পানি অফিসে নামধাম লেখানো হলো। কীটস নেওয়া শেষ হলে ল্যান্স-নায়েক দত্ত বললে, "চলুন, আপনার সিটটা দেখিয়ে দিই—"

লম্বা লম্বা সারিতে তাঁবু খাটানো—তারই একটার সামনে দাঁড়িয়ে ল্যান্স-নায়েক দত্ত বললে, "উপস্থিত আপনি এই তাঁবুটাতে থাকুন, অন্য তাঁবুগুলো সবই ভর্তি—"

একশো আশি পাউণ্ড তাঁবু—তার মধ্যে লম্বালম্বি দু'লাইনে আটখানি খাটিয়া। ছটা সিটে বিছানা ড্রেসিং করা রয়েছে—কায়দাটা সেই ট্রেনিং ক্যাম্পের ছকেই। একটা খালি খাটিয়ার ওপর কীটসের বোঁচকাটা নামিয়ে রেখে অমল বললে, "আপনার নামটা জানতে পারি কি?"

ল্যান্স-নায়েক দত্ত বললে, "জেনে বিশেষ লাভ নেই, দুদিন পরেই আবার ভুলে যাবেন। ল্যান্স-নায়েক দত্ত বলেই তো আমাকে ডাকতে হবে—নাম ধরে ডেকে বন্ধুত্ব করা এখানে চলবে না।"

অমল বললে, "তাহলে এখন আমাকে কি করতে হবে?"

"আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না—এই আমাদের দিয়ে আপনাদের ঘাড়ে ধরে সবকিছু করিয়ে নেবে। সেইজন্যেই তো এই ফিতেটি দিয়ে দুটি টাকা বেশী দেয়—" ডানহাতের ফিতেটাকে দেখিয়ে বললে, "আর এইটিকে বজায় রাখবার জন্যে আমাকে দেখাতে হবে যে আমি খুব সুখে আছি, আর করতে হবে আপনাদের মতো মানুষের সঙ্গে কুকুর-বেড়ালের সামিল ব্যবহার।"

অমল বললে, "তবে ওই ল্যান্স-নায়েকগিরি ছেড়ে দিলেই তো পারেন?"

"ওরে বাবা, তাহলে কি আর রক্ষে থাকবে! কুকুরের মতো এদের পায়ের তলায় পড়ে ল্যাজ নাড়ুন—আপনার দুশো খাতির। কিন্তু মানুষের মতো

মাথা উঁচু করার চেষ্টা যদি করেছেন, অমনি বাঘের মতো ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—" উত্তেজনায় ল্যান্স-নায়েক দত্ত পায়চারী করতে থাকে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কি একটা বলতে গিয়ে সে থমকে গেল। একটি ছেলেকে ওইদিকে আসতে দেখে গলাটা নামিয়ে বললে, "আমার আবার এসব কথা আপনাদের সঙ্গে কইতে নেই। যাক, একটু সাবধান হয়ে কথাবার্তা কইবেন—জমাদার সাহেবের চরেরা কিন্তু তাঁবুর মধ্যে টিকটিকির মতো ওৎ পেতে থাকে—"

অমল কম্বলে বাঁধা বোঁচকাটা খুলে বসল। কম্বল দু'খানা ভাঁজ ক'রে পাশে রাখলে। মশারিটা মাথায় প্রায় ওরই সমান উঁচু—এই রকম ঢালু তাঁবুর মধ্যে টাঙাবে কি ক'রে! আবার ভাবলে, অন্য ছেলেরা যা করে, সে-ও তাই করবে। বুটজোড়া তুলে ধরে সে হেসে ফেললে—দুটোর ওজন বোধহয় পাঁচসের। তার ওপর আবার বলে দিয়েছে, তলায় কাঁটা বসাতে। ওঃ, সে কি বিশ্রী শব্দ হবে! ঠিক যেন পাহারাওয়ালাদের মতো। গরম মোজা, গরম হোস্-টপ, গরম পট্টি—এই দারুণ রোদ্দুরেও পায় জড়িয়ে রাখতে হবে! কিন্তু এই তো, ল্যান্স-নায়েক দত্তই তো কেমন সহজ ভাবে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে!

খাকি সেলুলার সার্ট দুটো তাকে বেশ ফিট করেছে। কিন্তু প্যাণ্ট দুটো যে অদ্ভুত! না ফুল, না হাফ! স্টোরের অর্ডারলিটি বেশ বলেছে—দেড়তলা প্যাণ্ট! এ প্যাণ্ট নাকি মরুভূমি এলাকার সৈনিকদের জন্যে। কিন্তু স্টোর হাবিলদার যে বললে, কেটে হাফ-প্যাণ্ট বানিয়ে নিতে—তবে কি তারা ওভারসীজ যাচ্ছে না! গেঞ্জি দুটো পঁয়তাল্লিশ নম্বর! পরলে তো হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যাবে! অমলের হাসি পেল, ঠিক যেন মেয়েদের সেমিজ।

প্যারেড ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা তাঁবুতে ফিরল। অমলদের তাঁবুর ছ'জনের মধ্যে পাঁচজন যুবক আর একজন প্রৌঢ়। প্রৌঢ় আর চারজন যুবক তখনই মগ আর প্লেট নিয়ে ছুটল। অবশিষ্ট ছেলেটি, রসিদ, অমলকে বললে, "আজ এলেন বুঝি?"

অমল বললে, "হ্যাঁ।"

রসিদ মাথা থেকে হ্যাট্‌টা খুলে বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে, প্যাণ্টের ভেতর থেকে সার্টটা টেনে টেনে বার করতে লাগল। অমল রসিদের হাফ-প্যাণ্টটার দিকে নজর ক'রে দেখে বললে, "আপনার প্যাণ্টটা তো দেখছি বেশ ফিট করেছে।"

রসিদ বললে, "ফিট কি আর সাধে করেছে—এক একটি প্যান্টের পেছনে লেগেছে দেড়টি টাকা।"

অমল বললে, "কিন্তু এই গেঞ্জিগুলোও কি ফিট করাতে হবে ?"

"কি দরকার পড়ছে ! ওগুলো তো আর প্যারেড ইন্সপেক্‌শনের সময় দেখা যাবে না—" একটু থেমে আবার বললে, "তা ছাড়া ওগুলো বড় হওয়ায় ভারী একটা স্থবিধে হয়েছে—এই দেখুন না—" প্যান্টটা একেবারে খুলে ফেলে বললে, "ইচ্ছে করলে শুধু এই গেঞ্জিটা পরে সমস্ত ক্যাম্পটা ঘুরে আসতে পারেন—"

অমল হেসে উঠল, "তা যা বলেছেন !"

রসিদ খাটিয়ার ওপর বসে বুট মোজা খুললে, পট্টিটা পাকাতে পাকাতে বললে, "আপনি খেয়েছেন ?"

অমল বললে, "না"।

রসিদ বললে, "তা হলে আর একটু অপেক্ষা করুন—আমি চট্ ক'রে গোসল্ সেরে আসছি। আর এখন গিয়েই বা লাভ কি, অন্তত আধঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।" তাঁবুর পর্দাটা সরিয়ে সে ইনার ফ্ল্যাপের মধ্যে থেকে বার করলে লুঙ্গি, গামছা আর তেলের শিশি। অবাক হয়ে অমল রসিদের কার্যকলাপ দেখছিল। রসিদ বললে, "কি করি বলুন, শালাদের সাফাইয়ের যা বহর ! এসব জিনিস বাইরে রাখার উপায় নেই, তা হলেই টেনে নিয়ে যাবে, আর ফেরৎ চাইতে গেলেই চার্জসীট—"

স্নান সেরে ফিরে রসিদ অমলকে বললে, "ওসব এখন তুলে রাখুন, আমি সব ঠিক ক'রে দেব'খন।"

খাওয়ার জায়গায় গিয়ে অমল দেখলে, সে আর রসিদ একই লাইনে দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞেস করলে, "এখানে বুঝি একটা লঙ্গর ?"

রসিদ বললে, "তুটো আর করবে কেমন ক'রে ? লাঙ্গরী তো মোটে ছ'টা !"

অমল যখন প্লেট পাতলে, তখন সে একটু আশ্চর্যই হয়েছিল। দেখলে, ল্যান্স-নায়েক দত্ত আর একটি ছেলে নিজে পরিবেশন করছে। অমলের প্লেটে তরকারি দিয়ে ল্যান্স-নায়েক দত্ত রসিদকে বললে, "এই ভদ্দরলোককে একটু দেখো রসিদ—উনি আজ নতুন এসেছেন।"

খাওয়া সেরে অমল আর রসিদ তাঁবুতে ফিরে দেখে, তাঁবুর দরজা ফেলা। রসিদ বললে, "শুরু হয়ে গেছে।" অমল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ফিরে চাইলে। রসিদ বললে, "খাওয়ার পর ছোট কক্ষে চলেছে—"

ধোঁয়ায় ভর্তি তাঁবুটার মধ্যে ঢুকতেই দুর্গন্ধে অমলের গা-বমি ক'রে উঠল। পাঁচজনে দুখানা খাটিয়ার ওপর মুখোমুখি বসেছে। প্রৌঢ় লোকটি তখন টান দিচ্ছেন, আর বাকী ছেলেরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই বিপুল টানের দিকে চেয়ে আছে —টান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ়ের দেহটা সোজা হয়ে উঠছে। অমল কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে—একেবারে তার চোখের ওপর বসে গাঁজা খেতে সে আর কখনও দেখে নি!

কাতরস্বরে একজন বলে উঠল, "আর না দাদা, কল্কেটা যে ফেটে যাবে!"

বোধ হয় শিষ্যের কাতর প্রার্থনায় দাদার মন দ্রব হয়েছিল—টান চরমে ওঠার আগেই থেমে গিয়ে কল্কেটা সেই ছেলেটির হাতে দিয়ে বললেন, "নে, তোর কথায় এবারকার মতো ছেড়ে দিলুম—" অমলের দিকে নজর পড়তে বললেন, "কি ভাই চলে-টলে নাকি?"

অমল কুঁচকে গিয়ে বললে, "আজ্ঞে না।"

প্রৌঢ় বললেন, "কি জানি ভাই, নতুন এসেছ—জিজ্ঞেস করা আমার কর্তব্য। এটা না চলে, অন্য রকম যদি চলে তো বলো ভাই—সবরকম ব্যবস্থাই আমার কাছে আছে।"

রসিদ প্রৌঢ়কে বললে, "এবার দাদা দরজাটা তুলে দিই?"

দাদা বললেন, "দে-না ভাই, তোদের বড্ড কষ্ট হচ্ছে, না?"

রসিদ তাঁবুর দরজা তুলে দিয়ে শুয়ে পড়ল, শুয়ে অমলকে জিজ্ঞেস করলে, "আপনার ক্যাটাগরী কি?"

অমল বললে, "গার্ড।"

"আমি মনে করেছিলাম লোকো!"

"কেন?"

ট্রাফিকের লোকেরা সব ভদ্দর মানুষ—আমাদের সঙ্গে মেশেই না।"

উল্টো সারি থেকে নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল। রসিদ বললে, "এখন এগুলো মড়ার মত ঘুমোবে। ক্লাসের হুইসিল পড়লে আবার ওদের ডেকে নিয়ে যেতে হবে—ঘুম কি আর ওদের সহজে ভাঙবে!"

অমলের কেমন যেন আশ্চর্য ঠেকছিল। রসিদ তো গাঁজা খায় না! কিন্তু গাঁজাখোর ওই লোকগুলোর ওপর তার কত দরদ। রসিদ আবার জিজ্ঞেস করলে, "আপনি কতদিন ভর্তি হয়েছেন?"

অমল বললে "এই তো, বড়জোর দিন দশ-বারো।"

"আর আমি, তিনটি মাস দেখতে দেখতে কেটে গেল। কত ঝামেলা যে

আমার ওপর দিয়ে গেল।"

"কি রকম ?"

"তাহলে শুনুন সেই পয়লা থেকে। আমার ভর্তি হওয়ার দিন পনের আগে একদল মানুষ আমাদের গ্রামে গিয়ে ঢেঁড়া পিটিয়ে হাতচিঠি বিলোতে শুরু করে। রেলের কাজে লোক নেবে। খাওয়া-পরা যাবতীয় খরচা গবরমেণ্ট দেবে, এর ওপর আবার মোটা মোটা মাইনে। কাজ জানার দরকার নেই—গভরমেণ্টই শিখিয়ে নেবে।"

একটু থেমে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে, বিছানার ওপর কাৎ হয়ে শুয়ে রসিদ বলে চলল, "আমাদের হাল তখন বেজায় খারাপ। আমাদের পাঁচ বিঘে জমির একটা মৌজা তখন মহাজন পাঁচু শা'র কাছে বন্ধক পড়েছে। সুদের প্রথম কিস্তি আমরা দিতে পারি নি। আমার বাপ ঠিক করেছিল, নতুন ধান উঠলে, সুদে-আসলে সবই শুধে দেবে। ফসল কাটতে গিয়ে লাগল হাঙ্গামা। পাঁচু শা তার লোক-লস্কর দিয়ে জমি ঘিরে রাখল, বললে, 'টাকা আগে না দিলে ফসল কাটতে দেব না।' বাপ অনেক মিনতি করলে, কিন্তু শোনে কে ! বাড়ী ফিরে বাপ মতলব করলে, রাতারাতি ফসল কেটে ঘরে তুলবে। সারারাত ধরে ফসল কেটে ঘরে তুললাম। ফজরে পাঁচু শা'র লোকজন এসে বাড়ী ঘেরাও করল। তারা শাসাচ্ছে, হয় তারা সমস্ত ধান নিয়ে যাবে, নয়তো ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে। বাপ আমার বাঘের বাচ্চা। বাপ লাঠি ধরল, আমার হাতেও লাঠি দিল, বললে, 'জান দেব—তবু ধান দেব না।' আমার মা আর বোনেরা বঁটি, ঝাঁটা নিয়ে উঠানে এসে দাঁড়াল। আমার লাঠিতে একজন জখম হলো।"

রসিদের চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। বিড়িতে জোর দুটো টান দিয়ে আবার বলতে শুরু করলে, "এই না দেখে বাপ ওই ঢেঁড়াওয়ালাদের একটা হাতচিঠি আমার হাতে দিয়ে বলল, 'পুলিশ আসার আগেই সদরে চলে যা, আর নাম ভাঁড়িয়ে মিলিটারীতে ভর্তি হয়ে যা।' আমিও ভর্তি হলাম—ওরা বললে, আমার মাইনে ত্রিশ টাকা। সদর থেকে পাঠিয়ে দিল কোলকাতার এই ট্রেনিং ক্যাম্পে। কাজ শিখলাম মাস খানেক—তারপর এলাম এখানে। ট্রেনিং ক্যাম্পে বলে দিলে, কোম্পানিতে সব মাইনে পাবে। আর কোম্পানিতে বললে, ট্রেনিং ক্যাম্পের মাইনের কথা আমরা কিচ্ছু জানি না—মাস শেষ হলে এখানকার মাইনে পাবে। আমার হাতে একটা পয়সা নেই, কারও কাছে কর্জ করতে পারি

না—সে প্রায় একটা মাস আমার যে কী কষ্টে কেটেছে, তা আর কি বলব ! মাসকাবারে মাইনে নিতে গেলাম—দিলে পনের টাকা। লুইস সাহেব মাইনে দিচ্ছিল, টাকাগুলো টেবিলের উপর রেখে বললাম, আমি কি তোমার ঘরের চাকর, পনের টাকা মাইনে দিচ্ছ ? তিরিশ টাকা হিসাবে দু মাসের ষাট টাকার এক আধলা কম নেব না। লুইস সাহেব তো আমার কথা বুঝল না—সুবেদার সাহেব আমার কথা ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিলে। সেই কথাই শুনে লুইস সাহেব চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আমার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলে। আমিও ঘুরে দাঁড়ালাম, ওসব সাহেব-টাহেব ডরাই না। সুবেদার সাহেব খপ করে আমাকে ধরে ফেলল। আমি সুবেদার সাহেবকে বললাম, 'আমাকে ছেড়ে দাও—তোমাদের কাছে এমন চাকরী আমি করব না।"

রসিদ বিছানার ওপর উঠে বসল। তার শরীরটা যেন ফেঁপে উঠেছে—চোখ দুটো লাল টকটক করছে। নিভে যাওয়া বিড়িটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললে, "হায় খোদা, কোথায় কি ! কোয়ার্টার গার্ড থেকে দুজন সেন্টি এসে আমার দুটো হাত চেপে ধরল, আর পেছন থেকে গার্ড-কমাণ্ডার আমাকে গলাধাক্কা দিতে দিতে কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে গেল। সেখানে নিয়ে গিয়ে আমার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দিলে। এমন জুলুমের রাজত্বে কি আর আমি করব, বসে বসে কাঁদতে লাগলাম—সবই আমার নসিবের ফের ! খানিক পরে এল জমাদার সাহেব। কোন কথা না বলে দমাদম কিল ঘুষি মারতে লাগল। আমি আর কি করব বলুন, পিছমোড়া ক'রে আমার দুই হাতে হাতকড়া লাগিয়ে রেখেছে। এরপর এল মেজর সাহেব—সেটা করল কি, আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে, আমার পেটে মারল একটা ঘুঁষি। দম বন্ধ হয়ে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম, মেজর সাহেব বুট দিয়ে আমাকে একটা লাথি লাগিয়ে চলে গেল।"

অমলের দৃষ্টি ক্রমেই যেন ঝাপসা হয়ে আসছে—সমস্ত শরীরটার মধ্যে দিয়ে শিরশির ক'রে একটা কাঁপুনি খেলে চলেছে। রসিদের মুখখানা সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না, কেবল শুনতে পাচ্ছে, রসিদ তারপরও বলে চলেছে, "এত করেও শালারা সন্তুষ্ট হলো না। পরদিন আমার সালিশ বসল। আমি নাকি লুইস সাহেবকে মারতে গেছি ! সরমের কথা আর বলব কি ! আমাদের দেশী মানুষ ওই সুবেদার সাহেব আমার খেলাফ সাক্ষী দিল, আমার আঠাশদিন কয়েদ হলো।"

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রসিদ চুপ করলে। চোখ দুটো তার জলে ভরে উঠেছে—বুজে আসা গলায় রসিদ বললে, "তারপর থেকে জমাদার সাহেবের ওই টিকটিকিগুলো সারাক্ষণ আমার পেছনে লেগে রয়েছে—যেন আমি একটা দাগী আসামী !"

ক্লাসের হুইসিল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রসিদ আর অন্য সকলে চলে গেছে। তারপর অমল একটু ঘুমোবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ঘুম তার আসে নি—ভয়ে সে কেমন জড়সড় হয়ে উঠেছে।

"কি অমলবাবু ঘুমোচ্ছেন নাকি?" ল্যান্স-নায়েক দত্ত তাঁবুতে ঢুকল। ধড়মড় ক'রে উঠে বসে অমল বললে, "না, এই একটু শুয়েছিলুম। আসুন—বসুন—"

ল্যান্স-নায়েক দত্ত অমলের পাশে বসে বললে, "আমি কিন্তু গল্প করতে আসি নি—এসেছি কর্তব্য পালন করতে—স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার শোনাতে।"

অমল তার মুখের দিকে চাইলে, ল্যান্স-নায়েক দত্ত বলতে শুরু করলে, "এই আজ থেকে আপনার রীতিমত সৈনিকজীবন শুরু হলো। ট্রেনিং ক্যাম্প তো মশাই শ্বশুরবাড়ি! এখন থেকে আপনার চলাফেরা, ওঠাবসা, সব কিছুই এই স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার মোতাবিক করতে হবে।"

অমল বললে, "বলুন—"

"এখানকার প্রোগ্রাম হলো, সকাল পাঁচটায় রিভেলী, অর্থাৎ ঘুম থেকে ওঠা। এরপর পাবেন একঘণ্টা সময়—তার মধ্যে পায়খানা, মুখ ধোয়া, চা খাওয়া, বিছানা ড্রেসিং সেরে পি. টি-র জন্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে। ছটা থেকে সাতটা পি. টি। তারপর আধঘণ্টা ব্রেক অফ্—তার মধ্যে আপনাকে ইউনিফর্ম পরে নিতে হবে। সাড়ে সাতটা থেকে এগারোটা প্যারেড। তারপর খানা আর রেস্ট। ফের একটা থেকে সাড়ে তিনটে টেকনিক্যাল ক্লাস। সাড়ে তিনটে থেকে চারটে টিফিন, অর্থাৎ আপনি এক কাপ চা পাবেন। চারটে থেকে পাঁচটা গেমস। সাতটায় রাতের খাওয়া, নটায় রোলকল। দশটা পনেরো মিনিটে লাইট-আউট, অর্থাৎ আলো নিভিয়ে আপনাকে শুয়ে পড়তে হবে।"

অমল বললে, "তাহলে একটু-আধটু ঘোরাফেরার কোন উপায় নেই?"

"আছে বৈকি। সপ্তাহে কেবল একদিন বেলা একটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ছুটি পাবেন। ফুল ইউনিফর্মে বেলা এগারোটার সময় আপনাকে কোম্পানি অফিসের সামনে ফলইন্ করতে হবে। সুবেদার সাহেবের ইন্সপেকশনে যদি উত্তীর্ণ হতে পারেন, তবেই ছুটি পাবেন।"

অমল বললে, "তারপর?"

ল্যান্স-নায়েক দত্ত একখানা খাতার পাতা খুলে বলতে লাগল, "এই হুকুমের কোন রদবদল না হওয়া পর্যন্ত এই স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার আপনাকে মেনে

চলতে হবে। প্রথম দফা হচ্ছে, আউট-অফ-বাউণ্ডস—ক্যাম্পের আশেপাশে যত বস্তি, শহরের সমস্ত বেশ্যালয় আর সিভিলিয়ান কোয়ার্টার।"

অমল বললে, "তাহলে কি আমার নিজের বাড়ীতেও যেতে পারব না ?"

"হুকুম শোনানো আমার কাজ—তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা আমার কাজ নয়। দ্বিতীয় দফা হচ্ছে, ক্যাম্প ডিসিপ্লিন—সর্বদা ইউনিফর্ম পরে থাকতে হবে, মাথায় সব সময়ে হ্যাট রাখতে হবে, সকল অফিসারকে সকল সময়েই সেলাম করতে হবে।"

অমল আবার প্রশ্ন করলে, "একই অফিসারকে একই দিনে যতবার দেখব, ততবারই সেলাম করব ?"

"এই তো, একটু একটু বুঝতে পারছেন দেখছি ! তারপর তৃতীয় দফা—ক্যাম্পের মধ্যে মাদক দ্রব্য আনা বা রাখা নিষিদ্ধ। মদ খাওয়া মঞ্জুর—কিন্তু মাতাল হওয়া দণ্ডনীয়।"

অমল বিস্ময়ে ফেটে পড়ল, "মদ খেতে পারবে অথচ মাতাল হতে পারবে না—এ আবার কি রকম হুকুম !"

ল্যান্স-নায়েক দত্ত বললে, "একেই বলে মিলিটারী হুকুম। যাক, চলুন আমার সঙ্গে—পায়খানা, প্রস্রাবখানা, বাথরুম, সেলুন, ক্যানটিন, অফিস, সব আপনাকে চিনিয়ে দিই।"

সমস্ত ক্যাম্পটা ঘুরে ঘুরে অমলকে দেখিয়ে আবার তাঁবুতে ফিরে ল্যান্স-নায়েক দত্ত বললে, "চুলটা কিন্তু গেমসের আগেই কেটে নেবেন। বুঝলেন না, ওই খেঁকি কুকুরটাকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই—"

টেকনিক্যাল ক্লাস শেষ হলে রসিদ ছাপাছাপি এক মগ চা নিয়ে তাঁবুতে ঢুকে অমলকে বললে, "নিন, মগটা পাতুন—আপনার জন্যেও এনেছি।" খাটিয়ায় বসে চায়ে কয়েকটা চুমুক দিয়ে বললে, "আপনার প্যাণ্ট দুটো আজই দরজিকে দিয়ে আসতে হবে। আপনি না হয় দু-একটা দিন আমার একটা প্যাণ্ট পরে কাজ চালিয়ে দেবেন।"

অমলের চোখ দুটো যেন জ্বালা ক'রে ওঠে। তাকিয়ে সে রসিদকে দেখে, বারবার তার মনে পড়ে দিবাকরের কথা—এই তো রয়েছে কত মানুষ, যাদের মধ্যে আছে বুকভরা দরদ আর গভীর সহানুভূতি। অমল বললে, "আমি কি ক'রে দরজির দোকানে যাব ?"

"কেন ? ল্যান্স-নায়েক দত্তকে দিয়ে একটা পারমিট করিয়ে নিন না—"

"কিন্তু আমাকে যে আবার চুল কাটতে হবে—জমাদার সাহেবের হুকুম।

আর ল্যান্স-নায়েক দত্ত যে বললে গেমসে ফল্‌ইন করতে !"

রসিদের মুখখানা মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল, "এরই মধ্যে জমাদার সাহেবের নেক-নজরে পড়েছেন !"

চা খাওয়া শেষ করে অমল চুল কাটতে সেলুনে গেল। দেখলে, সে ছাড়াও খদ্দের আরও জনকয়েক রয়েছে। একজন খালি গায়ে একখানা ইটের ওপর বসে চুল কাটছে। তাঁবুর মধ্যেকার ভ্যাপসা গরমে তার গা দিয়ে অঝোরে ঘাম ঝরছে, আর কাটা চুলগুলো তার সর্বাঙ্গে লেপটে যাচ্ছে। একের পর এক ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী চুল কেটে উঠে যাচ্ছে সবাই। চুল কাটার ব্যাপারটাও এখানে অনেক সরল—ঘাড় আর মাথার দুপাশে সোজাসুজি ক্লিপ চালিয়ে প্রথম দফায় মাথার শাঁস বার ক'রে দেওয়া, তারপর সান্ত্বনাস্বরূপ একটু-আধটু কাঁচির ছাঁট।

অবশেষে অমলের টার্ন এল। ইটের ওপর বসে অমল মাথাটা পেতে দিলে—সেইক্ষণে চকিতের জন্যে তার মনে হয় সে যেন হাড়িকাঠে মাথা পেতে দিয়েছে। হঠাৎ আর একজন তার পাশে বসে বললে, "তালুকদার, আমারটা ঝটপট সেরে দাও তো—ছটার শোয়ে জমাদার সাহেবের সঙ্গে সিনেমায় যাব।"

তালুকদার অমলের মাথা থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললে, "আপ থোড়া ঠাড় যাইয়ে—হাবিলদার সাবকো পাঁচ মিনিটমে হো যায়গা—"

অমল দেখলে, হাবিলদার সাহেবের চুল কাটার পদ্ধতিটা কিন্তু অন্য রকমের। চামড়ার একটা ব্যাগ থেকে আরও একটা ক্লিপ বেরুলো, কাঁচি চিরুণীও আরও রকমারি বার হলো, আর তার সব কটাই ব্যবহার হতে থাকল। তালুকদারের হাত কিন্তু এখন আর ঝড়ের বেগে চলছে না। অবশেষে হাবিলদার সাহেবের মাথাটা নিয়ে কিছুক্ষণ মালিশও হলো। গায়ের চুল ঝেড়ে হাবিলদার সাহেব যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন অমল সবিস্ময়ে দেখলে, তালুকদার তো চুল ভালোই কাটে। তবে, সেটা কি শুধু হাবিলদার সাহেব বলেই !

চুল ছেঁটে তাঁবুতে ফিরে অমল সাবান আর গামছা নেওয়ার জন্যে সবেমাত্র স্যুটকেসটা খুলে বসেছে—এমন সময় হুইসিল বেজে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁক, "গেমসকে লিয়ে ফল্‌ইন—"অমলকে এসে পাওড়াও করলেন এক নায়েক সাহেব, "এই, চলো ময়দানমে—"

অমল বললে, "এইমাত্র আমি চুল কেটে আসছি—"

"তবে আর কি, আমার মাথা রক্ষে করেছ। চুল কেটেছ বলে যদি খেলতে না চাও, তাহলে আজ খাওয়াটাও বন্ধ রেখ—"

অমল মুখ ফিরিয়ে নায়েক সাহেবের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ঝনাৎ করে

সুটকেসের ঢাকনাটা ফেলে দিয়ে হনহন করে মাঠে বেরিয়ে গেল। খেলা শুরু হলো। নিস্পৃহ থাকার সংকল্প নিয়েও অমল বেশীক্ষণ উদাসীন থাকতে পারল না। খেলার মাঝে সে-ও মেতে উঠল। দু'একজন ভালো খেলোয়াড়ও আছে —খেলা জমে উঠল বেশ।

খেলা শেষ হলে অপর দলের লেফট-ইনকে দেখিয়ে অমল তার দলের হাফ-ব্যাককে বললে, "ও ভদ্দরলোক তো বেশ খেলেন।"

হাফ-ব্যাক বলে উঠল, "ভদ্দরলোক কি মশাই! উনি যে সুবেদার সাহেব। আপনার সাহস তো কম নয়! খুব তো চার্জ করছিলেন!"

প্রায় ঘণ্টাখানেক মাঠময় দৌড়াদৌড়ি, দাপাদাপি ক'রে অমলের মনটা যেন অনেক হাল্কা হয়ে উঠেছিল। মুহূর্তে মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল— খেলার আনন্দটুকু গেল উবে। তবে কি এবার তার সুবেদার সাহেবের কাছে ডাক পড়বে!

স্নান সেরে তাঁবুতে ফিরে অমল দেখলে, রসিদ তার মশারিটা খাটিয়ে দিচ্ছে; তাকে দেখেই রসিদ বললে, "নিন, চলুন তাড়াতাড়ি—আপনার পারমিট আমি ল্যান্স-নায়েক দত্তর কাছ থেকে এনে রেখেছি—"

অমল বললে, "আর আপনার?"

"আমার জন্যে পারমিট লাগবে না—"অমলের আরও কাছ ঘেঁষে এসে চাপা গলায় বললে, "পায়খানার বোতল হাতে থাকলেই ক্যাম্পের গেট একেবারে খোলা। যাওয়ার সময় বোতলটাকে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে যাব, আর ফেরার সময় বোতলটা হাতে ক'রে ঢুকে পড়ব।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে অমল রসিদের মুখের দিকে তাকালে। রসিদ ম্লান কণ্ঠে বললে, "এখানে এসে পর্যন্ত যেন একটা চোর বনে গেছি। কোন কাজ সিধাসিধি করবার উপায় নেই—এমন কি কারও সঙ্গে দিল খুলে দুটো কথা কইবার উপায়ও নেই—"

"যা বলেছিস মাইরি," বলতে বলতে একটি ছেলে তাঁবুর মধ্যে ঢুকল। রসিদের মুখখানা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আগন্তুক শিবদাস বললে, "আমার তো মাইরি এখানে থাকতেই ইচ্ছে করে না।"

অমল রসিদের দিকে ফিরে তাকালে—দেখলে, রসিদের চোয়ালদুটো শক্ত হয়ে উঠেছে। রসিদ বললে, "ভদ্দরলোকের ছেলে হয়ে যে কাজটা আপনি করছেন, তার জন্যে সরম লাগে না? আমাকে আবার কোয়ার্টার গার্ডে পুরতে পারলে, জমাদার সাহেব বুঝি আপনাকে ল্যান্স-নায়েক বানিয়ে দেবেন?"

শিবদাস বললে, "যাঃ মাইরি, কি সব বলছিস—আমি কি তাই বলেছি নাকি—" বলতে বলতে সে সরে পড়ল।

রসিদ বললে, "লোকটাকে চিনে রাখুন, জমাদার সাহেবের টিকটিকি।"

ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে, রেলের ইয়ার্ড পার হয়ে ওরা সদর রাস্তায় এসে পড়েছে। রাস্তার একধারে বস্তির সারি আর অপর ধারে বাগানবাড়ীর ছ্যাতলাধরা পাঁচিল। রাস্তাটা সরু হলেও পিচঢালা। ইলেকট্রিক যদিও নেই, কিন্তু ঠুলি লাগানো গ্যাসগুলো জ্বেলে দিয়েছে। দু'পাশে কাঁচা নর্দমা পাঁকে ভর্তি—সবুজ আচ্ছাদনের ওপর বড় বড় ফোস্কা ফুটে রয়েছে—তার ওপর কঞ্চি দিয়ে বোনা সেতু, বস্তিতে যাতায়াতের রাস্তা।

রাস্তার আবহাওয়াটাই কেমন যেন রহস্যময়। অমলের যেন গা ছমছম করে। নানান জাতের লোক রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করছে, তাদের মধ্যে অনেকেই অপ্রকৃতিস্থ। একটা গ্যাসের তলায় অনেকগুলি মেয়েছেলে সেজেগুজে গোল হয়ে বসে আছে—তাদের মধ্যে কেউ কেউ সিগারেট টানছে। এদের পেছনে ফেলে ওরা এগিয়ে চলেছে।

কিছুদূর গিয়ে ওরা একটা দরজির দোকানে ঢুকল। রসিদ হাত বাড়িয়ে প্যাণ্ট দুটো দিতেই, দরজি কল থামিয়ে উঠে এসে অমলের মাপ নিতে শুরু করল। রসিদ চাটাইটার ওপর চেপেচুপে বসে আর একজনের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে। মাপ দেওয়া হয়ে যেতেই অমল রসিদকে বললে, "চলুন, আবার বসলেন কেন—হয়তো খাওয়ার ঘণ্টা পড়ে যাবে।"

রসিদ বললে, "একটু চা খাবেন না?"

"নাঃ, ফিরেই তো আবার ভাত খেতে হবে।"

রসিদ উঠে দাঁড়িয়ে দরজিকে বললে, "আজ তাহলে থাক ওস্তাগর সাহেব—আর একদিন না হয় আসা যাবে'খন—"

দরজি বললে, "তা কেমন ক'রে হয় মিয়াঁ! তোমার কথায় সে এতক্ষণ কোন বাবু বসায় নি—তার তো তবে লোকসান হয়ে গেল।"

পকেট থেকে একটা টাকা বার ক'রে দরজির হাতে দিয়ে রসিদ অমলকে বললে, "চলুন—"

ক্যাম্পের দিকে তারা ফিরছে। রসিদ চুপ ক'রে আছে, অমল কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে। আবছায়া অন্ধকার, রাস্তার পাশের লোকের মুখটাও পরিষ্কার দেখা যায় না। কিছুদূর চলার পর হঠাৎ রসিদ বললে, "আমি মাঝে মাঝে আসি—"

রসিদের দিকে চকিতে একবার চেয়ে অমল ভাবলে, এ কথার পিঠে সে কিইবা বলবে! কোথায় আসে, কেন আসে, রসিদ সে সম্বন্ধে কিছু না বললেও, সমস্ত ব্যাপারটা অমল জলের মতো বুঝতে পারছে। আবার রসিদ তেমনি হঠাৎ প্রশ্ন করলে, "আপনি বোধহয় পছন্দ করেন না, না?"

অমল বললে, "না—"

"সে আমি বুঝতে পেরেছিলাম বলেই আজ গেলাম না।"

অমল বিস্মিত হয়ে ভাবছিল, রজতও একদিন তার কাছে এই একই প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে কি দুস্তর প্রভেদ!

ক্যাম্পে ফিরে খাওয়া শেষ ক'রে অমল আর রসিদ তাদের তাঁবুর সামনে বসেছে। রোলকলের তখনও কিছুটা দেরী আছে। সারা মাঠময় লোক রয়েছে ছড়িয়ে, অন্ধকারে তাদের দেখা যায় না, কেবল চোখে পড়ে সিগারেট-বিড়ির আগুন। রসিদ বললে, "এই সময়টায় জমাদার সাহেবের টিকটিকিগুলোর ভারী স্থবিধে—"

অমল বললে, "থাক তবে, ওসব আলাপ আর ক'রে দরকার নেই।"

রোলকলের হুইসিল পড়ল। সিগারেট-বিড়ির আগুনগুলো ধীরে ধীরে মাঠের মাঝে জমা হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত অন্ধকার। শুরু হলো রোলকল। সমস্ত কোম্পানিটা দাঁড়িয়েছে দুভাগে ভাগ হয়ে—লোকো আর ট্রাফিক। হাবিলদার মেজর নিচ্ছেন রোলকল। বেশ তাড়াতাড়িই শেষ হলো, হুকুম মানার উপদেশ আর ভাই-বন্দির কিসসার উপদ্রব নেই। পরদিনের প্রোগ্রাম—রুট মার্চ, তারই টাইম-টেবল আর পোশাকের বিবরণ।

রোলকল শেষ হতে রসিদ অমলের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসে থেকে তাঁবুর মধ্যে চলে গেল। অমল উঠি উঠি ক'রেও যেন উঠতে পারে না। ফাঁকা মাঠ, নিকষ-কালো অন্ধকার, তার মাঝে বিড়ি-সিগারেটগুলো জোনাকির মতো জলছে আর নিভছে। হাওয়া দিচ্ছে মৃদুমৃদু—শুকনো ঘাসের ওপর শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। অমল ভাবছে তার ফেলে-আসা জীবনের কথা—একটা অবলম্বন সে খুঁজছে, যাকে সে তার সৈনিকজীবনের অবসর মুহূর্তগুলোতে আঁকড়ে ধরবে—কিন্তু কিছুই তো তার নেই! যা আছে তা কেবল সম্ভাবনা—সুযোগ পেলে সে কি হতে পারত! পয়সা থাকলে সে কি করতে পারত! তাঁবুর মধ্যে থেকে হাসির একটা হল্লা ভেসে আসে—অমলের চিন্তার জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সে সৈনিক, এই রূঢ় বাস্তব তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—পরদিন সকালে রুট মার্চ, কাজেই সকাল সকাল উঠতে হবে।

তাঁবুর পর্দা সরিয়ে মাথাটা গলিয়ে দিতেই এ্যালকোহলের তীব্র গন্ধে অমলের মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। বারেক মাথাটা টেনে নিয়েই আবার সে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ে। সিটে পৌছতে পৌছতে মাথাটা তার ভারী হয়ে আসে। হামাগুড়ি দিয়ে সে বিছানার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

একটি ছেলে বললে, "একটা রসালো গল্প ছাড় দাদা—"

দাদা বললেন, "দূর, এমন মৌজের সময় কি বকবক করে?"

"না দাদা, তোমার মুখে একটা গল্প না শুনলে যে ঘুমই আসবে না।"

দাদার গল্প শুরু হলো। সত্যি সে এক রূপকথা—বিকৃত মনের কামনা-বাসনার বিকারগ্রস্ত অভিব্যক্তি। ইনিয়ে বিনিয়ে চলল নারীদেহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, রতিক্রিয়ার মানস-মৈথুন। শুনতে শুনতে অমলের শরীর কুঁকড়ে উঠেছে—অস্বস্তিতে সে পাশ ফিরে শুয়েছে। গল্প চলেছে চোঁয়া ঢেঁকুরের মতো জ্বালাময়—তার সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরে গেছে, চামড়ার তলে তলে আগুন জ্বলে উঠেছে। থাবা মেলে অমল কম্বলটা চেপে ধরল।

জোর গুজব কোম্পানি শীগগিরই মুভ করছে।

কিন্তু কোথায়? জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। ইরাক, ইরাণ, চীন, উত্তর আফ্রিকা, এমন কি রাশিয়ার নামটাও বাদ পড়ে নি।

খবরের সন্ধানে অমলও ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু খবরগুলো এতই সচল যে কোনটা সবচেয়ে তাজা, তার হদিসই পাওয়া যায় না। অমল ভাবে, লেনিনগ্রাড, মস্কো, কোনটাই তো ফল করল না,তবে আর কবে জার্মানী আসবে ভারতবর্ষে! জার্মানী না এলে কি ব্রিটিশের হাত থেকে কোনদিন মুক্তি পাওয়া যাবে!

ছোট একটা দল এক জায়গায় গোল হয়ে আড্ডা জমিয়েছে। অমল ধীরে ধীরে সেইদিকেই চলেছে। মুভের খবরটা সকলকেই যেন বেশ চাঙ্গা ক'রে তুলেছে। কিন্তু যেখানেই তারা যাক না কেন, সেটা তো লড়াইয়ের মাঠ, তার মানে মৃত্যুর দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে যাওয়া। তবুও তো মনটা খুশি হয়ে উঠেছে এই ভেবে যে, তাদের এই একঘেঁয়ে জীবনের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসবে।

আড্ডাটার কাছাকাছি এসে অমল শুনলে, খগেন বলছে, "কিন্তু যাই বলো ভাই, ফ্রন্টে যাওয়া মোটেই সুখের খবর নয়—শেষ পর্যন্ত বেঘোরে প্রাণটা দিতে হবে তো!"

মৃগাঙ্ক বললে, "দূর ক্যাবলা, আমরা প্রাণটা দিতে যাব কেন? আমরা তো আর রেগুলার ফোর্স নই যে রাইফেল ঘাড়ে ক'রে ট্রেঞ্চে নেমে লড়াই করব। আমরা চালাব রেল—ফ্রণ্ট-লাইন থেকে বহু দূরে।"

পাঁচকড়ি খেঁকিয়ে উঠল, "তোমায় বলেছে! রোজ যদি অন্তত খবর-কাগজটাও পড়তে। আরে বাবা, রেলওয়ে হলো আসল রাস্তা—ওই পথ দিয়েই তো লড়াইয়ের সমস্ত রসদ যাতায়াত করে। দেখ না, রাশিয়াতে রোজই একটা না একটা রেল জংশন বারকয়েক হাতবদল হচ্ছেই—"

হঠাৎ নজরটা ঘুরে গেল। কোম্পানি অফিসের অর্ডারলি সোহ্রাব ওই দিকেই আসছে। মৃগাঙ্ক বললে, "সোহ্রাবকে চেপে ধরলে হয় তো একটা হদিস পাওয়া যেতে পারে।"

মৃগাঙ্কর পেছন পেছন সকলেই গিয়ে সোহরাবকে ঘিরে ধরল। মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করলে, "হ্যাঁরে, কোম্পানি নাকি শীগগিরই মুভ করছে?"

সোহরাব নিতান্ত নিস্পৃহভাবে বললে, "শুনছি তো রোজই।"

সুধেন্দু একেবারে সামনে এসে বললে, "কি শুনছিস রে?"

সোহরাব বললে, "ব'লে কি আমি কোয়ার্টার গার্ডে যাব নাকি?"

পাঁচকড়ি বললে, "আমাদের কাছে বলতে ভয়টা কিসের? আমরা তো আর জমাদার সাহেবের কাছে গিয়ে চুকলি করব না।"

সোহরাব যেন একটু নরম হলো, বললে, "সব কথা কি আর বুঝতে পারি ছাই—ইংরেজিতে কত কথাই বলে। এই তো আজও হেড ক্লার্ককে বলছিল। হেড ক্লার্ক আমাকে পাঠিয়েছে কোয়ার্টার মাস্টারের কাছে প্যাকিং বক্সের স্টক জানতে। এই তো এই কাগজটায় লিখে দিয়েছে—"

মৃগাঙ্ক ছোঁ মেরে সোহরাবের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে নিলে, সঙ্গে সঙ্গে সোহরাব মৃগাঙ্কর হাত চেপে ধরে বললে, "ও কাগজ পড়লেই আমি এ্যাড-জুটাণ্ট সাহেবকে বলে দেব—ভালো চান তো ফিরিয়ে দিন বলছি—"

অনেক কাকুতি-মিনতি করল মৃগাঙ্ক, কিন্তু সোহরাব কোন কথা শুনল না—কাগজটা নিয়ে সে স্টোরের দিকে চলে গেল। মৃগাঙ্ক আপন মনেই গর্জে উঠল, "করে তো অর্ডারলির কাজ, তার ডাঁট্ দেখ না, যেন ও নিজেই একটা এ্যাডজুটাণ্ট!"

ভিড়টা পাতলা হয়ে গেল—ছোট ছোট দলে কিছু কিছু এদিক-সেদিক চলে গেল। প্যাকিং বক্সের হিসেব নেওয়া—এইটাই তো একটা বিরাট খবর—এরই ভিত্তিতে আবার নতুন ক'রে জল্পনা-কল্পনা করা যায়।

খগেন বললে, "আরে বাবা যেখানেই যাও না কেন, মরতে তো হবেই!"

মৃগাঙ্ক বললে, "আমি তো জানি, কেবল একবার মিলিয়ে দেখছিলুম।"

সুধেন্দু বললে, "তবে বাছাধন ন্যাজে খেলাচ্ছ কেন? বলেই ফেল না—"

"বলতে আর আমার কি আপত্তি, কিন্তু একজন যে মারা পড়বে।"

"কেন? এক দিন তো আমরা সেখানে যাবই। আর দুদিন আগে জানলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?"

মৃগাঙ্ক খেঁকিয়ে উঠল, ব্যাপারটা অত সহজ নয় রে—জানিস্ সিকিউরিটি কাকে বলে?"

পাঁচকড়ি বললে, "কেন শুধু শুধু গুল মারছিস মাইরি। ওসব বুক্নি ছেড়ে দিয়ে যা জানিস তাই বল—না হয় এক প্যাকেট উডবাইন খাওয়াব'খন।"

মৃগাঙ্ক বললে, "নাঃ, তোরা একেবারে গেঁয়োভূত, কিচ্ছু জানিস না! সিকিউরিটি হচ্ছে মিলিটারীর সব চেয়ে বড় অস্ত্র—জান্ যাবে তবু মুখ খুলবে না। তুমি যদি কোন খবর জানতে পার, তা হলে সে খবর দ্বিতীয় কাউকেও জানাবে না। যদি জানাও, তাহলেই শত্রুপক্ষ জানতে পারবে আর আমাদের সমস্ত প্ল্যান বানচাল করে দেবে।"

শ্রোতার দল বিস্ময়ে বেবাক হয়ে গেছে, তাদের বুদ্ধির পরিধির মধ্যে মৃগাঙ্কর এই অকাট্য যুক্তিকে খাপ খাওয়াতেঁ পারছে না। মিলিটারীতে কি সবই আজব! তবুও খগেন বললে, "যে যায়গায় আর দুদিন বাদে আমরা সশরীরে হাজির হব, সেই জায়গাটার নাম জানাতে এদের এতই ভয়! আমাদের এতই অবিশ্বাস! কেন, আমরা জানতে পারলে বুঝি জার্মানদের কানে কানে বলে আসব?"

মৃগাঙ্ক বললে, "জার্মানদের চেয়ে জাপানীরাই এখন অনেক কাছে এসে পড়েছে—আর ভয় এখন তাদেরই বেশী। তুই যে জাপানীদের কাছে বলবি, সে কথা আমি বলছি না; কিন্তু আমাদেরই মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যারা একাজ করছে। বলতে পারিস, জি· পি· ও-র রং বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই দিনই টোকিও রেডিয়ো থেকে সে খবর দেয় কি করে?"

দলটার মধ্যে থম্‌থমে একটা ভাব ঘনিয়ে এল। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে কেমন যেন সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। সত্যিই তো, এ সব খবর দেয় কে!

পাঁচকড়ি বলে উঠল, "যা যা, তোকে আর বলতে হবে না—ঢের কেরামতি হয়েছে—"

মৃগাঙ্ক বললে, "বললে আর আমার কি ক্ষতি! কিন্তু বেচারা মজুমদার মশাই যে কোর্ট মার্শালে চড়বে—"

"কোর্ট মার্শাল!"

"হ্যাঁরে হ্যাঁ। এ খবর যদি ক্যাম্পময় জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে মজুমদার মশায়ের নির্ঘাত কোর্ট মার্শাল। জানিস, অফিসের প্রত্যেকটি স্টাফকে অফিসিয়াল সিক্রেটস্ এ্যাক্ট অনুযায়ী বণ্ড দিতে হয়েছে। কোম্পানির কোন সিক্রেট খবর যদি বেরিয়ে পড়ে, তাহলে তিন বছর থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত জেল দিতে পারে, ফাঁসিতে লটকাতে পারে, গুলি করে মারতে পারে।"

শ্রোতাদের ধৈর্যের বাঁধ খানখান হয়ে গেছে। গজগজ করতে করতে অনেকেই এদিক-ওদিক চলে গেল। যে চার পাঁচজন রইল, তাদের আরও কাছে ডেকে মৃগাঙ্ক ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "আমরা যাচ্ছি নর্থ আফ্রিকায়। এই সপ্তাহেই আমরা মুভ করছি। এখান থেকে রওনা হয়ে বম্বে—বম্বে থেকে জাহাজে বেনগাজি—"

সেদিন রাতে রোল-কলের পর রসিদ অমলকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলে, "বেনগাজি কোথায় অমলবাবু?"

অমল বিস্মিত হয়ে বললে, "কেন?"

"আমরা নাকি কালই সেখানে যাচ্ছি—সত্যি নাকি অমলবাবু?"

"তা আমি কেমন করে জানব বলো।"

"আপনি কিছু শোনেন নি?"

"হ্যাঁ শুনছি তো অনেক কিছুই। তা মিলিটারীতে যখন ঢুকেছি, তখন যেখানে এদের দরকার সেখানেই নিয়ে যাবে।"

রসিদ কেমন যেন মন-মরা হয়ে গেছে—কি যেন সে ভাবছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললে, "আপনার বাপ-মা এখবর শুনলে কি করবেন—একবার ভাবুন তো!"

"কিন্তু সে কথা তো আর চলে না রসিদ—আমরা যে বণ্ডে সই করেছি।" রসিদ কিছুক্ষণ অমলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কি যেন সে অমলের মুখের মধ্যে খুঁজতে থাকে, বণ্ডে সই করার তাৎপর্য সে বোঝে না, আইনের বাঁধন তার সরল মনের টুঁটি চেপে ধরতে পারে না। সোজাসুজি সে অমলকে প্রশ্ন করে, আপনি তা হলে যাবেন?"

দিশেহারা হয়ে অমল বললে, "না গিয়ে যে উপায় নেই রসিদ!"

রসিদ আর কোন কথা না বলে হনহন করে তাঁবুর মধ্যে চলে গেল। অমলের

মনে হলো, রসিদের সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক যেন শেষ হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে অমল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। রসিদের তুলনায় নিজেকে যেন তার বড়ই দুর্বল মনে হয়। একবার তার ইচ্ছে হয় রসিদকে জিজ্ঞেস করে, সে কি করবে ঠিক করেছে।

তাঁবুগুলোর ধার ঘেঁষে অমল ছোট ছোট ধাপ ফেলে এগিয়ে চলেছে, মাথাটা তার ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। প্রত্যেক তাঁবুটির আশেপাশে ছোটছোট দলে জটলা চলেছে। সেই বেনগাজি! তার মানে স্লটার হাউস—যেখানে তাদের একটি মাত্র কর্তব্য হচ্ছে চোখ-কান বুজে মরা!

তাঁবুতে ফেরার পথে অমল শুনতে পেলে, "আরে, জার্মানরা ইণ্ডিয়ানদের কিছু বলবে না—আর বেগতিক দেখলে হাত তুলে দাঁড়িয়ে যাব!"

অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত তুলে দাঁড়ালেই বাঁচতে পারবে! জার্মানরা ইণ্ডিয়ানদের কিছু বলবে না! অথচ পোল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে তবে এমন বর্বর অত্যাচার চালায় কেন?

পা চালিয়ে এসে অমল তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ল। রসিদ শুয়ে পড়েছে—সত্যিই যেন রসিদ বড্ড বেশী ভয় পেয়েছে, একেবারে মুষড়ে পড়েছে! জামা-কাপড় বদলে অমল মশারির মধ্যে ঢুকে পড়ল। বেনগাজি অভিযানের ওপর মনটাকে নিবদ্ধ করার চেষ্টা করে সে। কিন্তু তাঁবুটার আবহাওয়াই যেন অন্যরকম! রসিদ যে ঘুমোচ্ছে না, একথা সহজেই বোঝা যায়; কিন্তু সে যে একটুও নড়ছে না—তাকে ডাকতে কেমন যেন সংকোচ লাগে।

দাদার মদ গেলা বোধহয় শেষ হলো—নবীন আর সুরেশও শুয়ে পড়েছে। হঠাৎ অমল সজাগ হয়ে উঠল, এইবার তো দাদার গল্প শুরু হবে!

সুরেশ বললে, "হ্যাঁ দাদা, বেনগাজি গেলে তোমার কি উপায় হবে?"

দাদা বললেন, "উপায় একটা হবেই রে। বুঝলি না, যে খায় চিনি—যোগান চিন্তামণি।"

নবীন বললে, "সে না হয় বুঝলুম। কিন্তু বৌদির কি বন্দোবস্ত করছ?"

"কেন ভাই, তোমার বৌদিকে তো বলে দিয়েছি, যে কদিন আমি মিলিটারীতে আছি, সে কদিনের জন্যে যেন একটা জোগাড় করে নেয়।"

"বলো কি দাদা! তুমি যে দেখছি একেবারে মহারাজ পাণ্ডু!"

"কেন, তোমার বৌদি বুঝি একটা মানুষ নয়—তার বুঝি আর রক্ত-মাংসের শরীর নয়! এখানে তো আমি বেপরোয়া মজা লুটছি—আর তোমার বৌদি বুঝি বছরের পর বছর সংযম সাধনা করবে! অত স্বার্থপর আমি নই ভাই—"

বাইরে থেকে নাইট-পিকেট হাঁক পাড়ল, "এই, বাত্ত বন্দ্—লাইট আউট হো গয়া—"

পরদিন পি. টিতে পাঁচজন গরহাজির। সেকশন-কমাণ্ডাররা প্রচুর হাঁক-ডাক করল, লোক পাঠিয়ে তাঁবু, পায়খানা তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো। কিন্তু কাউকেও পাওয়া গেল না। প্যারেড ফল্-ইনের সময় সকলেই শঙ্কিত সন্ত্রস্ত! পাঁচ-পাঁচজন লোক পালিয়েছে, ব্যাপারটা তেমন সহজ নয়!

প্যারেড শুরু হওয়ার আগেই সুবেদার সাহেব তেড়ে-ফুঁড়ে এসে বললেন, "যে যে টেণ্ট থেকে লোক পালিয়েছে, তারা আলাদা ফল্-ইন।"

জড়সড় অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে তিনটি তাঁবুর লোকেরা বেরিয়ে এল। প্রথম দলের সামনে গিয়ে হেঁকে উঠলেন, "তোমাদের কতজন?"

ছেলেরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে থাকে—কে জবাব দেবে! তাদের মধ্যে একজন ল্যান্স-নায়েকও নেই! সকলেই এ্যাটেনশন অবস্থায় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুবেদার সাহেব এক কদম এগিয়ে এসে পা ঠুকে, একজনের নাকের ডগায় আঙুল নেড়ে চিৎকার করে উঠলেন, "বাতাও, কেত্না আদমি?"

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি বলে উঠল, "একজন স্যার।"

"কি ধর গিয়া?"

"জানি না স্যার।"

"ব্লাডি তুম ক্যোঁ নহি জানতা?"

ছেলেটির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, গলাটা দপ দপ করছে, কপাল ঘেমে উঠেছে। বারকয়েক ঢোক গিলে বললে, "আজ্ঞে স্যার—আমি তো স্যার—ঘুমোচ্ছিলাম স্যার—"

"তবে আর কি, আমার মাথা রক্ষে করেছ—" খেঁকিয়ে উঠে সুবেদার সাহেব দ্বিতীয় দলের সামনে গিয়ে বললেন, "তোমাদের কজন?"

একসঙ্গে তিন চারজন বলে উঠল, "তিনজন স্যার—"

সুবেদার সাহেব বোমার মতো ফেটে পড়লেন, "হোয়াট!" চোখদুটো কপালে তুলে বললেন, "ব্লাডি তুম্‌লোগ মর্ গিয়া থা?"

এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে একজন উত্তর দিলে, "না স্যার—"

"না স্যার! দেন্ হোয়াট দি ব্লাডি হেল্ ইউ ওয়্যার ডুইঙ?"

"আজ্ঞে স্যার, ঘুমোবার আগে পর্যন্ত দেখেছি, সকলেই বিছানায় ছিল স্যার —ওদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল স্যার—"

সুবেদার সাহেব আঙুল নেড়ে ছেলেটিকে ডাকলেন, "তুমি শোন—" একটু তফাতে ডেকে বললেন, "বলো কি কথাবার্তা হচ্ছিল ?"

"কথাবার্তা স্যার ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে বললে, তোমার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল।"

"না স্যার, আমি তো ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি নি স্যার। ওরা সকলে স্যার, খারাপ গল্প বলাবলি করছিল।"

কটমট ক'রে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাও, ফল্-ইন্—"

তৃতীয় দলের সামনে সুবাদার সাহেব এসে দাঁড়াতেই, অমলের মাথাটা ঘুরে উঠল। চোখের দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে উঠেছে। রসিদ পালিয়েছে,, কিন্তু রসিদ যে তার সঙ্গে একটু বেশী মেলামেশা করত !

সুবেদার সাহেবের স্বর কিন্তু মোলায়েম হয়ে গেছে, সহজভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের তাঁবু থেকে কেবল রসিদ বুঝি ?"

দাদা বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার—"

"আচ্ছা—" আর কিছু না বলে চলে গেলেন অফিসের দিকে।

যথারীতি প্যারেড শুরু হলো। কোন সেকশনে রাইফেল, কোন সেকশনে ব্রেন-গান, আর বাকী সকলের স্কোয়াড ড্রিল। সেকশন-কমাণ্ডাররা তটস্থ হয়ে উঠেছে। স্কোয়াড ড্রিলের হাবিলদার একটানা চেঁচিয়ে চলেছে, লেফট—রাইট —লেফট, মুহূর্তের জন্যেও সে আজ ঢিলে হবে না।

ব্রেন-গানের ইন্সট্রাকটর ছেলেদের বসতে না দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, যদিও অন্য ছেলেরা ব্রেন-গানটাকে ঘিরে বসে। কিন্তু আজকের অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা !

রাইফেলের ইন্সট্রাকটর ছেলেদের দাঁড় করিয়ে রেখেও মনে যথেষ্ট ভরসা পাচ্ছে না, অকারণে প্রত্যেককে রাইফেল দুহাতে মাথার উপর তুলে খানিকটা দৌড় করাচ্ছে।

ছেলেরা সকলেই বুঝতে পারছে, তাদের ওপর অহেতুক অত্যাচার হচ্ছে, রামের অপরাধে শ্যামের মাথায় লাঠি পড়ছে—তবুও তারা প্রতিবাদ করছে না। অনাগত এক দুর্দৈবের আতঙ্কে তারা বিহ্বল হয়ে পড়েছে। গভীর উৎকণ্ঠায় সকলে অপেক্ষা করছে, মেজর সাহেব খোদ কখন প্যারেড গ্রাউণ্ডে আসবেন। তারপর যা হবার তা হয়ে যাক !

কিন্তু প্যারেডের সময়টা নির্বিঘ্নে কেটে গেল। মেজর সাহেব অবশ্য আসেন নি, কিন্তু অন্যান্য অফিসাররা যথারীতি এসে প্যারেড পরিদর্শন ক'রে গেছেন। কিন্তু অভাবনীয় কিছু একটা ঘটে নি!

বিকেলের দিকে ক্যাম্পের চেহারা গেল বদলে। দুজনের জায়গায় ছ'জন রাইফেলধারী সেন্ট্রি বেয়নেট ফিক্স ক'রে দাঁড়িয়েছে ক্যাম্পের চার কোণে আর দুই গেটে। ছ'জন ডাণ্ডা-সেন্ট্রি ডাণ্ডা-ঘাড়ে মোতায়েন হয়ে গেছে পায়খানা, প্রস্রাবখানায়, বাথরুমে, লঙ্গরখানার পেছনে আর ভাঙ্গা বেড়ার সামনে। লাইন সেন্ট্রির ডিউটি শুরু হবে সন্ধ্যে থেকে—তাঁরা সমস্ত ক্যাম্পটা ঘুরে ঘুরে পাহারা দেবে। নাইট পিকেটের ডিউটি শুরু হবে লাইট আউটের সময় থেকে। আর সবার অলক্ষ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে জমাদার দাশগুপ্তর ইন্‌টেলিজেন্স স্কোয়াড—তাঁবুর আড়ালে-আবডালে তারা ওৎ পেতে আছে; যেখানেই গুটিকয়েক ছেলে বসে গল্পগুজব করছে, সেখানেই তারা নিঃসাড়ে ভিড়ে পড়েছে।

ক্যাম্প চৌহদ্দির বাইরে যাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। বিড়ি-সিগারেটের অভাবে ধূমপানকারীদের পেট ফেঁপে উঠেছে, তবুও তারা ছুটি চাইতে সাহস পাচ্ছে না; হয়তো তাকেই চেপে ধরবে, পালানোর ফিকির মনে ক'রে! বেড়ার দশহাতের মধ্যে যাওয়ার উপায় নেই, তাহলেই কোন না কোন সেন্ট্রি হাঁক পাড়বে। পায়খানায় যাওয়ার সময় একজন ডাণ্ডা সেন্ট্রি ডাণ্ডা উঁচিয়ে পেছনে পেছনে যাবে, কর্মসমাপনান্তে ডাণ্ডার ডগায় তাকে আবার ক্যাম্প চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। গার্ডরুমের খাতায় প্রত্যেকের বাইরে যাওয়া ও ফিরে আসার সময় নোট করা হচ্ছে।

রোলকলের হুকুম শুনে ছেলেরা বুঝল, আশঙ্কা তাদের অমূলক নয়। পরদিন সমস্ত কোম্পানির ফেটিগ—তার মানে, রগড়ানি শুরু হলো!

কিছুক্ষণ পরে মেজর সাহেব স্বয়ং এসে দাঁড়ালেন রোলকলে। তাঁর আবির্ভাবে ছেলেদের হাত-পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকে যায়। নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে কাষ্ঠবৎ তারা দাঁড়িয়ে আছে। মেজর সাহেব বললেন, "তোমরা সকলে বসে পড়—তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়ই?"

মেজর সাহেবের স্বর কোম্পানির প্রত্যেকটি ছেলেই চেনে, কিন্তু এমন মোলায়েম স্বর তো কখনো শোনে নি! সত্যিই ইনি মেজর রায় তো! চোখ পিটপিট ক'রে তারা মেজর সাহেবের মুখখানা দেখবার চেষ্টা করে।

মেজর সাহেব উপবিষ্ট ছেলেদের আরও কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন, "তোমাদের কাছে আজ এমন একটা খবর এনেছি, যা শুনলে তোমরা

সকলেই খুশি হবে—আমরা কাল এখান থেকে মুভ্ করছি। তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে—কোথায় আমরা যাচ্ছি ? কিন্তু আমিও তোমাদের মতোই এর বেশী আর কিছু জানি না। মিলিটারীতে ট্রুপস মুভমেণ্ট হচ্ছে সবচেয়ে গোপনীয় ব্যাপার।"

একটু থেমে পাইপটাকে ধরিয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, "কাল সকাল থেকেই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। অনেক কাজ আমাদের। এই ক্যাম্পের প্রতিটি জিনিস আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে হবে। আমি দেখতে চাই তোমরা প্রত্যেকে হাসি মুখে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তোমাদের কাজ হাসিল করেছ।"

মেজর সাহেব থামলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার সাহেব মেজর সাহেবের কানে কানে কি যেন বললেন। মেজর সাহেব ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বলে চললেন, "তোমরা সকলেই আমার ছেলে। তোমাদের মতো আমারও একটি ছেলে মিলিটারীতে রয়েছে। ভর্তি হওয়ার পর থেকে কোথায় যে সে আছে, তা আজও আমি জানি না। তাই তোমাদের মধ্যেই আমি তাকে দেখতে পাই। তোমাদের কোন কষ্ট হলে, সে কষ্ট আমাকেই বেশী বাজে। কিন্তু সৈনিকের জীবনই হলো কষ্টের জীবন, আর কষ্টকে যে ভয় পায় না, সেই হলো সত্যিকার সৈনিক। আমার কোম্পানীর পাঁচটি ছেলে পালিয়ে গেছে, তারা যে আমার মনে কত কষ্ট দিয়ে গেছে, সেকথা তোমরা বুঝতে পারবে না। তোমাদের সকলকেই আমি বলছি, তোমাদের যদি কোন কষ্ট হয়, তোমরা আমাকে জানাও, আমি সে কষ্ট দূর করব। আর তা যদি না পারি, আমি নিজেই তোমাদের ছেড়ে দেব। কিন্তু এভাবে তোমরা পালিও না—পালিয়ে তোমরা বাঁচতে পারবে না—পুলিশ তোমাদের খুঁজে বার করবেই। মিলিটারী আইনে ডেজার্টারের জন্যে যে শাস্তি, তা অমানুষিক। সে শাস্তি আমি তোমাদের কাউকেও দিতে চাই না।"

ছেলেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবছে, "যাক বাবা, সারাদিন যে একপায়ে দাঁড় করিয়ে রাখে নি, সেই আমাদের জোর বরাত!"

মেজর সাহেবের লেকচারের পর মন সকলের হাল্কা হয়ে গেছে। ছেলেরা আবার ছোট ছোট দলে আড্ডা জমিয়েছে। সারাদিনের চাপাপড়া সমস্ত কথা যেন তুবড়ির মতো ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

অমল অস্থির ভাবে মাঠময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। অনেক কথা ঝাঁক বেঁধে তার মনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তাহলে সত্যিই মুভ

করতে হবে ? সে যেন কিছুতেই খুশি হতে পারছে না। এ্যাডভেঞ্চার আর রোমাঞ্চকতার আকাঙ্ক্ষা এই এক মাসের সৈনিকজীবনে তার মধ্যে থেকে উবে গেছে।

এই যাওয়াকে কি কোন ভাবেই এড়ান যায় না। মনে পড়ল রসিদের কথা। রসিদ তো নিজেই নিজের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে—মেজর সাহেবের করুণা আর মিলিটারী আইনের ফাঁকের জন্যে অপেক্ষা করে নি! কিন্তু রসিদ পালাল কেন ? নিছক মরণের ভয় ? না না রসিদ কাপুরুষ নয়—সে মার খেতেও পারে, আবার মার লাগাতেও পারে। তবুও তো রসিদ পালাল!

রসিদের অভাবে অমলের মনটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। রোলকলের পর রোজই তারা খানিকটা গল্পগুজব করত। রসিদ বলত তার কৃষকজীবনের কথা, তার পারিবারিক আচার-ব্যবহারের কথা, তাদের গ্রাম্য সমাজের কথা, জমিদার মহাজনের জুলুম-অত্যাচারের কথা। সে অবাক হয়ে শুনেছে আর ভেবেছে—এতবড় একটা জগৎ তার কাছে এমন মারাত্মক ভাবে অজানা ছিল কেমন ক'রে ?

রসিদ তার পারিবারিক জীবনের কথা কত নিঃসংকোচে বলে গেছে। কয়েক দিন আগে বলেছিল এক আকাল-বছরের কথা। সে বছরে মরেছিল বহুলোক কেবল খেতে না পেয়ে। রসিদ তখন ছোট। কত আবেগ ঢেলে আর গর্বভরে রসিদ বলেছে, কেমন ক'রে তার বাবা-মা, ভাই-বোন সকলে গঞ্জে গিয়ে মোট বয়ে, লোকের বাড়ী বাড়ী জন খেটে কোন রকমে দুমুঠো খেয়ে প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

অমল ভাবতে চেষ্টা করেছে, এমন একটা অবস্থায় পড়লে তার বাড়ীর লোকেরা কি করত! তার বাবা-মা, ভাই-বোন রাস্তায় বার হয়ে গতরে খেটে অন্ন সংস্থান করবে, এ কথা ভাবতেই তার মন কুঁকড়ে উঠেছে। কিন্তু রসিদের সমাজের মতো সহজ সমাধানও খুঁজে পায় নি।

রসিদের কাছে অমল তার পারিবারিক জীবনের কথা বলতে কেমন যেন সংকোচ বোধ করেছে। তাদের বাড়ীর মেয়েরা যে কতখানি অসহায়, সে তুলনা তাকে ব্যথিত করেছে। তাদের সমাজের এই পঙ্গুত্ব তাকে রসিদের কাছে অনেক ছোট ক'রে ফেলেছে। তাই সে রসিদের কাছে ঘরের কথা এড়িয়ে গিয়ে বলেছে দেশবিদেশের কথা, তার বইয়ে পড়া, মুখস্থ করা, পরীক্ষার খাতায় উগরে দেওয়া বড় বড় গালভরা কথা।

হঠাৎ অমলের মনে হলো, সে-ও তো পারে রসিদের মতো পালিয়ে যেতে!

থমকে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। না, তা সে কিছুতেই পারবে না। পলাতক হয়ে কাপুরুষের মতো মাথা নীচু ক'রে তার বাড়ীতে, তার বন্ধুবান্ধবদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। তারা তার সামর্থ্যের, তার ব্যক্তিত্বের মাপে তাকে বিচার করে না। তারা তাকে বিচার করে তাদের প্রত্যাশার মাপকাঠি দিয়ে—সেই প্রত্যাশার একতিল এদিক-ওদিক হলে, তারা তাকে তাচ্ছিল্য করবে, ঘৃণা করবে, নস্যাৎ ক'রে দেবে!

আধো-অন্ধকারে তাঁবুর আশপাশ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে অমল যেন আর নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার অজান্তেই সে কখন লক্ষ্য করতে শুরু করেছে, কোনখানটায় ডাণ্ডা-সেন্ট্রি নেই, কোনখানটায় বেড়া ভাঙা, কোন খানটা দিয়ে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় পৌছান যায়।

তাড়াতাড়ি অমল মাঠের মধ্যে চলে এল। এক জায়গায় বসে অনেকগুলো ছেলে তুমুল তর্ক জুড়ে দিয়েছে। অমল দাঁড়িয়ে পড়ল।

পাঁচকড়ি বলছে, "আলবৎ দেবতা, যে কথা আজ রোলকলে বলেছেন, সে কথা নিজের বাপেও বলে না!"

অমল সমস্ত দলটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে। একের পর এক প্রত্যেককে লক্ষ্য করতে গিয়ে তার চোখ দুটো আটকে গেল শিবদাসের মুখের ওপর। শিবদাস! কয়েক পা অমল এগিয়ে গেল—ওদের সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার।

অনন্ত বললে, "দেবতা কি ভূত, সে নিয়ে আমাদের লাভ কি পাঁচকড়ি। আমরা হচ্ছি স্যাপার মানুষ, ওসব হোমরাচোমরা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কি বাপু!"

খগেন বললে, "তা বলে একটা মানুষ ভালো হলে তাকে ভালো বলব না?"

জয়ন্ত বললে, "এখানে তো মানুষের কথা হচ্ছে না—হচ্ছে অফিসারের কথা। তোমার কি আরও অনেক অফিসার দেখা আছে নাকি?"

অমলের মনে হলো আলোচনার ধারাটা যেন ঘুরে যাচ্ছে! সে অস্থির হয়ে ওঠে—শিবদাস যে ওদের মধ্যে পরম নির্বিকার ভাবে বসে রয়েছে!

খগেন বললে, "আমার এক মামাতো ভাইয়ের মুখে শুনেছি, তাদের কোম্পানির অফিসাররা 'ব্লাডি বাস্টার্ড' ছাড়া কথাই বলে না—"

পাঁচকড়ি বলে উঠল, "আরে বাবা, শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। হাজার হোক মেজর রায় হচ্ছেন একজন বাঙালী, তার শিক্ষাদীক্ষাই আলাদা—"

খগেন বললে, "শুধু তাই নয়, তার ওপর বিরাট জমিদার, একটা বনেদী বংশের ছেলে। বিলেতেই নাকি ছিলেন বারো বছর।"

অনন্ত বললে,"তোমরা যা যা বললে, তা না-ও হতে পারে। জানই তো, অফিসারদের একদল মোসাহেব থাকে, তাঁদের গুণকীর্তন করার জন্যে।"

খগেন রুখে উঠল, "মোসাহেবের গুণকীর্তন মানে! এ কথা তো সত্যি, তাঁর মতো দিলদরিয়া মেজাজের লোক কোম্পানিতে আর একটিও নেই, বিপদে-আপদে তাঁর কাছে গেলে কখনো খালি হাতে ফিরতে হয় না।"

জয়ন্ত হঠাৎ ফেটে পড়ল, "তোমাদের মনটা সত্যিই কুকুরের মতন। মেজর সাহেব মোলায়েম সুরে দুটো কথা বলেছে, আর তোমরাও কুত্তার মতন তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে ল্যাজ নাড়তে শুরু করেছ। আশ্চর্য! রসিদের কোয়ার্টার গার্ডের কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে?"

অমল আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে। কই, শিবদাস কই! শিবদাস উঠে চুপি চুপি যেন কোথায় যাচ্ছে। জমাদার সাহেবের কাছে রিপোর্ট করতে!

খগেন জের টেনে চলেছে, "আমার মনে হয়, মেজর সাহেব সমস্ত খবর ঠিকভাবে পান না। সেই জন্যেই তো বললেন, তাঁকে সমস্ত জানাতে। দেখ না, এইবার সব মিয়াঁ ঠাণ্ডা।"

জয়ন্ত বললে, "আর একটু সজাগ হতে শেখ খগেন। একদল লোক আছে, যারা চোরকে বলে চুরি করতে, আবার গেরস্তকে বলে সজাগ থাকতে। মেজর সাহেবের চালটা হচ্ছে ঠিক ওই জাতের।"

অমলের চোখ রয়েছে শিবদাসের ওপর। কয়েকটা তাঁবু পর্যন্ত শিবদাস পা টিপে টিপে গিয়ে, তারপর দৌড়তে শুরু করেছে। এদের তো কোন খেয়ালই নেই—নিজেদের কথায় সব মশগুল। কিন্তু শিবদাস তো এতক্ষণে জমাদার সাহেবের কাছে পৌঁছে গেছে। তাহলে উপায়! জয়ন্তকে সমস্ত কথা বলে ওখান থেকে সরে পড়তে বলবে—তাতেই বা কি লাভ হবে? শিবদাস তো সবই নিজের কানে শুনে গেছে। আর শিবদাস যা বলবে, তার ওপর তো আর যাচাই চলবে না!

দলটার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর মধ্যে গিয়ে আর লাভ কি! জয়ন্তকে তো আর সে বাঁচাতে পারবে না—মাঝখান থেকে সে নিজেও হয় তো জড়িয়ে পড়বে। মনে পড়ল ট্রেনিং ক্যাম্পের কথা। ওঃ, সেদিন সে ভুল না করলে, আজ তার সেকেণ্ড গ্রেড মারে কে! আজ তার মাইনে হতো একশ টাকা।

তখনও ওদের মধ্যে সেই কথারই জের চলেছে। পাঁচকড়ি বলছে, "মদ খেলেই মানুষ বদ হয়ে যায় না—"

অমল পেছিয়ে যাচ্ছে। আপন মনেই সে বলে ওঠে, "না, ওসব ঝামেলার মধ্যে গিয়ে কাজ নেই"—আরও কয়েক পা পেছিয়ে গিয়ে মুখ ঘোরাতেই সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। একেবারে মেজর সাহেব স্বয়ং। ব্যাপারটা কি এতই গুরুতর! মেজর সাহেব এত জোরে হেঁটে আসছেন যে বেঁটে জমাদার দাশগুপ্ত মাঝে মাঝে দৌড়েও তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। দলটার সামনে এসে মেজর সাহেব দাঁড়িয়ে পড়লেন। জমাদার সাহেব জয়ন্তকে দেখিয়ে দিলেন। মেজর সাহেব একেবারে জয়ন্তর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বিস্ময়বিমূঢ় দলটার বিস্ফারিত চোখের ওপর তিনি জয়ন্তকে সার্টের কলার ধরে এক হেঁচকায় টেনে তুললেন। বিবর্ণমুখে জয়ন্ত মেজর সাহেবের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে। দূরে দাঁড়িয়ে অমল অনুভব করতে পারছে, পা দুটো তার ঠকঠক করে কাঁপছে।

জয়ন্তর কলারটা ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে মেজর সাহেব বললেন, "কি হে জাপানী স্পাই—জাপানের কাছ থেকে কত মাইনে পাচ্ছ?"

জয়ন্ত নীরব—বাকী ছেলেরা পেছন দিকে হেলে পড়েছে।

মেজর সাহেব বললেন, "ফিফথ কলামনিস্টদের জন্যে কি ব্যবস্থা জানো?"

চোখ তুলে জয়ন্ত মেজর সাহেবের লাল লাল চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেই উদ্যত মুখের ওপর মেজর সাহেব একটি ঘুঁষি বেশ জমিয়েই দিলেন। জয়ন্তর মুখের কষ বেয়ে খানিকটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকের ওপর।

বাকী ছেলেদের দিকে চোখ রাঙিয়ে মেজর সাহেব বললেন, "আমার কোম্পানিতে কোন জাপানী চর আমি বরদাস্ত করব না"—জয়ন্তর সার্টের কলারটা তিনি ছেড়ে দিলেন। তার শরীরটা টলতে-টলতে ঘাড়-মাথা গুঁজে মাটির ওপর ধপ ক'রে পড়ে গেল। মেজর সাহেব হাঁকলেন, "দাশগুপ্ত—"

"ইয়েস স্যার—"

"ফার্স্ট এইড দেওয়ার ব্যবস্থা কর।"

চার

অমলের ঘুম ভেঙে গেল দাদার গলাফাটা চিৎকারে—ধড়মড় ক'রে বিছানার ওপর উঠে বসে সে চোখ রগড়ে চাইলে দাদার খাটিয়ার দিকে। দাদা গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলছেন, "কি ? মনে করেছ কি তোমরা ? আমাদের কি কয়েদী পেয়েছ নাকি ?"

ল্যান্স-নায়েক দত্ত বললে, "কি করব দাদা, ওপরওয়ালার হুকুম !"

দাদা আরও জোরে চিৎকার ক'রে উঠলেন, "ওপরওয়ালার হুকুম ! এই তো রাত বারোটার সময় বিছানা থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে মাঠে দাঁড় করালে। কি ? না রোলকল ! বেশ বাবা তাই। আবার এসেছ এই মাঝ রাত্তিরে !"

ল্যান্স-নায়েক দত্ত বললে, "বুঝলেন না দাদা, যেমন হুকুম তেমন কাজ—চারঘণ্টা অন্তর অন্তর রোল কল করতে হবে। আমি কি আর সাধ ক'রে আপনার ঘুম ভাঙাতে এসেছি।"

দাদা খেঁকিয়ে উঠলেন, "বলে দাওগে তোমার হুকুমওয়ালাদের, ওসব হুকুম চলবে না আমাদের ওপর। যারা পালিয়েছে, তাদের ধরে আনবার মুরোদ নেই—যত জুলুম আমাদের ওপর। কেন রে বাবা !"

ল্যান্স-নায়েক দত্ত বললে, "কিন্তু না গেলে যে জুলুম আরও বাড়বে দাদা—জানেন তো সবই।"

"আমি যাব না—সাফ কথা বলে দিচ্ছি, কিছুতেই যাব না। তোমরা আমায় ফাঁসি দাও, গুলি ক'রে মেরে ফেল, সেও ভি আচ্ছা—আমি যাব না, কখ্‌খনো না—"

হঠাৎ টর্চের আলোয় তাঁবুসুদ্ধ লোক চমকে উঠল। দাদা ছাড়া আর সকলেই তৈরি হয়ে নিয়েছে। সকলের মুখের ওপর ঘুরে ঘুরে টর্চের আলোটা থেমে গেল ল্যান্স-নায়েক দত্তর মুখের ওপর।

"আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম"—তাঁবুর ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে জমাদার দাশগুপ্ত বললেন. "ল্যান্স-নায়েক দত্ত ছাড়া এমন প্রেমের ঠাকুরটি আর কে ! দেখ দত্ত, এটা দাদা-ভাই করবার মতো জায়গা নয়। মিলিটারীতে কেউ কারও দাদাও নয়, ভাইও নয়। তুমি এন. সি. ও.। তুমি হুকুম করবে—আর ওরা স্যাপার, ওরা হুকুম তামিল করবে। যদি ওই হাতের ফিতেটা বজায় রাখতে চাও, তাহলে প্রেম না বিলিয়ে বুটের ঠক্কর দিয়ে কাজ আদায় করতে শেখ, বুঝলে ?"

ল্যান্স-নায়েক দত্ত মাথা নীচু করলে। সুরেশ আর নবীন ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। অমলের মনে পড়ছে, গত রাত্রে জয়ন্তর অবস্থার কথা, আর ভাবছে, দাদা কি এখনও নেশার ঝোঁকে আছে!

জমাদার সাহেব বললেন, "কে ওটা চেঁচাচ্ছিল, মাতাল বাঁড়ুজ্যেটা না?

ল্যান্স-নায়েক দত্ত বললে, "হ্যাঁ স্যার—"

জমাদার সাহেব বললেন, "এই দেখ, এইসব কুকুরদের কেমন করে শায়েস্তা করতে হয়—"সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে দাদার খাটিয়ার সামনে গিয়ে, মশারিটা তাল-গোল পাকিয়ে, টেনে হিঁচড়ে খুলে ফেললেন। দাদার চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে মাটিতে নামালেন। গোটা কয়েক ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, "তোমার মতো কুকুরকে ফাঁসিও দিতে হয় না আর গুলিও করতে হয় না—কেবল একটা লাথিই যথেষ্ট"—সঙ্গে সঙ্গে দাদার পাছায় বুটসুদ্ধ এক লাথি মেরে বললেন, "যাও—সোজা রোলকলে, না হয় কোয়ার্টার গার্ডে—"

দাদা হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে অমলকে সামনে পেয়ে জড়িয়ে ধরলেন। অমল দাদাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কোমরটা শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরল। দাদা মাতাল, লম্পট, সবই অমলের মনে পড়ে—তবুও সে দাদাকে গভীর আবেগে নিজের দেহের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে। বারবার তার মনে হয়, দাদাতে আর তাতে তো কোন প্রভেদ নেই—তারা দুজনেই সাধারণ সৈনিক!

সুবাদার সাহেব রোলকল নিচ্ছেন। অন্ধকার আকাশের তলায় মাঠের ওপর পাঁচশ লোকের বিরক্তির গুঞ্জন বাতাসে ভাসছে। সুবেদার সাহেব হাঁকলেন, "রোলকল, এ্যাটেন—শান—" সমস্ত গুঞ্জন মুহূর্তে থেমে গেল। সেকশন হাবিলদাররা হ্যারিকেন ল্যাণ্টার্ন নিয়ে নমিন্যাল রোল দেখে নাম ডেকে চলেছে—ছেলেরা হাজিরা হেঁকে চলেছে।

নামডাকা শেষ হলে সুবেদার সাহেব বললেন, "আমি জানি, তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে—কিন্তু আমি কি করতে পারি বলো! তোমরাই তোমাদের কষ্ট ডেকে এনেছ। তোমাদের মধ্যে থেকে কয়েকটা শয়তান পালিয়ে গিয়ে তোমাদের ওপর এই তকলিফ চাপিয়ে দিয়ে গেছে। এখন থেকে তোমাদেরই নজর রাখতে হবে, কে পালাবার মতলব করছে। যাকেই সন্দেহ হবে, সোজা তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসবে।"

রোলকল ডিসমিস হলে খগেন অমলকে বললে, "চলুন, আপনার সঙ্গে একটু গল্প করা যাক। আর তো শোয়া চলবে না—ভোর তো হয়ে এল।"

অমল সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। গল্প করা মানেই একটা বিপদ ডেকে আনা!

তাঁবুতে ঢুকে অমল মশারিটা খুলে ফেললে। খাটিয়ার ওপর বসে মাথাটা দু'হাঁটুর মধ্যে চেপে ধরলে—মাথার মধ্যে তার এখনও দপদপ করছে!

খগেন একটা বিড়ি ধরিয়ে বললে, জানেন অমলবাবু, কাল আমার চোখ ফুটেছে। এইবার আমি বুঝতে পেরেছি—"

কথা শেষ করতে না দিয়েই অমল খগেনের হাতটা চেপে ধরে বললে, "থাক খগেনবাবু, আর ওসব কথায় কাজ নেই—"

খগেন বললে, "ঠিক বলেছেন অমলবাবু, আপনি ঠিকই বলেছেন—"চোখ দুটো তার স্থির হয়ে গেছে, মাথাটা ঈষৎ দুলছে, অমলের মুখের পানে শূন্য দৃষ্টি মেলে ধরে তখনো বলছে, "তাই ঠিক—" হঠাৎ যেন সে চমক ভেঙে বলে উঠল, "তবে কি আমরা বোবা হয়ে যাব!"

"হলে বোধ হয় একজন আদর্শ সৈনিক হতে পারতাম।"

হঠাৎ ফোঁপানির শব্দ শুনে ওরা চমকে ওঠে। দাদা কাঁদছেন!

অমল আর খগেন দাদার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। দাদা শুয়ে আছেন উপুড় হয়ে, বালিশের মধ্যে মাথা গুঁজে। চাপা কান্নায় সমস্ত শরীরটা তাঁর থেকে থেকে ঝাঁকানি দিয়ে উঠছে। দাদা কাঁদছেন! প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরের এক প্রৌঢ়, ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। যে পুরুষমানুষ বালকত্বের সীমানা পার হয়েই কান্নাকে মেয়েলিপনা বলে ভ্রুকুটি করে, সেই কঠিন পুরুষ আজ কান্নায় ফেটে পড়েছে!

খগেন দাদার গায়ে হাত রেখে বললে, "ছিঃ দাদা, কাঁদবেন না—"

দাদা একেবারে ফেটে পড়লেন, "আমার যদি ছেলে থাকত, সে-ও আজ ওই জমাদারের মতোই বড় হতো। যে আমার ছেলের মতন, সেই কিনা আমায় লাথি মারলে! এ কোথায় আমরা এসেছি—এখানে মানুষ বলে কি কিছুই নেই?"

অমল ধীরে ধীরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। সে অনুভব করতে পারছে, রক্ত তার গরম হয়ে উঠছে। সাংঘাতিক একটা প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্যে হাত দুটো মুঠি বেঁধে উঠেছে, দাঁতের ওপর দাঁত বসছে চেপে।

বাইরে আকাশের তলায় এসে অমল ধীরে অতি ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। পুবের আকাশ থেকে আলোর জোয়ার পশ্চিমের দিকে গড়িয়ে চলেছে। হাল্কা বাতাস ঝিরঝির ক'রে বইছে। অমল তার দুটি হাত মাথার ওপর রাখল—ধীরে ধীরে চুলগুলো মুঠো ক'রে চেপে ধরল।

সকাল সাতটা থেকে ফেটিগ।

স্টোরের মধ্যে রাজ্যের লোহালক্কড় বোঝাই; সেগুলোকে প্যাকিং বক্সে বোঝাই ক'রে ওয়াগনে তুলতে হবে। সমস্ত তাঁবু খুলে, পাকিয়ে, বেঁধে—সমস্ত কোম্পানিটাকে গুটিয়ে নিয়ে রেলে চালান দেওয়া—এই হলো মুভের ফেটিগ। এইসব কাজের জন্যে দশজন করে লোক আর একজন ক'রে এন. সি. ও. নিয়ে এক-একটা স্কোয়াড।

জন ছয়েক ছেলে আড়াইমণী একটা র‍্যাম্প দড়িতে বেঁধে, বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে—তাদের পেছন পেছন চলেছে ছড়ি-হাতে এন. সি. ও। বেচারীদের কাঁধ যখন জ্বালা করতে শুরু করেছে, তখন তারা বোঝাটাকে মাটিতে নামিয়েছে একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে। পেছন থেকে ছড়ি-হাতে এন. সি. ও টিটকিরি দিয়ে উঠল, "ব্যস এতনাহি! দো কদম যাকেই খতম। সরকার ক্যা ফালতু তুমলোগোঁকো খিলাতা পিলাতা!"

এ সব মন্তব্য গা-সহা হয়ে গেছে। কিন্তু মন যাদের এখনো নরম, তারা চট ক'রে গরম হয়ে ওঠে। রাগের মাথায় উত্তর দিয়ে বসে, "কুলিকা কাম করনেকে লিয়ে সরকার মুঝকো শ'রুপেয়া তলব নহি দেতা।"

এন. সি. ও. ক্ষেপে ওঠে, "ক্যা মুহ পর বাত! করো ডবল—"

মিনিট দশেক ডবল মার্চ করার পর সেকেণ্ড গ্রেড স্যাপার গার্ডের যখন জিভ বেরিয়ে আসে, তখন সে বুঝতে পারে, মিলিটারী ডিসিপ্লিনের প্রাথমিক শিক্ষা. 'আঁখ্ খুলো, কান খুলো, মুহ্ মত্ খুলো' নিছক কথার কথা নয়! এরই উপর ভিত্তি ক'রে মিলিটারী ডিসিপ্লিনের বনিয়াদ মজবুত রাখা হয়েছে।

সেকেণ্ড গ্রেড গার্ড যখন হাঁপাতে হাঁপাতে আবার বাঁশটি কাঁধে তুলে নেয়, তখন একত্রিশ টাকা মাইনের পয়েন্টসম্যান এন. সি. ও. খুশিতে ফেটে পড়ে। রেলের আইন অনুযায়ী গার্ডের সে অধস্তন। কিন্তু যখন তারা সৈনিক, তখন তফাৎ কেবল র‍্যাংকের। মাইনের দিন সে পায় তিনখানা নোট, আর তার চোখের ওপর দিয়ে স্যাপার গার্ড দশখানা নোট গুণতে গুণতে চলে যায়। পদমর্যাদার উচ্চতা আর অর্থনৈতিক দীনতা, এই দুয়ে মিলে পয়েন্টসম্যান এন. সি. ও-কে ক'রে তোলে একটি হিংস্র জীব। মেজর রায় এই বৈষম্যের কথা ভালোভাবেই জানেন।

সমস্ত দিন ধরে চলে ফেটিগ। স্যাপারের দল বোঝা বয়েছে, তাঁবু খুলেছে, ওয়াগন বোঝাই করেছে—ধুলোয় আর ঘামে মিশে গিয়ে চেহারাগুলো তাদের

কদাকার হয়ে উঠেছে। এন. সি. ওরা যথাসম্ভব ধুলো এড়িয়ে, প্যান্টের ক্রীজ বাঁচিয়ে, সন্তর্পণে ঘুরে ফিরে লোক খাটিয়েছে। কাজ শেষ হওয়ার পর বাহবা পেয়েছে তারাই—পদোন্নতির প্রতিশ্রুতিও পেয়েছে জনকয়েক।

অফিসারদের এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হয় নি। তাঁরা অফিসার্স মেসে বসে 'কোলকাতায় শেষ দিন' যাপন করেছেন। মেজর রায়ের মেম-মার্কা বাঙালী স্ত্রী এসেছেন, অন্যান্য অফিসাররাও সঙ্গিনী ভাড়া ক'রে এনেছেন। গ্রামোফোনে দম দিচ্ছে আর রেকর্ড চাপাচ্ছে মেস-হাবিলদার চক্রবর্তী। মদের গ্লাসের ঠুনঠুন শব্দে, কাঁটা চামচের খুটখাট আওয়াজে আর সশব্দ চুম্বনের মাত্রাধিক্যে অফিসার্স মেস সরগরম। যে ছেলেদের ওপর অফিসার্স মেসের তাঁবু খুলে প্যাক করার ভার পড়েছে, তারা বুভুক্ষু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অফিসারদের নির্লজ্জ কামোন্মত্ততার পানে।

বেলা তিনটের সময় ফেটিগ শেষ হলো। বেলা চারটার সময় আবার রোলকল। রোলকলের শেষে সুবেদার সাহেব ভারী গলায় বললেন, "আমাদের মিলিটারী জীবন সার্থক হতে চলেছে—আমরা চলেছি লড়াইয়ের মাঠে। আমি চাই, প্রত্যেকটি ছেলে ডিসিপ্লিন মেনে চলবে আর মনের ফুর্তিতে থাকবে।"

রোলকল ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে মৌচাকে ঢিল মারার মতো গুঞ্জন ধীরে ধীরে কলরবে পরিণত হলো। খগেন অমলের মুখের সামনে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ফুর্তিতে থাকতে হবে—এটাও কি হুকুম নাকি?"

অমল খগেনের উত্তেজিত মুখখানার দিকে চেয়ে বললে, "হয়তো তাই। মন খারাপ হলে হয়তো কোয়ার্টার গার্ডও হতে পারে।"

খগেন ক্ষিপ্তের মতো ফেটে পড়ল, "ফুর্তিও কি এদের ব্যাপার নাকি?"

অমল খগেনের কাঁধে একটা হাত রেখে বললে, "আঃ খগেনবাবু, কি ছেলেমানষি করছেন!"

পলকের মধ্যে খগেন শান্ত হয়ে গেল, সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে আশপাশ দেখে নিয়ে নিজেকে সামলে নিলে। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অমলের দিকে চেয়ে, সারা মাঠটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে। সমস্ত মাঠটা ফাঁকা—কেবল জায়গায় জায়গায় ছেলেরা বিস্তারা-বোটি নিয়ে গোল হয়ে বসে জটলা করছে। তারা এই মাঠ ছেড়ে গেলে, তাদের কোন চিহ্নও থাকবে না। সমস্ত মাঠ থেকে প্রতিটি জঞ্জাল কুড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

রোলকল ভাঙার দশ মিনিটের মধ্যে আবার হুইসিল পড়ল—তখনও পাঁচটা বাজতে সাত মিনিট বাকী। ছেলেরা কোনরকমে ওয়েব-ইকুইপমেণ্ট দুহাতের

মধ্যে গলিয়ে, বেল্ট এঁটে বিছানা টানতে টানতে ফল্‌ইন হতে চলল। পাঁচকড়ি আর কিছুতেই ওয়েব-ইকুইপমেণ্টটা বাগে আনতে পারছিল না। একটি ছেলেকে বললে, “দাও তো ভাই লাগামটা চড়িয়ে—”

পরিয়ে দিতে দিতে ছেলেটি বললে, “তা যা বলেছেন—ঘোড়ার মতোই তো সারাদিন আমাদের দুঠ্যাঙে দাঁড় করিয়ে রেখেছে—”

ধড়াচুড়া প'রে ছেলের দল বিছানা কাঁধে গজগজ করতে করতে ফল্‌ইন করছে। লাইনেব মধ্যে থেকে কে যেন চিৎকার ক'রে উঠল, “শালারা কি আমাদের ঘোড়া পেয়েছে নাকি ?”

কলরব যেন আর থামতে চায় না। সারাদিনের চাপা রাগ যেন তখনই বেরিয়ে পড়তে চায়। ছেলেরা যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে—তারা যে এরকম ব্যবস্থা পছন্দ করছে না, সেটা তখনই জানিয়ে দিতে চায়। একজন চেঁচিয়ে উঠল, “আমরা মানুষ, না কি ?”

কে একজন পাশ থেকে বলে উঠল, “মানুষ হলে কি আর সারাদিন ঘোড়ার মতো দাঁড় করিয়ে রাখে ? মানুষ ছিলে মিলিটারীতে ঢোকার আগে—”

সেকশন কমাণ্ডাররা হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছে, ডবল আপ-এর ভয় দেখাচ্ছে—তবুও তারা থামতে চায়না। সুবেদার সাহেব দৌড়ে এসে চিৎকার ক'রে উঠলেন, “ক্যা, হুয়া ক্যা ? কাম অন, পুরা কোম্পানি ডবল আপ—করো ডবল—”

ছেলেরা ভেবেছিল, এটা বোধ হয় নিছক ভৎ'সনা—তাই তারা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। সুবেদার সাহেব তেড়ে গিয়ে লাইনের সামনের ছেলেটির হাঁটুতে স্টাফ দিয়ে সজোরে এক ঘা বসিয়ে দিলেন। ছেলেটি আর্তনাদ ক'রে মাটিতে পড়ে গেল। বাকী ছেলেরা দৌড়তে শুরু করল। খানিকটা দৌড়ের পর সকলে যখন আবার যথাস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন জমাদার সাহেব ধবধবে সাদা দাঁতগুলো বার ক'রে বললেন, “এই হচ্ছে তোমাদের ঠিক দাওয়াই—কথায় বলে না, যেমন কুকুর—তেমন মুগুর।”

সমস্ত কোম্পানিটা দাঁড়িয়েছে পাঁচভাগে ভাগ হয়ে।

প্রথম ভাগে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের দল। মিলিটারীতে ঢুকে এরা হয়েছে বি. ও. আর. অর্থাৎ ব্রিটিশ আদার র‍্যাংকস ! আইনগত ভাবে ভারতীয়দের সঙ্গে এদের কোন দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। তবুও এদের 'ব্রিটিশ' আখ্যা দেওয়ায়, এরাও ভারতীয়দের 'বাস্টার্ড ইণ্ডিয়ান' বলে থাকে। এদের বেলায় র‍্যাংকের প্রশ্ন ওঠে না—বি. ও. আর. মানেই উচ্চতর শ্রেণী। ফেটিগ এদের

খাটতে হয় না—বাইরে থেকে কুলি এনে এরা এদের মোট বওয়ায়। সুবেদার, জমাদার ভারতীয় হওয়ায়, এদের ওপর তাঁদের হুকুম খাটে না।

দ্বিতীয় ভাগে হেড কোয়ার্টার স্টাফ, অর্থাৎ অফিস স্টোরের কেরানী থেকে অর্ডারলি পর্যন্ত। কোম্পানির সাধারণ ছেলেরা এদের পদবীর সঙ্গে একটা 'সাহেব' যোগ ক'রে ডেকে থাকে। অফিসারদের সঙ্গে কাজ করতে করতে এরা অফিসারী চালচলন নকল করতে শিখেছে—গালিগালাজ হজম করতে করতে সেগুলো প্রয়োগও করতে শিখেছে। অফিসের কাজে উঠতে বসতে যদিও এরা অফিসারদের কাছে কেবল ঠোক্করই খেয়ে থাকে, তবুও সাধারণ ছেলেদের কাছে অফিসারদের সুবিচার, সুযুক্তি আর সুমতির উপাখ্যানই আওড়ে চলে। মাইনে বেচারীদের বড়ই কম, তাই কর্তারা হাবিলদার র‍্যাঙ্ক দিয়ে এদের মনের ক্ষোভ পুষিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয় ভাগে ট্রাফিক স্টাফ। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই শিক্ষিত, যেহেতু এদের মধ্যে রয়েছে গার্ড, স্টেশন মাস্টার, সিগন্যালার, টালি ক্লার্ক ইত্যাদি। সেই জন্যেই এরা আলাদা একটা স্তর আদায় করবার আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে বারম্বার আঘাত খেয়ে অন্য সকলের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে। মাইনে এদের বেশী, তার ওপর আবার লেখাপড়া জানা—কাজেই মেজর সাহেব থেকে লঙ্গর-কমাণ্ডার, সকলেরই রোখ এদের ওপর বেশী।

চতুর্থ ভাগে লোকো স্টাফ। এরা সাধারণত মেহনতকারী মানুষ—শিক্ষার দৌড় এদের কাছে খুবই কম। ড্রাইভার, ফায়ারম্যান থেকে আনস্কিলড স্যাপার পর্যন্ত এই দলভুক্ত। এরা গতরে খাটে, আগুন তাতে পোড়ে, তাই বিশ্রামের সময় একটু আধটু নেশা ভাঙ ক'রে শরীর ঝালিয়ে নেয়।

পঞ্চম ভাগে ফলোয়াররা। রসুই, জলবাহক, মুচি, মেথর, ধোপা, নাপিত ইত্যাদি। এরা সাধারণত স্ব স্ব জাতব্যবসাতেই বহাল আছে বলে যথাসম্ভব নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে।

অফিসার মোট পাঁচজন। তাঁদের প্রত্যেকেরই এক-একটা বিশেষ কাজ আছে। মেজর রায় হলেন অফিসার কমাণ্ডিং। ক্যাপটেন সাহেব সেকেণ্ড-ইন্-কমাণ্ড। তিনজন লেফটেনাণ্টের মধ্যে একজন এ্যাডজুটাণ্ট, একজন ট্রাফিক-ইন-চার্জ আর একজন লোকো-ইন-চার্জ। অফিসারেরা সকলেই এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে হাসিখুশি মুখে গল্পগুজব করছেন।

হাবিলদার মেজর এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে স্টাফটা বাঁ-বগলে চেপে ধরে হাঁকলেন, "কো-ম্পা-নি, এ্যাটেন—শান—" নিশ্চুপ নিশ্চল পাঁচশ' মানুষের

পাগুলো একটিমাত্র আওয়াজ ক'রে গোড়ালিতে গোড়ালিতে জুড়ে গেল। হাবিলদার মেজর একটা কাষ্ঠমূর্তির মতো অনড় অটল থেকে কেবলমাত্র চোখটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পর্যবেক্ষণ ক'রে হঠাৎ ধমকের সুরে হেঁকে উঠলেন, সামনে দেখ্—মত্ হিল্।" আরও কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় অপেক্ষা করে ডান হাতে স্টাফটা নিয়ে, এ্যাবাউট টার্ন ক'রে চলতে শুরু করলেন। জমাদার সাহেবের সামনে গিয়ে ডান পা ঠুকে হল্ট ক'রে, বাঁ-বগলে স্টাফটা ধরে সেলাম করলেন। জমাদার সাহেবও এ্যাটেনশান হয়ে বাঁ বগলে স্টাফটা নিয়ে সেলাম ক'রে প্রত্যাভিবাদন জানালেন। হাবিলদার মেজর রিপোর্ট দিলেন, জমাদার সাহেব শুনলেন—তারপর হালিদার মেজর আবার সেলাম ক'রে, ডান হাতে স্টাফ নিয়ে, লম্বা হাত দুলিয়ে স্বস্থানে ফিরে এসে এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়ালেন।

পাঁচশ' ছেলে আড়ষ্ট হয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে—পাছা শক্ত ক'রে, বুক চিতিয়ে, দুশো গজ দূরে চোখ রেখে, দেহের দুপাশে হাত দুটোকে চেপে ধ'রে। গোড়ালি থেকে মাথার তালু পর্যন্ত টন্টন্ করছে।

জমাদার সাহেব হাঁক্লেন, "কোম্পানি, স্ট্যাণ্ড-এ্যাট্-ইজ্—"

সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ করে ডান পায়ের গোড়ালিটা একফুট ফাঁক হয়ে গেল, হাত দুটো চলে গেল পেছনে। একটু অপেক্ষা করে জমাদার সাহেব আবার হাঁকলেন, "কোম্পানি, এ্যাটেন্-শান—"

তারপর জমাদার সাহেব সেই একই যান্ত্রিক রীতিতে রিপোর্টিং করলেন সুবেদার সাহেবের কাছে। সুবেদার সাহেব রিপোর্ট দিলেন এ্যাডজুটাণ্টের কাছে—এ্যাডজুটাণ্ট সেকেণ্ড-ইন্-কমাণ্ডের কাছে, আর সেকেণ্ড-ইন্-কমাণ্ড অফিসার কমাণ্ডিঙের কাছে। একই ছকে-ঢালা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রত্যেকে করে চললেন একের পর এক। পাঁচশ' ছেলের সমস্ত শরীর দিয়ে অঝোরে ঘাম ঝরছে, সমস্ত শরীর টনটন করছে, মাথা ঝিমঝিম করছে।

মেজর সাহেব হাঁকলেন, "বি· ও'জ—ফল্ইন—"

ট্রাফিক আর লোকো অফিসার আপন আপন সেক্শনের সামনে, সুবেদার সাহেবকে পেছনে রেখে দুদিকে দুজন দাঁড়ালেন।

মেজর সাহেব হাঁকলেন, "কোম্পানি, স্ট্যাণ্ড-এ্যাট্-ইজ—"

তারপর তিনি সৈনিকদের উদ্দেশে বললেন, "সৈনিকের জীবন, একটা আদর্শ মানুষের জীবন। সে তার দেশের মঙ্গলের জন্যে, দুর্বলকে রক্ষা করার জন্যে, অত্যাচারীকে দমন করার জন্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে। সে নিজের কথা ভাবে না। সে ভাবে মাত্র দুটি কথা, শত্রুকে তার হঠাতেই হবে আর দেশে

শান্তি ফিরিয়ে আনতেই হবে। আর কষ্ট! সৈনিকের জীবনে কষ্ট বলে কিছু নেই। যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছে, যে মৃত্যুর মুখে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে গেছে—তার কাছে কষ্ট বলে কিছু থাকতে পারে না।"

অমলের মাথা ঝিমঝিম করছে, সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। মেজর সাহেবের কথাগুলো যেন তার কানের বাইরে ভনভন করছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে খগেন আপন মনে বিড়বিড় করছে, "এরা মানুষ, না কি! সারাদিন ধরে গাধার খাটুনি খাটিয়ে এখন চলাচ্ছে পাঁয়তারা! একবার কি এদের মনেও হয় না, আমরা মানুষ—আমরা যন্ত্র নই। ওঃ, মা—"

অমল শুনতে পেলে তার পাশেই ঝপ ক'রে একটা শব্দ। অতি সাবধানে ধীরে ধীরে মাথাটা ঘুরিয়ে আড়চোখে দেখে, খগেন ঘাড়-মাথা গুঁজে মাটিতে পড়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি বসে পড়ে সে খগেনের মাথাটা তুলে ধরতে যায়—

মেজর সাহেব হাঁক পাড়লেন, "ইউ ব্লাডি ফুল—ডোণ্ট মুভ—"

অমল তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়াল। অন্য ছেলেরা একটু-আধটু ঘাড় বেঁকিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। মেজর সাহেব আবার তাড়া দিয়ে ওঠেন, "স্ট্যাণ্ড স্টিল।" ছেলেরা আবার আড়ষ্ট হয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়। অব্যক্ত একটা অভিসম্পাত যেন তাদের বুকের মধ্যে গর্জে ওঠে।

মেজর সাহেব হাঁকলেন, "কোম্পানি উইল মুভ ইন কলাম অফ রুট—বি· ও· আরস লিডিং—কোম্পানি, রাইট—টার্ন—"

সমস্ত কোম্পানিটা ডাইনে ঘুরে দাঁড়াল। অফিসাররা মার্চ ক'রে গিয়ে নিজেদের সেকশনের সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক হেঁকে চললেন, "বাই দি রাইট, কুইক—মার্চ—"

ঝপঝপ ক,রে একই তালে পা ফেলে এগিয়ে চলে পাঁচশ' ছেলে। এতক্ষণের অনড় স্তব্ধতা গলে গলে চুঁইয়ে পড়ে—ধারা হয়ে বয়ে চলে ঝপ ঝপ শব্দের স্রোতে। জ্ঞানহারা খগেনের বুকের ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে যাওয়ার সময়, বারেক তার দিকে ফিরে চায়। যান্ত্রিক গতির তাল পলকের তরে কেটে যায়—তবুও উপায় নেই, তাদেরই একজনের জন্যে ক্ষণিক বিরতির! দানবীয় এক শক্তির তাড়নায় তারা এগিয়ে চলে, কাটা-তালকে মিলিয়ে নিয়ে, একই তালে পা ফেলে, ঝপ-ঝপ-ঝপ—

ক্যাম্প থেকে স্টেশন, কোম্পানি মার্চ ক'রে চলেছে।

অমলের মনে পড়ে সিনেমায় দেখা একটা দৃশ্য! —সোভিয়েট রাশিয়ার

লাল ফৌজ মার্চ ক'রে চলেছে শহরের সদর রাস্তা দিয়ে। রাস্তার দুধারে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভিড় করে ভেঙে পড়েছে। হাজারে হাজারে রুমাল পতপত ক'রে উড়ছে। তরুণীরা ফুলের গুচ্ছ গুঁজে দিচ্ছে সৈনিকদের বুকে, কতরকমের খাবার এনে দিচ্ছে মায়ের দল, পুরুষেরা করমর্দন ক'রে জানাচ্ছে অভিনন্দন। বাড়ীগুলোর ছাদ বা বারান্দা থেকে অঝোরে ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে সৈনিকদের মাথার ওপর।

অমল ভাবে, কিন্তু তাদের বেলায় কি দুস্তর প্রভেদ! তারাও তো মার্চ ক'রে চলেছে ফ্রন্ট-লাইনের দিকে! কই, কারও মুখে বেদনার কোন চিহ্ন তো ফুটে ওঠে নি—অভিনন্দন জানানোর কথা বোধ হয় কেউ কল্পনাও করে নি। আশ-পাশের বাড়ীগুলোর বারান্দায় বা জানলায় একটি মেয়েরও তো মুখ দেখা যাচ্ছে না! লাল ফৌজ যদি রাশিয়ার লোকের প্রাণের-পুতলি হতে পারে, তবে বাঙালী সৈনিক হিসেবে বাঙলা দেশের লোকের কাছে তারা কি?

পাশের ছেলেটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠে, "আমরা কি এদের কেউ নই! আমরা চলেছি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে, সে তো এদেরই বাঁচাতে।"

অমল বললে, "সে ভরসা এরা আমাদের ওপর রাখে না। এরা জানে ব্রিটিশের রাজত্ব বাঁচাতেই আমরা সৈন্যদলে ভর্তি হয়েছি।"

"তা না হয় হলো। কিন্তু জাপান যখন দেশ আক্রমণ করবে, তখন তো আমরাই তাদের রুখব?"

"জাপানকে রুখে আমাদের লাভ?"

"তা বলে জাপানকেও ঘরে ডেকে আনব নাকি?"

সামনে একটা বাঁক এসে পড়েছে। হাবিলদার মেজর দাঁড়িয়ে পড়ে স্টেপিং দিয়ে চলেছেন, "লেফট—রাইট—লেফট—"

স্টেশনের বাইরে সাইডিং-লাইনে কোম্পানির জন্যে স্পেশ্যাল ট্রেন প্লেস হয়েছে। সৈনিক চলাচল নাকি যতদূর সম্ভব লোকচক্ষুর অন্তরালেই সারতে হয়। সিকিউরিটির রীতিতে প্রত্তিটি মানুষই অবিশ্বাসী।

কোম্পানি মার্চ ক'রে এসে ট্রেনটার পাশে হল্ট করল। এইবার গাড়ীতে ওঠার পালা। প্রতি কামরার গায়ে খড়ি দিয়ে লেখা, কোন গাড়ীতে কোন ক্যাটেগরি আর কতজন। অফিসারদের জন্যে ফার্স্ট ক্লাস, বি. ও. আর. এবং ভি. সি. ও'দের জন্যে সেকেণ্ড ক্লাস, হেড কোয়ার্টার স্টাফের জন্যে ইণ্টার ক্লাস আর বাকী সকলের জন্যে থার্ড ক্লাস। ব্রেকভ্যানের সঙ্গে ইণ্টার ক্লাস কামরাটায় হয়েছে কোয়ার্টার গার্ড, তার সামনে খানপাঁচেক ওয়াগন—তার চারখানায় কোম্পানির

যত মালপত্তর আর একটাতে লঙ্গর।

ছেলেরা বোঁচকাবুঁচকি ঘাড়ে ক'রে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। বি. ও. আর-রা রাজার জাত, তারা আগেভাগে গাড়ীতে উঠে বসেছে। মেজর সাহেব তাদের কামরার একটা জানলায় দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছেন। কিন্তু যত বিপদ ভারতীয়দের নিয়ে; তাদের বসবার হুকুম দিলে সিভিলিয়ানদের মনে সৈনিক সম্বন্ধে ভীতি ও শ্রদ্ধা কমে যেতে পারে। সৈনিক ক্লান্ত হয় না, সব অবস্থাতেই তেজি ঘোড়ার মতো ছুটে চলে—এইটাই প্রামাণ্য বিষয়।

হিসেবপত্তর গোনাগিনতি আবার শুরু হলো। অনেক জল্পনাকল্পনার পর গাড়ীতে ওঠার হুকুম হলো। বি. ও. আর-রা পেয়েছে মাথাপিছু একটা ক'রে বার্থ। হেডকোয়ার্টার স্টাফ—বত্রিশজনের কামরায় কুড়িজন। আর স্যাপারদের জন্যে, যত সিটের কামরা, লটবহর সুদ্ধ ততজন ক'রে লোক।

গাড়ীতে ওঠার পালা শেষ হলো। কামরার মধ্যে কোনমতে জায়গা ক'রে নিয়ে পাঁচকড়ি বুট খুলতে শুরু করেছে।

অমল বললে, "বুট খুলে কি আবার এক বিপদে পড়বেন পাঁচকড়িবাবু—হয়তো এখনই আবার রোলকলের হুইসিল পড়বে।"

পাঁচকড়ি থেমে পড়ে বললে, "আর পারছি না মশাই, প্রাণ আমার বেরিয়ে যাচ্ছে। খগেনটা দেখছি অজ্ঞান হয়ে তবু খানিকক্ষণ রেস্ট পেলে, কিন্তু আমরা কি না মরলে আর রেস্ট পাব না?"

খগেন ফিরে এসেছে। সে সুস্থ হয়ে উঠেছে, কিন্তু এখনও বড় কাহিল। পাঁচকড়ি তার বিছানা পেতে দিলে জানলার ধারে, অমলের ঠিক পাশেই। অমল নিজের জায়গাটা কমিয়ে নিয়ে খগেনের বিছানাটা বড় ক'রে দিলে। খগেন শুয়ে পড়ল। অমলের ইচ্ছে হলো, খগেনের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেয়।

ছ'টায় চা দেওয়ার কথা—আটটার সময় খানা—ন'টা পঞ্চান্ন মিনিটে ট্রেন ছাড়বে। অনন্ত মগটা হাতে ক'রে ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়াচ্ছে, দরজায় দাঁড়িয়ে হা-পিত্যেশে প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে, মেজর সাহেবের বোধহয় মতিগতি ফিরেছে রে। তা না হলে কামরায় কামরায় চা দেওয়ার বন্দোবস্ত!"

শিবেন বললে, "ওকি আর আমাদের সুবিধের জন্যে—পাছে কেউ চা নেওয়ার ফাঁকে কেটে পড়ে, সেই ভয়ে।"

ক্যাম্প-কেটলি করে কামরায় কামরায় চা দিয়ে গেল। চায়ের মগে চুমুক দিয়ে আবার যেন সকলে তাজা হয়ে উঠছে। খগেন উঠে বসেছে, অনন্ত তাকে

এক মগ চা এনে দিয়েছে। পাঁচকড়ি জানলা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে আছে। শিবেন সিগারেটের টিন কাটছে। মন্নু হ্যাভার-স্যাক থেকে সযত্নরক্ষিত একখানা শুকনো রুটি বার করেছে—আর সকলে সেইদিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

চায়ের সঙ্গে সিগারেট-বিড়ির ধোঁয়ায় কামরার আবহাওয়াটা ধীরে ধীরে হাল্কা হয়ে উঠেছে। ছেলেরা নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা শুরু করেছে। অমল চুপচাপ কোণে ঠেস দিয়ে বসে আছে। চায়ের মগটা উরুর ওপর রেখে সে ভাবছে। মনটা তার উতলা হয়ে উঠেছে বাড়ীর জন্যে। লুকিয়ে সে বাড়ীতে একখানা পোস্ট কার্ড লিখেছে তার নিরুদ্দশ যাত্রার কথা জানিয়ে। এতক্ষণে বোধহয় সে চিঠি পৌঁছে গেছে! আচ্ছা, ঠাকমা কি করছে? বাবা কি ভাবছেন? মিনি আর রিণিটা কি কাঁদছে?

পাঁচকড়ি হঠাৎ অমলকে প্রশ্ন করলে, "আচ্ছা, আমরা কোথায় যাচ্ছি বলুন তো?"

অমল কাঁধ কুঁচকে অসহায়ের ভঙ্গি করলে। খগেন বলে উঠল, "কোথায় আবার! যমের দক্ষিণ দোরে—" আপন মনেই সে গজগজ করে চলল, "বাড়ীতে লিখে দিলুম, আজ আমরা যাচ্ছি। তা একজনও এসে দেখা করতে পারলেন না! আর কি কোনদিন দেখা হবে—"

পাঁচকড়ি বললে, "এসেই বা তাঁরা করবেন কি—তোমার সঙ্গে কি আর দেখা করতে দেবে?"

হঠাৎ স্বরাজ চিৎকার ক'রে উঠল, "ওরে শিবে, দেখবি তো আয়—চোখ সার্থক হবে মাইরি।"

অনন্ত বললে, "কিরে, কি মাইরি—"

হুড়মুড় ক'রে কামরাসুদ্ধ ছেলে জানলার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অনন্ত বললে, "অভাগা ত্নিয়ায় কি কেবল আমরাই বাবা—"

পাঁচকড়ি বললে, "খাসা মাল মাইরি—"

খগেন বললে, "ডেকে জিজ্ঞেস করব নাকি, কাকে খুঁজছে?"

স্বরাজ বললে, "তাতে আর লাভটা কি! আর যাকেই খুঁজুক আমাদের নিশ্চয়ই নয়—"

শিবেন বললে, "হ্যাঃ, আমরা হচ্ছি গ্যালারির লোক, আমাদের ওই দেখা-টুকুই লাভ। দেখ, হয়তো মেজর সাহেবের ইয়ে—"

পাঁচকড়ি বললে, "দূর এ যে অনেক ছেলেমানুষ, ওই বুড়ো মড়ার সঙ্গে পট খাবে কেন?"

শিবেন বললে, "মেয়েদের আবার পট্‌ খাওয়া! পয়সা থাকলে আশি বছরের বুড়োর গলায়ও লটকে পড়ে—"

পাঁচকড়ি বললে, "কক্ষণো না; তারা লটকে পড়ে না, তাদের লটকিয়ে দেওয়া হয়। এই যেমন আমরা মিলিটারীতে ঢুকেছি—লোকে মনে করে মজা লোটবার জন্যেই আমরা সোলজার হয়েছি! কিন্তু আমাদের জ্বালা আমরাই জানি—"

মেয়ে দুটি ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আবার সকলে যে যার সিটে ফিরে গেল। অনন্ত বললে, "যাক, আমাদের যাত্রাটা বোধহয় শুভ হবে —হয়তো বেঁচেও ফিরতে পারি!"

অমল এসব কথাবার্তায় যোগ দেয় নি—এ জাতীয় আলোচনা তার বিশ্রী লাগে। কিন্তু সে-ও মেয়ে দুটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে নি। তাদের মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ভেবেছে তার অসার্থক জীবনের কথা, তার প্রবঞ্চিত পৌরুষের কথা। তার একুশ বছরের জীবনের মধ্যে সে কোন মেয়ের সংস্পর্শে আসে নি—এমন কি সামান্য একটা চুম্বন, একটু নিবিড় স্পর্শ, দুটো ভালোবাসার কথা, কিছুই তার জীবনে সঞ্চয় নেই, তার জীবনে কিছু নেই—

ট্রেন ছাড়ল ন'টা পঞ্চান্ন মিনিটে। গাড়ীর মধ্যে বসে দুশ্চিন্তায় মাথা ভারী হয়ে উঠেছে—ক্লান্তিতে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ইঞ্জিনের প্রথম হেঁচকায় সকলেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। যারা ব্যাংকের ওপর ছিল, তারাও নেমে এসে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

গড়িয়ে গড়িয়ে ট্রেন এগিয়ে চলেছে। অমল দেখলে, ঠুলি-লাগানো একটা আলোর তলায় সেই মেয়ে দুটি দাঁড়িয়ে। তাদেরই উদ্দেশ ক'রে কে যেন কোথা থেকে বলে উঠল, "চললাম দিদি—" মেয়েদুটিও হাত উঁচু ক'রে রুমাল নাড়াচ্ছে। অমলের মনে হলো, তাদের চোখের কোলে যেন খানিকটা জল চকচক করছে!

খগেন অমলের কাঁধের ওপর হাত রেখে বললে, "তাহলে সত্যিই আমরা চললুম অমলবাবু—আর কোনদিন এখানে ফিরব কিনা কে জানে!" অমল চমকে উঠে খগেনের মুখের দিকে তাকাল; তার মনে হলো, খগেনের গলার স্বরে চাপা-কান্নার গুমরানি থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

একটার পর একটা আলো পেছনে ফেলে ট্রেনটা ধীরে ধীরে গতিশীল হয়ে উঠছে। নানারকম চিৎকারে কলরবে নৈশ-নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেছে—সমস্ত আবহাওয়াটা কেমন যেন ব্যথাতুর হয়ে উঠেছে। বিদায় জ্ঞাপন যে তারা কার কাছে ক'রে চলেছে, তা তারা নিজেরাই জানে না। তারা শুধু জানে এখনও তারা বেঁচে আছে—তাই তারই সাক্ষ্য তারা রেখে যেতে চায় আকাশ-

বাতাস, গাছপালা, যা কিছু তাদের দুচোখের ওপর পড়ছে, তাদেরই কাছে।

গাড়ীর গতি বেড়ে উঠেছে। ছেলেরা জানলা থেকে ধীরে ধীরে মুখ সরিয়ে নিয়েছে—আবার সকলে নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। অমল তখনো নিষ্পলক দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। তার চোখের ওপর দিয়ে দুরন্ত গতিতে পিছিয়ে পড়ছে কোলকাতা শহর, তাদের কলেজ বিল্ডিং, তাদের বাড়ীর গলিটা, তারই মোড়ে বখাটে ছেলেদের আড্ডা, রান্না ঘরের দাওয়ায় ঠাকুমার জপতপ, মিনি-রিণির গৃহকাজ, বাবার হিসাব লেখা, বিমলের ঝুলঝাড়া, কমলের স্ট্যাম্প মারা···

ফুরফুর ক'রে অমলের মাথায় হাওয়া লাগছে—তার শ্রান্ত অবসন্ন শরীরটাকে ঘুমে ঘিরে ধরেছে। চোখ দুটো সে বারেকের তরে বন্ধ করলে—এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার গালের ওপর। চোখ খুলে আবার সে বাইরের দিকে তাকাল—কি একটা ছোট্ট স্টেশনকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে ট্রেনটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে! তার চোখের ওপর ভেসে উঠেছে সমীরণের বিয়ে বাড়ী—সেই বিরাট থ্যান, ফুল-লতাপাতা আর আলোর বাহার! সমীরণের নববধূর সেই অকুণ্ঠিত দৃষ্টি যেন তাকে হাতছানি দিচ্ছে! আচম্বিতে তার মনে হলো, ওই মেয়েটির সঙ্গে তারও তো বিয়ে হতে পারত।

অমলের মুখের মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে। বুকের মধ্যেটা তার মুচড়ে-দুমড়ে কুঁকড়ে গেছে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে আরও কয়েক ফোঁটা জল বেরিয়ে এলো তার চোখ থেকে!

আর যেন অমল নিজেকে সামলাতে পারে না। বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে সে ভেতরের দিকে তাকাল। নিষ্প্রদীপ ট্রেনের মধ্যে চাঁদের আলো এসে টেরচা ভাবে পড়েছে। সব ছেলের শোয়ার জায়গা সংকুলান হয় নি, অনেকে মেঝের ওপর বিছানা পেতে শুয়েছে। অমলও দেহটাকে এলিয়ে দিলে। শোয়ার জায়গা তারও হয় নি, খগেনকে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে। কামরার মধ্যে বোধহয় সে ছাড়া আর সকলেই ঘুমোচ্ছে। নাকডাকায় মিশ্রিত শব্দে কামরাটা মুখর হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ পাশের কামরা থেকে জনকয়েক গেয়ে উঠল—

বুইড়া কালে নূপুর দিছি পায়,
মাগো মা, ঝি গো ঝি,
কই গেলি গো বোন দিদি,
দ্যাখতে আমায় ক্যামন ছাহা যায়—

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছে, বারবার গাইছে, ক্রমেই যেন স্বর জমে উঠছে। জনকয়েক বুট ঠুকে তাল দিতে শুরু করেছে। কে একজন হেঁকে উঠল, লেফট —রাইট—লেফট—

হোগল কুসুম ফুইট্যা রইছে,
যমুনার জল উজান বইছে,
এমন চাঁদিনি রাতে পরাণডা মোর কিডা চায়—
ত্যাখতে আমায় ক্যামন ত্যাহা যায়।

উদাত্ত হয়ে উঠেছে গানের স্বর। বুটের তালে তালে, স্টেপিঙের হাঁকে হাঁকে স্বর যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অমল ভাবে, এই গানের কথার সঙ্গে আর তার এই নতুন জীবনের সঙ্গে কোথায় যেন একটা ভীষণ মিল রয়েছে! ঠিক যেন সে বুঝতে পারছে না, কোথা দিয়ে, কেমন ক'রে একটা অসঙ্গতি তার জীবনের মধ্যে সেঁদিয়ে পড়েছে—ঠিক ওই বুড়ো বয়সে নূপুর পরার মতো।

মাথাটা অমল কামরার দেয়ালে এলিয়ে দিলে—এইবার সে ঘুমোবে। চোখ হুটো সে বুজিয়েছে। কিন্তু খুব কাছাকাছি কোথায় যেন একটা চাপা শব্দ গুমরে গুমরে উঠছে। অমল কান খাড়া করল।

হ্যাঁ, কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তাদেরই কামরার মধ্যে···

পাঁচ

সকাল হলো পার্বতীপুর জংশনে।

ঘুম থেকে উঠে আড়ষ্ট দেহটার ওপর আড়মোড়া ভেঙে ছেলেরা শরীরটা ঝালিয়ে নিচ্ছে। খগেন পাশ ফিরে শুয়ে বললে, "মন্দ কি! এভাবে ট্রেনে ট্রেনে কিছুদিন কাটাতে পারলে একটু আরাম পাওয়া যাবে—পি· টি· প্যারেড তো আর করতে হবে না।"

স্বরাজ জানলার ওপর হুমড়ি খেয়ে প্ল্যাটফরমের হালচাল লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ বলে উঠল, "ওরে, ট্রেন পিকেটরা গাড়ীতে গাড়ীতে কি যেন বলছে!"

শিবেন বললে, "বলবে আর কি! পি· টি-র জন্যে তৈরি হয়ে নাও—"

অনন্ত বললে, "দূর, পি· টি. এখানে হতেই পারে না।"

পাঁচকড়ি বললে, "তা পারবে কেন! ট্রেন পিকেটরা এসে তোমার গা মালিশ ক'রে দিয়ে যাবে—মোট বয়ে বাছার গায়ে বড় ব্যথা হয়েছে কিনা!"

খগেন বললে, "আহা, পি· টি· করানোর অসুবিধেটা কোথায় ? প্ল্যাটফরমের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলবে'খন, 'মেরে লিয়ে হুকুম—তেরে লিয়ে কাম—ওই কাম বিগিন'—ব্যস, তোমরা নাচতে থাক, ওরা তাল দিতে থাকুক আর স্টেশন-সুদ্ধ লোক বাঁদর নাচ দেখুক—"

ট্রেন-পিকেট কামরার মধ্যে মুখ গলিয়ে বলে গেল, ঔর আধাঘণ্টা বাদ রুলকল, দো হুইসিলকে সাথসাথ পুরা ওয়ার্দিমে ফল্ ইন—"

শিবেন বললে, "নাও, সামলাও, পি· টি· না হয় রোলকল—রানিং ট্রেন থেকেও কি লোক পালিয়েছে না কি ?"

স্বরাজ বললে, "আরে বাবা, যে পালাবে, সে রানিং কেন ফ্লাইং ট্রেন থেকেও পালাবে। সকলেই তো আর আমাদের মতো ভেড়া নয়।"

দুই হুইসিল পড়ল। ছেলেরা কামরা থেকে নেমে প্ল্যাটফরমে দাঁড়াল। একজন ল্যান্স-নায়েক তাড়া দিলে, "এই, ঠিকসে ইন থি্জমে ফল্ইন হো।"

শিবেন গজগজ করতে থাকে, "শালা পয়েণ্টসম্যান, চল একবার বেনগাজি—কাপলিং টাইট করতে করতে হাতের ছাল-চামড়া উঠে যাবে।"

স্বরাজ বললে, "ঠিক বলেছিস মাইরি, আমরা তো তখন গার্ড সাহেব, তখন এই শালা এন· সি· ও· গুলোকে দিয়ে 'লাইন বক্স' বওয়াবো।"

যথারীতি নাম ডাকাডাকি গোনাগিনতি শুরু হলো। ক্যাম্প থেকে স্টেশনে আসার পথে দুজন, আর সান্তাহার স্টেশনে একজন, মোট আরও তিনজন পালিয়েছে। খগেন বললে, "সাবাস, একেই বলে বাপকা বেটা!"

পাঁচকড়ি সমস্ত রোলকলটা লক্ষ্য ক'রে বললে, "কেন, বি· ও· আর-দের রোলকল মাপ কেন ?"

অনন্ত ফিসফিস ক'রে বললে, "বি· ও· আর-দের অনেকেই যে মেজর সাহেবের টেম্পোরারী শ্যালক—"

"তার মানে!"

"মানে অতি সরল। মেজর রায় হচ্ছেন রেলের একজন বড় অফিসার, আর এই এ্যাংলোগুলো হচ্ছে সেই রেলেরই লোক। তাঁর দৌলতে কেউ হয়েছে ক্লিনার থেকে ড্রাইভার, আর কেউ হয়েছে চেকার থেকে গার্ড। মেজর রায় দক্ষিণাটি নগদ না নিয়ে গায়ে-গায়ে উশুল করেছেন।"

রোলকলের শেষে চা। চা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি হয়ে গেল, চা খাওয়ার সময়টুকু সকলকে পায়চারি ক'রে বেড়াতে হবে। আধঘণ্টা বাদে হুইসিল পড়বে, তখন আবার কামরায় গিয়ে বসবে।

চায়ের সঙ্গে বিস্কিটও দেওয়া হয়েছে। অনন্ত আশেপাশে দেখে নিয়ে বললে, "জানিস, এগুলো হচ্ছে ডগবিস্কিট—"

পাঁচকড়ি বললে, "যাঃ—"

স্বরাজ বললে, "তা ঠিকই হয়েছে! আমরা তো ওই পদেরই জীব।"

হুকুম মোতাবিক ছেলেরা পায়চারি করতে করতে চা খাচ্ছে। প্ল্যাটফরমের রেলিঙের ধারে ধারে সব ক'টি সেন্টি্র রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ট্রেন-পিকেটরা সমস্ত প্ল্যাটফরমটার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। মেজর সাহেব থেকে ল্যান্স-নায়েক, সকলেই তটস্থ—এই কড়া পাহারার ব্যূহ ভেদ ক'রে আর যেন কেউ পালাতে না পারে!

চা-পান এবং পদচারণা সমাপ্ত হলো। এক হুইসিলের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যে যার কামরায় গিয়ে উঠে বসল। বিড়ি, সিগারেট ধরিয়ে আবার তারা ভাবতে থাকে, এর পর কি! নীরব সব কয়টি ছেলের মধ্যে থেকে হঠাৎ অমল প্রশ্ন করে, আচ্ছা—বলতে পার, আমরা কি?"

প্রশ্নের আকস্মিকতায় সকলে অমলের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে! অমল বললে, "আমি জিজ্ঞেস করছি, এই যে ব্যবহার আমরা পেয়ে চলেছি, এমন ব্যবহার কারা পেয়ে থাকে?"

খগেন বললে, "ও, তাই বলো—" সকলে খগেনের মুখের দিকে চাইলে। খগেন বলতে লাগল, "আমরা হচ্ছি কয়েদী। কয়েদীদের হাতে-পায়ে বেড়ি দিয়ে রাখে, আর আমাদের রেখেছে বেয়নেটের ডগায়।"

অনন্ত বললে, "ঠিক বলেছিস মাইরি! তার ওপর জেল-মেট-এর মতো এন. সি. ও'গুলো সবসময় পেছনে লেগেই আছে।"

খগেন অনন্তকে থামিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, "তারপর, হুকুম ছাড়া এক-পা চলার অধিকার আমাদেরও নেই। একটা সামান্য ব্যাপার বললেই বুঝতে পারবে। কয়েদীরা স্নান করবে; মেট এসে হুকুম দেবে,'কয়েদী, থালা বাটি হাত।' কয়েদীরা থালা আর বাটি হাতে লাইন দিয়ে দাঁড়াবে। মেট তাদের স্নানের জায়গায় নিয়ে গিয়ে জলের সামনে লাইন দিয়ে বসিয়ে দেবে। তারপর হুকুম দেবে, 'তোল বাটি'—কয়েদীরা জল তুলবে। মেট বলবে, 'ঢাল বাটি'—কয়েদীরা মাথায় জল ঢালবে। মেটের মর্জিমাফিক বারকয়েক 'তোল বাটি—ঢাল বাটি' করেই তাদের স্নান সারতে হবে—তাতে তাদের গা ভিজুক আর নাই ভিজুক। বলতে পার, এই কয়েদীদের সঙ্গে আমাদের তফাতটা কোথায়?"

শিবেন বললে, "তফাত আর কোথায়! আজ যেভাবে চা খাইয়েছে, তাতে

হুবহু মিলে যাচ্ছে।"

পাঁচকড়ি বললে, "আমার মনে হয়, আমাদের সঙ্গে গরুর তুলনাটা আরও ভালো খাপ খায়। সকাল বেলায় রাখাল পাঁচন হাতে গোয়াল থেকে গরুগুলোকে বার ক'রে নিয়ে গেল। গরুগুলো সারাদিন মাঠে মাঠে চরে বেড়াল। সন্ধ্যেবেলা গুনেগেথে গরুগুলোকে আবার খোঁয়াড়ে পুরে দিলে। সারাদিন ধরে যা খেয়েছে, গরুগুলো রাতের বেলায় তারই জাবর কেটে চলল। তেমনি আমরাও সকালে পি. টি থেকে শুরু ক'রে রাতে রোলকল পর্যন্ত মাঠে মাঠে ঘুরলাম, পাঁচন-হাতে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াল মেজর সাহেব থেকে ল্যান্স-নায়েকের দল। রোলকলের পর বিছানায় শুয়ে আমরাও জাবর কাটি, সারাদিন ধরে যত লাথি-ঝাঁটা খেয়েছি, তারই—"

সকলেই চুপ—মুখগুলো সব থমথম করছে। সবাই নিজেদের যথার্থ রূপটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টায় হাতড়ে চলেছে দুনিয়ার কালো গহ্বরটা!

নীরবতা ভঙ্গ করলে অনন্ত, "আপনার কি মনে হয় অমলবাবু?"

অমল চমকে ওঠে। তার গ্রেড-প্রমোশনের আশা, তার জীবনের উন্নতি, তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা হুমড়ি খেয়ে চোখের সামনে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত ক'রে অমল বলতে শুরু করে, "খগেনবাবু আর পাঁচকড়িবাবু যা বলেছেন, সে দুটোই আমাদের বেলায় সমান খাটে। কিন্তু আমার মনে হয়, কোনটাতেই আমাদের সম্পূর্ণ ছবিটা ফুটে ওঠে নি। আমাদের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে কতকগুলো মানুষকে পশু বানিয়ে ফেলার মতো। মানুষ আর পশুতে মিশিয়ে এমন অদ্ভুত একটি জীব আমাদের বানাচ্ছে যাতে শিকল ছেঁড়ার কথা কোনদিন মনেও না আসে।"

অনন্ত বললে, "ঠিক বলেছেন, আমাদের এরা মানুষ তো মনে করেই না, আবার পশুও মনে করে না!"

পাঁচকড়ি বললে, "তবে আমরা কি?"

সকলের দিকে চোখ তুলে অমল বললে, "আমরা ক্রীতদাস—"

ক্ষণকের জন্যে সকলেই বিমূঢ় হয়ে পড়ে। স্তব্ধতায় জায়গাটা থমথম করতে থাকে। হঠাৎ খগেন সেই স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে, "শালারা আমাদের স্লেভ বানিয়ে রেখেছে!"

অমল বললে, "হ্যাঁ, ঠিক তাই—"

শিবেন্ প্রশ্ন করে, "কিন্তু কেন?"

অমল বললে, "এদের রাজত্ব বাঁচাবার জন্যে। এদেরই হাতে যে আমাদের

গ্রাসাচ্ছাদন, জীবন ধারণের চাবিকাঠি। তাই বেকারের সংখ্যা বাড়িয়ে, জিনিস-পত্রের দাম চড়িয়ে যে ফাঁদ এরা সৃষ্টি করেছে, আমরা পেটের দায়ে সেই ফাঁদের মধ্যে এসে পড়েছি। দিনের পর দিন, প্রতিটি কাজে, কথায় আর চিন্তায় হুকুম মানার ছাঁচে আমাদের ঢালাই ক'রে ফেলছে, পাছে আমরা কোনদিন এই ফাঁদ কাটার চেষ্টা করি। শুধু দুমুঠো খেতে দেওয়ার বিনিময়ে আমাদের ক্রীতদাস বানিয়ে ফেলছে। কিন্তু এমনই এদের কলকাঠি যে, আমরা নিজেরা এসে মিলি-টারীতে ভর্তি হয়েছি—কনস্ক্রিপশন ক'রে আমাদের ধরে আনে নি!"

সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেছে। বিস্ফারিত চোখে অমলের মুখের ওপর চোখ মেলে রয়েছে। কি এক বিরাট ষড়যন্ত্র যেন ধীরে ধীরে তাদের চোখের ওপর ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। খগেন উঠে পড়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে, পাঁচকড়ি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, শিবেন আস্ত সিগারেটটা আছড়ে ফেলে দিয়েছে, আর অনন্ত চোখ কুঁচকে অমলের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে—

বেলা দশটায় দু'হুইসিল পড়ল। ফেটিগের জন্য পুরা কোম্পানি ফল্ ইন—অবশ্য বি· ও· আর-রা বাদে।

প্ল্যাটফরমে নেমে ছেলেরা দেখলে, তাদের ট্রেন থেকে ব্রেকভ্যান আর ওয়াগনগুলো কেটে দু' নম্বর প্ল্যাটফরমে প্লেস করা হয়েছে। তিন নম্বর প্ল্যাটফরম মিটার গেজ লাইনের, সেখানে একখানা রেক দাঁড়িয়ে।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন বিস্ময়কর ঠেকে। যেন একটা অদৃশ্য হস্ত অলক্ষ্যে বসে সুতো ধরে টানছে, আর তারা পুতুল নাচ নেচে চলেছে।

এক নম্বর থেকে মার্চ ক'রে দু' নম্বর প্ল্যাটফরমে উঠল। ওয়াগনগুলোর সবকটারই দরজা খোলা। হাবিলদার মেজর বললেন, "বড়া গাড়ীসে সমুচা সামান্ ছোটা গাড়ীমে লেনে হোগা। সিরফ এতনাহি কাম—যেত্না জলদি খতম করনে সেকেগা, ওত্না জলদি ছুট্টি—"

কে যেন কথা তুলল, "তাহলে আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

আর একজন উত্তর দিলে, "মনে হচ্ছে যেন আসামে—"

"কেন? কাটিহার দিয়েও তো পশ্চিমের দিকে যাওয়া যায়—"

"পশ্চিমে কি হাওয়া খেতে যাবে নাকি! লড়াই চলেছে বর্মায়, সেইখানেই আমাদের নিয়ে চলেছে। কেন শিয়ালদা স্টেশনে বর্মা-ইভ্যাকুয়িদের ভিড় দেখ নি

বুঝি—যত শালা লালমুখো সুড়সুড় ক'রে পালিছে আসছে!"

"তাহলে বেনগাজির কথা ভুয়ো!"

"তাতে আর কি এসে গেল। মরতে যখন হবেই, তখন জার্মানী আর জাপানীতে তফাৎটা কি!"

সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। জাপানীদের মুখোমুখি হতে ভয়? দুর্ভেদ্য সিঙ্গাপুর তারা ফুৎকারে দখল করেছে। প্রিন্স অফ-ওয়েলস আর রিপালসের মতো জাহাজকে ওরা পাথর বাটির মতো ডুবিয়ে দিয়েছে! ছ'মাসে তারা মালয় থেকে বর্মা দখল করেছে! ওদেরই হাতে ব্রিটিশের আড়াই লক্ষ সৈন্য বন্দী!

বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। সেই জাপানে, যে আজ ছবছর ধরে নিরীহ চীনের ওপর তাণ্ডব চালাচ্ছে—চীনা বন্দীদের ডামি খাড়া ক'রে বেয়নেট ফাইটিং প্র্যাকটিস করছে, বুলেটের খরচ বাঁচানোর জন্যে হাজারে হাজারে চীনাকে তলোয়ার দিয়ে বলি দিচ্ছে!

শহরের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে খবর কাগজের পাতায় জাপানীদের বীরত্বে মুগ্ধ হওয়া চলে। জাপানীদের জয়ে উৎসাহিত হয়ে তাদের জন্যে অপেক্ষা করা চলে। কিন্তু জীবন বিপন্ন হওয়ার সীমানায় দাঁড়িয়ে আক্রমণকারী জাপানকে বন্ধু ভাবতে মন দমে যায়, বুকে ভরসা জাগে না।

মৃত্যুর বিভীষিকা চোখের ওপর ভেসে বেড়াতে শুরু করে—ডাক ছেড়ে তাদের কাঁদতে ইচ্ছে করে। কি এমন মহাপাতক তারা করেছে যে, মৃত্যু ছাড়া আর তাদের গত্যন্তর নেই। কাঁধের বোঝা মাটিতে নামিয়ে চকিত দৃষ্টিতে তারা পালানোর উপযোগী একটা সুড়ঙ্গ খুঁজতে থাকে।

কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটির প্রতিশ্রুতিতেও কাজে উৎসাহ আসে না। তবুও কাজ শেষ হয়—এন. সি. ও'দের তাড়ায় আর খিঁচুনিতে। কাজ শেষ হলে হাবিলদার মেজর আবার তাদের মার্চ করিয়ে এনে কামরায় কামরায় পুরে দেন। আবার ট্রেন পিকেটরা ব্যাটন দুলিয়ে টহল দিতে থাকে।

খগেন বললে, "জানিস, আমরা মণিপুর যাচ্ছি—"

অনন্ত বললে, "শেষ পর্যন্ত জাপানীদের হাতেই মরতে হবে!

পাঁচকড়ি বললে, "জাপানীরা বাঙালীদের কিছু বলে না। জানিস, সুভাষ বোস এখন জাপানেই আছেন?"

অনন্ত বললে, "যাওয়ার সময় বুঝি তোর সঙ্গে দেখা করেছিলেন?"

"না না, ঠাট্টা নয়। রাসবিহারী বোস নিজে এসে নিয়ে গেছেন। সুভাষবাবুর বাড়ীর সামনে চোদ্দজন করে সি. আই. ডি বসে থাকত—তবুও তাদের

চোখে ধুলো দিয়ে গেছেন—"

হঠাৎ একটা হৈ চৈ শব্দে স্টেশন গরম হয়ে উঠল। কামরা থেকে ছেলেরা জানলার ওপড় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। জমাদার সাহেব একটি ছেলেকে সার্টের কলার ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ছু'নম্বর প্ল্যাটফরমে তুললেন। তারপর চালালেন তার ওপর চড়চাপড়, কিল, ঘুষি!

মেজর সাহেবকে একজন এন. সি. ও. ডেকে নিয়ে এলো। জমাদার সাহেব নিরস্ত হয়ে ছেলেটিকে মেজর সাহেবের সামনে খাড়া করে দিলেন। মেজর সাহেব তার চুলের ঝুঁটি ধরে গোটাকয়েক ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, "মিলিটারীতে ঢোকার সময় মনে ছিল না? এখন ব্লাডি চোরকা মাফিক ভাগতা হায়—ঘরমে ক্যা বহুৎ রূপেয়া জমা হো গয়া?"

ছেলেটি মেজর সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে বললে, "আমাকে ছেড়ে দাও সাহেব, তোমার বহুৎ ভালো হবে—আমার বড় ডর লাগছে—"

মেজর সাহেব ঝটকা মেরে পা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "আঠাশ দিন কয়েদ খাটলে সমস্ত ভয়ডর কেটে যাবে"—তারপর হুকুম দিলেন, "টোয়েন্টি এইট ডেজ আর. আই—আর খুব হার্ড ফেটিগ।"

ছেলেটি তখনও মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে। দুজন সেন্ট্রি তার পিঠের ওপর হাত রেখে বললে, "চল ভাই—"

জমাদার সাহেব খিঁচিয়ে উঠলেন, "ওইসা নহি—এইসা—" বলেই তিনি ছেলেটির জামার কলার ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে চললেন। ছেলেটি তখনও একটানা চেঁচিয়ে চলেছে, "আমাকে ছেড়ে দাও সাহেব—তোমার বহুৎ ভালো হবে।"

খগেন বললে, "তবুও শালারা আশা করে জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা ওদের জেতাব!"

পাঁচকড়ি বললে, "এবার আর বাছাধনদের জিততে হচ্ছে না। সাধে কি আর কোলকাতার লোকে এ. আর. পি. কথাটার মানে করেছে—'এবার রণে পরাজয়'। আমি তো বেঁটে মামাদের দেখলেই হাত তুলে দাঁড়াব।"

অনন্ত বললে, "সেই ভালো। রামে মারলেও মারবে, আর রাবণে মারলেও মারবে। এ শালারা মারবে তিলে তিলে, আর জাপানীরা মারবে এক কোপে। সে হিসেবে জাপানীরাই ভালো।"

অমল গুম হয়ে বসে আছে—তার মুখখানা থমথম করেছে। শিবেন তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, "কি অমলবাবু, অত ভাবছেন কি?"

অমল চমকে উঠে বললে, "আমি! আমি ভাবছিলুম, মেজর সাহেবের সেদিনকার রাতের লেকচারের কথা। উনি বলেছিলেন, কেউ যদি থাকতে না পারে, উনি নিজেই তাকে ছেড়ে দেবেন। অথচ এখনই চোখের ওপর দেখিয়ে দিলেন ছেড়ে দেওয়ার নমুনা। তাই ভাবছিলুম, যারা মিলিটারীতে থাকতে চায় না—তাদের কেন এরা জোর করে ধরে রাখে!"

লালমণিরহাটে ট্রেন ইন করল—বেলা তখন সাড়ে চারটে।

ট্রেন-পিকেট অনিল কামরার জানলায় এসে দাঁড়াতেই পাঁচকড়ি বলে উঠল, "কিহে, আবার ফেটিগ হবে নাকি?"

অনিল বললে, "কেন, আমি বুঝি কেবল ফেটিগের খবরই আনি?"

"তা ছাড়া আর কি কম্মোটা করছ শুনি?"

অনিল অভিমানের স্বরে বললে, "যা যা, তোদের সঙ্গে আর কথাই বলব না। ভাবছিস বুঝি, এই ব্যাটন-হাতে দারোয়ানি করতে আমার খুব ভালো লাগছে? তোরা তো তবু দশজন এক জায়গায় বসে গল্পগুজব করছিস—আর আমি?"

পাঁচকড়ি অনিলের কাঁধে একটা হাত রেখে বললে, না রে না, রাগ করছিস কেন শুধু শুধু। ওই ডিউটিতে যতক্ষণ আছিস, ততক্ষণই তুই শত্তুর—তারপর তো তোর আমার একই হাল। যাক, কোথায় নিয়ে চলেছে, কিছু জানিস নাকি? তোরা তো এখন হাই-কমাণ্ড মহলে ঘোরাফেরা করছিস—"

"সেই কথাই তো বলতে এসেছিলাম।"

"আরে তাই নাকি? আয় আয়, ভেতরে এসে বস। ওরে শিবে, অনিলকে একটা সিগারেট দে রে—"

"না রে না, ভেতরে যাব না। ওই শালা বেঁটে-খচ্চরটা তো পেছনে লেগেই আছে।"

"কে? জমাদার সাহেব?"

"তাছাড়া এমন গুণধরটি আর কে!"

অনন্ত উঠে এসে অনিলের কানের কাছে মুখ এনে বললে, "দে না অন্ধকারের মধ্যে শালার মাথায় এক ঘা ব্যাটন কষিয়ে। যেই শালা অজ্ঞান হয়ে পড়বে, অমনি দিবি শালাকে চাকার তলায় ফেলে।"

অনিল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "সে হয় না রে অনন্ত। ইচ্ছে কি আর হয়

না—কিন্তু আমার যে শতেক জ্বালা—"

"তোর আবার কি জ্বালা হলো ?"

"সে আর শুনে কি করবি—সে সব কথা আর লোকালয়ে বলবার মতো নয় —মনে হলেই আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়।"

"মনের মধ্যে কথা কখনও চেপে রাখতে নেই, তাহলেই অশান্তি বাড়ে। খোলসা ক'রে বলে ফেল, মন হাল্কা হয়ে যাবে।"

"তা যখন বললি, তবে শোন। লোকের একটা বিয়েই হয় না, আর আমার কপালে দু-দুটো—আর দুটোই রয়েছে বেঁচে !"

স্বরাজ বলে উঠল, বলিস কি রে, একেই বলে ছপ্পড় ফুঁড়ে পাওয়া। আর আমরা শালা রাস্তায় ঘাটে প্রেমের পিত্যেশে পরদেশী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু এমনই ফাটা কপাল, আজও মাইরি একটা বিয়ে হলো না।"

অনন্ত স্বরাজকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "সব কথায় ঠাট্টা ইয়ার্কি চলে না স্বরাজ—মানুষের মন বুঝে কথা কইতে হয়। যাক, তুই বল অনিল—"

অনিল বলতে লাগল, "বছর খানেক আগে আমার প্রথম বিয়ে হয়। বাবার সঙ্গে শ্বশুর মশাইয়ের লাগে খাটাখটি পাওনা-থোওনা নিয়ে। বাবা তো রেগে গিয়ে বৌটাকে দিয়ে এলেন তার বাপের বাড়ী। তারপর দু-মাস বাদে আবার আমার বিয়ে দিলেন। আর আমায় হুকুম দিলেন, প্রথম বৌয়ের কথা একেবারে ভুলে যেতে। আচ্ছা বল তো, একি কোন মানুষে পারে ? মন্তর পড়ে, অগ্নি সাক্ষী ক'রে যাকে বিয়ে করেছি—তাকে ভুলে গেলে যে নরকেও আমার স্থান হবে না। সে বৌটা এখনও আমাকে লুকিয়ে চিঠি লেখে, কিন্তু আমি কি যে করব, ভেবে কুল-কিনারা পাই না।"

অনন্ত বিষণ্ণ স্বরে বললে, "কি আর করবি বল, যা হবার তা তো হয়ে গেছে। বাবা মারা গেলে, তাকেও ঘরে নিয়ে আসবি—তাড়িয়ে দিলেই তো আর দায়িত্ব চলে যায় না—সে-তো আর তোকে ছেড়ে যায় নি !"

শিবেন বললে, "ঠিক বলেছিস অনন্ত, বাপের প্রায়শ্চিত্ত ছেলেকেই করতে হবে। এ নিয়ে আর মন খারাপ করিস নি অনিল। যাক, কি বলতে এসেছিলি, তাই বল—"

কথা বলতে গিয়ে অনিলের গলাটা কেঁপে ওঠে। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে সে চোখটাও মুছে নেয়। তারপর বলে, "আমাদের কোম্পানি বোধহয় এখানেই নামবে।"

"কি করে বুঝলি ?"

"মেজর সাহেব, ক্যাপটেন, এ্যাডজুটাণ্ট আর সুবেদার সাহেব গেছেন স্টেশনে। কি একটা জরুরী মেসেজ এসেছে। আচ্ছা, আমি চলি ভাই—"

স্বরাজ বললে, তা মন্দ হয় না। জায়গাটা তো বেশ ভালো বলেই মনে হচ্ছে। এতবড় একটা জংশন স্টেশন—বেশ কাজ-টাজ শেখা যাবে।

পাঁচকড়ি বললে, "ক্যাম্পও তাহলে নিশ্চয়ই স্টেশনের কাছে পড়বে ?"

স্বরাজ বললে, "সে তো বটেই, আর রেলওয়ে কলোনিও তো একটা দেখলুম, দিনকাল দেখছি ভালোই যাবে—"

পাঁচকড়ি বললে, "মাল-ঝাল এক-আধটা নজরে পড়ল নাকি ?"

"চোখে তো পড়ে নি—তবে শাড়িটাড়ি যেন কয়েকটা শুকোতে দেখেছি।"

"ব্যস, তাহলেই হলো। শাড়ি যখন আছে, তখন তা পরবার লোকও নিশ্চয়ই আছে, কি বলো ?"

দু'নম্বর প্লাটফরমে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল। তার কামরাগুলোতে গাদাগাদি ক'রে লোক বসেছে। একই কামরায় মেয়ে, পুরুষ, সাহেব, মেম, বাচ্চাকাচ্চা সবই আছে। গাড়ীটা দাঁড়াতেই কেউ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, কেউ ককিয়ে উঠল, বাচ্চা-কাচ্চার দল চ্যাঁ-ভ্যাঁ শুরু করে দিলে। রেলওয়ে পুলিশ এসে প্রত্যেকটা কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

পাঁচকড়ি বলে উঠল, "এ আবার কি ট্রেন ! সিভিলিয়ানদের পাহারা দেয় কেন রে বাবা !"

স্বরাজ চেঁচিয়ে ও-গাড়ীর একজনকে জিজ্ঞেস করলে, "ও দাদা, শুনছেন, আপনারা কোথা থেকে আসছেন ?"

উত্তর এল, "বর্মা থেকে—"

"কচু-কাটা করছে—"

পাঁচকড়িদের সামনাসামনি কামরা থেকে মাথা বাড়িয়ে এক বৃদ্ধ বমি করতে শুরু করেছে, আর এক মহিলা তার মাথায় জল ঢালছে।

খগেন বললে, "দেখুন অমলবাবু একবার কাণ্ডটা ! যুদ্ধের দৌলতে তাহলে শুধু যে আমরা মরব, তা নয়—সিভিলিয়ানরাও বাদ যাবে না !"

মেজর সাহেব স্টেশনে ফিরেই দেখেন, কামরার মধ্যে বসেই ছেলেরা চিৎকার ক'রে বর্মা-ইভ্যাকুয়ি ট্রেনের খবরাখবর জানছে। তিনি নিজেই হু-হুইসিল বাজিয়ে দিলেন। ছেলেরা লাফাতে লাফাতে প্লাটফরমে নামছে—তাদের ধারণা লালমণিরহাটে ক্যাম্প করার জন্তেই তারা নামছে—ট্রেন-পিকেটদের কৃপায় এই সুসমাচারটি থেকে কেউ বঞ্চিত হয় নি।

মেজর সাহেব সুবেদার নন্দীকে বললেন, "ঘণ্টাখানেক এদের রুট-মার্চ করিয়ে আনো—ততক্ষণে নিশ্চয়ই ওই ইভ্যাকুয়ি ট্রেনটা চলে যাবে।"

রঙ্গিয়া জংশন পার হওয়ার পরই দেশের চেহারা যেন বদলে যেতে থাকে! মেঘলা আকাশ। চারিদিকেই জল থৈ থৈ করছে। লাইনের দুধারে নাবাল জমিগুলো জলে ভর্তি, আর তার বুক ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে সবুজ ঘাস—মাথা চাড়া মেরে জলের বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে। দূরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় মেঘগুলো যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে দিয়ে এসে পড়ছে রোদ্দুর, যেন পালকের মতো হাল্কা। উঁচুনীচু মাঠের মাঝে, কোথাও চাষীরা টোকা মাথায় লাঙ্গল দিচ্ছে, কোথাও কয়েকটা ছোট ছেলেমেয়ে ছিপ ফেলে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর কোথাও মেছো বক লম্বা ঠ্যাঙ ফেলে চলেছে শুচিবায়ুগ্রস্ত গ্রাম্য ব্রাহ্মণের মতো।

অমল জানলার ধারে বসে আছে। সারারাত তার ঘুম হয় নি, কেবল মাঝে মাঝে ঢুলছে। কি এক অজানিত ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে—ভেবেছে তার ফেলে-আসা জীবনের কথা, আর অনাগত মৃত্যুর কথা! ভোরের আলো, মেঘলা আকাশের ধূসর রোদ আর লাইনের দুধারে সবুজের সমারোহ—আবার যেন তাকে সজীব, চঞ্চল ক'রে তুলছে। জানলার ওপর থুতনিটা রেখে এসে সে বাইরের দিকে চেয়ে আছে।

একটা বাঁকের মুখে ট্রেনখানা বেঁকে বেঁকে যেন ধনুকের মতো হয়ে যায়—মিটার গেজের ট্রেন, গাড়ীগুলো মনে হয় যেন দেশলাইয়ের বাক্স। কিন্তু লাইন আর গাড়ী ছোট বলে ট্রেনটা দৈর্ঘ্যে তো কম নয়! অমলের বিস্ময় জাগে, এত সরু লাইনের ওপর দিয়ে, এত লম্বা একটা ট্রেন, এত জোরে চলছে কি ক'রে! কিন্তু ট্রেন তো চলেছে, অবিরাম চলেছে, তিন দিন তো কেটে গেল, তবুও এ চলার কি শেষ নেই!

ট্রেনটা হঠাৎ খনখন ঝনঝন ক'রে একটা ক্রসিং পার হয়ে চলল। তারপর চলেছে একটা ইয়ার্ডের মধ্য দিয়ে—গতি ক্রমেই মন্থর হয়ে আসছে। ট্রেনের দুধারে অগণন লাইন, এঁকে বেঁকে এদিক-সেদিক-কোন দিকে যে চলে গেছে, তার যেন আর হদিস পাওয়া যায় না। অমল ঝুঁকে পড়ে সব দেখতে দেখতে বললে, "আমরা বোধহয় এসে পড়লাম।"

পাঁচকড়ি জিজ্ঞেস করলে, "কোথায়?"

খগেন বললে, "কোথায় আবার! জাহান্নামে।"

কাঁচা একটা লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেনটা ধিকিধিকি গড়িয়ে চলেছে। অনন্ত বললে, "এ তো বাবা নতুন তৈরি ইয়ার্ড, এর মধ্যে ঢোকাচ্ছে কেন! তবে কি এখানেই নামবে নাকি?"

ট্রেনটা যেখানে গিয়ে থামল, সে লাইনটা একেবারে ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের ওপর। সিট্ ছেড়ে ছেলেরা নদীর দিকে গিয়ে বসল। ভরাভর্তি নদ, স্রোতের টানে কচুরিপানা ভেসে চলেছে সাঁই সাঁই ক'রে। দুপারে কত যে স্টিমার, বোট আর ফেরি, তার যেন আর ইয়ত্তা নেই! ট্রেনে বসেই নদের অপর পার দেখা যায়, পাহাড়ের ঢল নেমে এসেছে নদের বুকে। ছেলেরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে নদীর ওই দুর্বার স্রোতের দিকে চেয়ে থাকে। বুকের মধ্যে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফুলে ফেঁপে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে—তারাও বুঝিবা এমনিভাবে কেবল চলবে আর চলবে—জীবন তাদের হঠাৎ একদিন থেমে যাবে না—আশা আকাঙ্ক্ষার সবকিছুই হঠাৎ শেষ হয়ে যাবে না……

ছয়

আমিনগাঁও রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের মাঠে কোম্পানির তাঁবু পড়ল। মাঠের সামনে পিচঢালা রাস্তা—তার অপর পারেই ব্রহ্মপুত্রের পাড়। মাঠটা ছোট, তাই তার বেড়া ঘেঁষে তাঁবু ফেলেও, সবকটা তাঁবু খাটানো যায় নি। লোকের অনুপাতে তাঁবু কম, তাই একই তাঁবুতে আঠারো থেকে কুড়িজন ক'রে থাকার হুকুম। বি. ও. আর'দের জন্যে ব্যবস্থা হলো ইনস্টিটিউটের পাকা দালান!

মাঠের চারিধার ঘিরে তাঁবু পড়েছে। মাঝখানে একটা টিনের চালা আগে হতেই ছিল, সেইখানে হলো লঙ্গরখানা। অফিস, স্টোর, অফিসার আর ভি. সি. ও'দের তাঁবু পড়ল রাস্তার ধারে, একেবারে নদীর কিনারে। কোয়ার্টার গার্ডের তাঁবু পড়ল মাঠের গেটে। সন্ধ্যে হওয়া পর্যন্ত ছেলেরা মাঠের চারধারে কাঁটা-তারের বেড়া লাগালে।

আমিনগাঁও হচ্ছে একটা টার্মিনাস স্টেশন—কাজেই ওখানকার আবহাওয়া-টাই জমজমাট। একেবারে যে একটা জঙ্গলে এসে পড়ে নি, একথা ভেবে ছেলেরা খুব খুশি। কেউ খুশি, নতুন জায়গায় নতুন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে বলে, আবার কেউ খুশি সৈনিক-জীবনের ফুর্তির খোরাক মদ আর

মেয়েমানুষ সুলভ হওয়ার সম্ভাবনায়। সামাজিক জীবের খোরাক রয়েছে ইনষ্টিটিউটের লাইব্রেরী, ফ্রী রিডিং রুম, মাঝে মাঝে গানের জলসা, থিয়েটারের রিহার্সাল আর সিভিলিয়ান পরিবারগুলো। আর সৈনিকের খোরাক রয়েছে বিরাট ধাঙ্গড় বস্তি—দেশী মদ সেখানে প্রচুর পাওয়া যায়। আর মেয়েমানুষ সুলভ হওয়ার কারণ, ওই অঞ্চলের নীচের তলার মানুষের অসীম দারিদ্র্য।

ক্যাম্প হওয়ার তৃতীয় দিনে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে চলল স্টেশন মাস্টার, সিগন্যালার আর পয়েণ্টসম্যানরা রঙ্গিয়া, সরভোগ আর বরপেটা স্টেশনে—সেখানে তারা হাতেনাতে কাজ শিখবে, দরকার পড়লে স্বাধীনভাবেও কাজ করবে। বারোজন গার্ড বুক করা হয়েছে আমিনগাঁও থেকে লালমণিরহাট সেকশনে রাস্তা চিনতে। আমিনগাঁও লোকো-শেডে কাজে লেগে গেল শেড-স্টাফেরা। ড্রাইভার আর ফায়ারম্যানরা কাজ নিলে ইয়ার্ড পাইলটে। নতুন ধরনের এক কর্মব্যস্ততা সমস্ত কোম্পানিটাকে পেয়ে বসেছে। ছেলেরা নিজের নিজের ক্যাটেগরিতে কাজ করতে পেয়ে, আর. পি. টি. প্যারেড থেকে রেহাই পেয়ে, অসীম উৎসাহে কাজে লেগে গেছে।

টেকনিক্যাল ডিউটি যাদের কপালে জোটেনি, তারা বৃষ্টি না হলে পি. টি. প্যারেড করে, যত রকমের ফেটিগ দরকার হয় সব তারাই করে, কোয়ার্টার গার্ড ডিউটিও তারাই দেয়। তবুও এই শিথিল আবহাওয়ার মধ্যে ছিদ্র খুঁজে নিয়ে বিকেলে নদীর ধারে ধারে খানিকটা ঘুরে ফিরে বেড়ায়—চোখে ধুলো দিতে পারলে বাজারটাও একপাক দিয়ে আসে।

ডিউটিতে বুক করার সময় প্রথম সুযোগ পেয়েছে বি. ও. আর-রা, তারপর সুবেদার, জমাদার সাহেবের পেয়ারের লোকেরা। কাজেই অমল, অনন্ত, পাঁচকড়ি প্রভৃতির আর লাইনে বার হওয়ার সৌভাগ্য হয় নি। অবশিষ্ট ছেলেদের মধ্যে তারাই উচ্চবেতন আর শিক্ষিত সম্প্রদায়, তাই চোট এসে পড়ছে তাদেরই ওপর বেশী।

খগেন তাঁবুতে ঢুকে বললে, "একটা সুখবর দেব, কে কি খাওয়াবে বলো?"

অনন্ত বললে, "খবর যদি সাচ্চা হয়, এক-ডোজ দিশী খাইয়ে দেব।"

"না ভাই, ও যেন পোষায় না—বড় গলা-বুক জ্বালা করে—"

"বুকে যাদের আগুন জ্বলে, তারাই ওই জ্বালায় আনন্দ পায়।"

পাঁচকড়ি বললে, "তোর বুকে বুঝি আগুন জ্বলে অনন্ত? কিসের আগুন বাবা! বেশ তো ঢুকঢুক চালাও দেখি মাঝে মাঝে!"

অনন্ত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে অমলের দিকে চাইলে। অমল পাঁচকড়িকে বললে,

"যেতে দাও অনন্তর কথা। খগেন যা বলছিল, সেইটাই শোনা যাক।"

খগেন বললে, "শুনে এলাম, গৌহাটিতে একটা ডিট্যাচমেণ্ট শীগগিরই খোলা হবে। সেখানে গার্ড আর স্টেশন মাস্টার জনকয়েক দরকার হবে।"

পাঁচকড়ি লাফিয়ে উঠল, "আমি যাব মাইরি। তুই পিটার সাহেবকে বলে-ক'য়ে করিয়ে দে, তার একরাতের ফুর্তির খরচ আমি দেব। আর পারছি না মাইরি! দিনরাত মুটেমজুরের মতো বস্তা বওয়া আর রাইফেল ঘাড়ে দারোয়ানি করা—সত্যি বলছি, আমি এবার সুইসাইড করব—"

খগেন বললে, "অমল, তুমি?"

"যেতে আমার খুবই ইচ্ছে আছে—কিন্তু ঘুষ আমি দিতে পারব না।"

"তবেই হয়েছে! জানই তো, পিটার সাহেব হচ্ছে মেজর সাহেবের ডান হাত। সে তো ভাই টু-পাইস না নিয়ে কাজ করবে না।"

পাঁচকড়ির কোয়ার্টার গার্ড ডিউটি, সে চলে গেল গার্ডরুমে। খগেন বললে, "যাক, সে না হয় দেখা যাবে'খন। চল, এখন একটু ঘুরে আসি।"

ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে অফিসার্স মেসের কাছাকাছি এসে ওরা দেখে, তাঁবুর বাইরে অফিসাররা সকলেই বসে আছেন। টেবলের ওপর দুটো হুইস্কির বোতল আর সকলের হাতে গ্লাস। অমল হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, "না ভাই, ওদের সামনে দিয়ে গিয়ে কাজ নেই, নেশার ঝোঁকে হয় তো আমাদের সবসুদ্ধ কোয়ার্টার গার্ডে পুরে দেবে।"

খগেন বললে, "দূর বোকা, সব কাজেরই একটি ট্যাকটিকস আছে। জানই তো, ও শালারা সেলামের কাঙাল। আমরা করব কি, ওদের সামনে দিয়ে পাস করার সময় তিনজনেই একসঙ্গে বকায়দা এক সেলাম ঠুকে দেব। দেখবে, কোন শালা আর একটি কথাও বলবে না।"

দুরুদুরু বুকে ওরা এগিয়ে চলল। অফিসারদের কাছ বরাবর এসে খগেন দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "আপ"—ওরা তিনজনেই বাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে, কপালে হাত তুলে, ছ-কদম এগিয়ে গেল। মেজর সাহেব মদের গ্লাসসুদ্ধ হাত তুলে সেলাম গ্রহণ করলেন।

অমল বললে, "বাপস, যেন আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে এলুম!"

খগেন বললে, "কায়দাগুলো শিখে নাও, না হলে মরে যাবে। ফাঁকি যদি না দিতে পার, তাহলে ও শালারা দুদিনে সাবড়ে দেবে। হ্যাঁ, তবে ফাঁকি দিতে হবে বুদ্ধি খরচ ক'রে। এই যে আমরা স্যালিউট ক'রে বেরিয়ে এলাম, ও ব্যাটারা ভাবছে, আমরা বুঝি ডিউটিতে চলেছি।"

ফেরিঘাটের কাছাকাছি এসে অমল বললে, "নদী পার হলেই তো গৌহাটি যাওয়া যায়। একদিন যেতে হবে বেড়াতে, কি বলো অনন্ত ?"

খগেন বলে উঠে, "কোথায় ? তিন নম্বর গেটে নাকি ?"

অমল বললে, "কিসের তিন নম্বর গেট !"

খগেন অনন্তর দিকে চেয়ে মুচকে হেসে বললে, "গেটওয়ে টু হেভেনস—"

অমলের মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে। এতক্ষণে অনন্ত মুখ খোলে, "না ভাই অমল, যদি সম্ভব হয়, ওই হেভেনসের গেটে কোনদিন যেয়ো না।"

খগেন ঝংকার দিয়ে উঠল, "বলিস কিরে ! তুই কি ভোল পালটাচ্ছিস ?"

অনন্ত কোন উত্তর দেয় না। অমল অনন্তর বিষণ্ণ মুখখানার দিকে চেয়ে বললে, "তোমার কি হলো অনন্ত, হঠাৎ এত মুষড়ে পড়লে কেন ?"

অমলের একটা হাত চেপে ধরে অনন্ত বললে, "সে অনেক কথা, এক দিন তোমায় সব বলব অমল।"

ওরা সবেমাত্র ফেরিঘাটের পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় একটা স্টিমার এসে আমিনগাঁও-এর জেটিতে ভিড়ল। স্টিমার ভর্তি সৈনিক। অমল জিজ্ঞেস করলে, "এত মিলিটারী আসছে কোথা থেকে ?"

খগেন বললে, "আর কোথা থেকে ! বর্মা থেকে ল্যাজ গুটিয়ে বীরত্বের সহিত পশ্চাদপদ হচ্ছেন—"

অনন্ত বললে, "কাল কাগজে দেখলুম, মণিপুরে জাপানীরা বম্বিং করেছে, অবশ্য ক্ষতি কিছুই হয় নি। কিন্তু এখন তো দেখছি, সৈনিকরাই যা পালিয়ে আসছে !"

খগেন অমলকে ঠেলা দিয়ে বললে, "দ্যাখো দ্যাখো, অফিসারগুলো যেন সব পাদ্রীসাহেব হয়ে গেছে হে ! লম্বা লম্বা দাড়ি, ছেঁড়া জামা আর খালি পা—আহা শুকিয়ে বাছারা চামচিকে হয়ে গেছে !"

ফেরি থেকে নেমে খানিকটা বালি ভেঙে পাড়ে উঠতে হয়। পাড় থেকে খানিকটা দূরেই স্টেশন। স্টেশনের মুখে বিরাট দুই ড্রামে চা আর কয়েক টিন বিস্কিট নিয়ে জনকয়েক লোক বসে আছে। আর. টি. ও.-র একজন লেফটেনান্ট সেখানে দাঁড়িয়ে অফিসারদের বিবরণ লিখে নিচ্ছে।

এক ভাঁড় চা আর এক প্যাকেট বিস্কিট নিয়ে অফিসাররা বালির ওপর বসে পড়েছে। চায়ের ভাঁড়ের দিকে তাকাতেই চোখগুলো তাদের চকচক ক'রে উঠেছে—একটা বিস্কিটের সমস্তটাই একবারে মুখে পুরে দিচ্ছে।

অমল বললে, "খাওয়ার ধরন দেখ—কতদিন যেন খেতে পায় নি !"

অনন্ত বললে, "তা ছাড়া আবার কি! সেদিন একটা অফিসার বলছিল, চৌত্রিশ দিন ধরে সে হাঁটতে হাঁটতে এসেছে স্রেফ চাল চিবিয়ে। ডিমাপুরে পেঁছে চেষ্টা-চরিত্তির করলে নাকি খাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে বসে গেছে লুটের কারবার—একটা খানা খেতে গেলে লাগবে বস্তা বস্তা টাকা—এক বাণ্ডিল বিড়ির দাম উঠেছে পাঁচ সিকি! আর ইভ্যাকুয়িদের খাওয়ার চেয়ে গাড়ীতে জায়গা জোগাড়ের ধান্দাটা থাকে বেশী।"

খগেন বলল, "আরে, জানিস না বুঝি? দিন দুই আগে একটা অফিসার—রীতিমত হোমরা চোমরা, কর্ণেল না ব্রিগেডিয়ার কি যেন একটা, সোরাবজীর রেস্টুরেণ্টে এয়সা খাওয়া খেয়েছে যে, তখুনি বমি করতে করতে পটল তুলেছে। সেই থেকে আর. টি. ও. কোন ইভ্যাকুয়ি অফিসারকে আর ওখানে খেতে দেয় না।"

অফিসারদের নামার পালা শেষ হলো, সাধারণ সৈনিকরা নামতে শুরু করল। নামছে তারা অসীম উৎসাহে, কিন্তু চলার ক্ষমতা নেই—শরীরের সমস্ত রস শুকিয়ে গেছে। নামছে ধরাধরি ক'রে, আর কেউ নামছে অপরের কাঁধে ভর দিয়ে। কদম রাখার বালাই নেই, ড্রেসিঙের দিকে তাকাবার অবসর নেই, কর্কশ কণ্ঠে হুকুম দেওয়ারও কেউ নেই। সব আজ বাঁচার তাগিদে আপন-সর্বস্ব।

ওরা চায়ের জায়গায় এসে জমা হচ্ছে। যার যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে, তারই জোরে তারা অন্যকে ঠেলে এগিয়ে চলেছে। যারা মাটির ওপর বসে পড়েছে, তারা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। চা নিয়ে কেউ সবটাই এক বারে মুখের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছে—তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারলে যদি আরও একবার পাওয়া যায়! কতক লোক বমি করতে শুরু করেছে—বহুদিনের অনশনক্লিষ্ট জঠরে গরম চা দুষ্পাচ্য হয়ে উঠেছে।

অমল বললে, "আর কি খেতে দেওয়ার জিনিস পেলে না!"

অনন্ত বললে, "খেতে দেওয়ার জন্যে কি আর দিয়েছে! তাহলে চেয়ে ছাখো, যারা চা দিচ্ছে তাদের পেছনে ওই সাইন বোর্ডখানা—"

বোর্ডখানিতে আঁকা—একজন ভারতীয় সৈনিক খুশিতে ফেটে পড়ে ধূমায়িত চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানশান বোর্ড। খগেন আঁতকে উঠল, "ওঃ, কী সাংঘাতিক! একেই বলে ব্যবসাদার—মৌকা পেয়েছে তো অমনি বিজ্ঞাপন চালাচ্ছে। কিন্তু এই লোকগুলো কি স্বর্গে গিয়ে ওদের চায়ের বাজার বাড়াবে!"

তখনও সৈনিকরা নামছে। বাকী মাত্র আর কয়েকজন, তারা দল ছাড়া হয়ে পড়েছে। তাদের কেউ নামিয়ে আনার চেষ্টা করে নি, তবু তারা নেমে

আসছে টলতে টলতে। পারঘাটার পাটাতনের দড়ি ধরে একপা একপা করে এগিয়ে আসছে। একজন দড়ির শেষ প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে—এরপর কি অবলম্বন করে সে পাড়ে উঠবে! সবশেষের লোকটি আর চলতে পারে না, দড়িটাকে দুহাতে চেপে ধরে এলিয়ে পড়ল পাটাতনের ওপর।

অমল, খগেন আর অনন্ত ওই লোক দুটিকেই লক্ষ্য করছিল। অমল বললে, "চল আমরা ওদের একটু সাহায্য করি—"

নেমে এলো ওরা পাটাতনের ওপর। যে লোকটি পাটাতনের শেষপ্রান্তে থমকে দাঁড়িয়েছিল, সে খগেনের জামাটা চেপে ধরলে। খগেন বললে, "আমি একে নিয়ে যাচ্ছি—তোমরা ওকে নিয়ে এস।"

খগেন লোকটির কোমর জড়িয়ে ধরে তার বাঁ হাতটা নিজের গলায় জড়িয়ে নিলে। একপা একপা ক'রে তারা পাড়ে উঠছে। খগেনের দম বন্ধ হয়ে আসছে—ওঃ, কি বিকট দুর্গন্ধ লোকটার গায়ে! আর জামাগুলোয় সত্যি পোকা কিলবিল করছে। লোকটির কোমর থেকে খগেন হাতটা সরিয়ে নিলে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি খগেনের গলাটা আরও জোরে আঁকড়ে ধরলে। খগেন আবার তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে ওপরে উঠতে থাকে।

অমল আর অনন্ত পাটাতনের ওপর পড়ে যাওয়া লোকটির পাশে এসে বসল। অমল লোকটির মাথা তুলে নিলে তার উরুর ওপর, তাকে অনেক ভাবে ডাকলে—কিন্তু কোন সাড়া নেই! চোখের পাতা টেনে দেখে অমল বললে, "স্ট্রেচার না হলে তো একে ওপরে নিয়ে যাওয়া যাবে না—এখনও বোধহয় সময় আছে।"

অনন্ত বললে, "একে শান্তিতে মরতে দাও অমল, আর টানা-হেঁচড়া ক'রে কাজ নেই। এমন কত হাজারে হাজার যে বর্মার রাস্তায় লুটিয়ে রয়েছে—তাদের সকলকে আজ চিলে-শকুনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে!"

অমল বললে, "না অনন্ত, নিছক অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে একে মরতে দেব না। আজ বুঝতে পারছি, আমাদেরও এই একই পরিণতি—তবুও আমরা বাঁচবার চেষ্টা করব—একেবারে হাত পা ছেড়ে দিয়ে মরতে যাব না।"

অনন্ত চলে গেল স্টেশনে। অমল ঝুঁকে পড়ে লোকটির মুদিত চোখের দিকে চেয়ে, তার কপালের ওপর একটি হাত রাখলে। ফেরিঘাট জনশূন্য হয়ে গেছে। টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড বিনামূল্যে চা বিতরণ ক'রে, চা পানরত সৈনিকদের ফটো তুলে নিয়ে চলে গেছে। নদীর বুকে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। অমলের গা যেন ছমছম করছে। সে ভাবছে, কে এই লোকটি! কোন দেশে এর বাড়ী! এর বাড়ীতেই বা আছে কে কে! কেনই বা মরতে

এসেছিল এইভাবে? কিন্তু মরার জন্যে তো লোকটি এখানে আসে নি! এসেছিল বেঁচে থাকার আশায় চাকরী করতে। মরণকে এড়াতে গিয়ে, এ কি শোচনীয় মৃত্যুকে সে বরণ করলে!

সন্ধ্যে উৎরে গেছে— অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছে। পাড়ের ওপর থেকে দু-একটি আলোর রেখা ঠিকরে এসে চোখে পড়ছে। ব্রহ্মপুত্রের অবিরাম স্রোত জেটির গায়ে ছলাৎ ছলাৎ ক'রে ধাক্কা খাচ্ছে। নদীর বুকে শুধু অন্ধকার, নিকষ কালো অন্ধকার! অমলের সত্যিই ভয় করছে। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে, লোকটি আর বেঁচে নেই। তার ইচ্ছে, হয়, লোকটির মাথা কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে, ছুটে সে পালিয়ে যায়। কিন্তু অনন্ত এত দেরী করছে কেন? চোখ কুঁচকে সে তাকাল পাড়ের দিকে। জনকয়েক লোক নেমে আসছে— এই তো কথাবার্তার শব্দও আসছে! এইবার তাহলে সে লোকটির বুকের ওপর কান রেখে দেখতে পারে, লোকটি সত্যিই বেঁচে আছে কি না!

অনন্ত, খগেন আর দুজন সৈনিক অমলের সামনে এসে উবু হয়ে বসল। খগেন জিজ্ঞেস করলে, "আছে, না শেষ হয়ে গেছে?"

অমলের গলা কেঁপে উঠল, "নাঃ, নেই—"

একজন সৈনিক বললে, "থাকবার কথাও নয়। মাটিতে যে একবার পড়ে, সে আর ওঠে না—তার বুকের ওপর পা রেখে আমরা হেঁটে এসেছি—"

অমল হঠাৎ ফেটে পড়ে, "কিন্তু কেন?"

"সেই কথাটা আমরাও ভাবি। আমরা কি শুধু মরার জন্যেই মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছিলাম! সামনে এগিয়েও মরেছি—পেছু হঠতে গিয়েও মরেছি— আমরা কেবল মরেছি, এখনো মরছি, পরেও হয়তো মরব!"

অনন্ত বললে, "জানো অমল, বর্মায় এঁরা ছিলেন আড়াই হাজার লোক। আর আজ এঁরা ফিরে এসেছেন বড় জোর শ' পাঁচেক—"

সৈনিক দুজন উঠে দাঁড়াল। দেখাদেখি ওরা তিনজনও উঠে দাঁড়াল। আকাশে অসংখ্য তারা ফুটে উঠেছে, তারই আলোয় ব্রহ্মপুত্রের বুকটা চিক্‌চিক্ করছে। শিরশির ক'রে হাওয়া দিচ্ছে—অপর পারের ফেরীঘাট থেকে অস্ফুট গুঞ্জন ভেসে আসছে। সৈনিকটি বললে, "তাহলে আমরা চলি—"

অমল লাশটিকে দেখিয়ে বললে, "আর একে—"

"ওঃ", বলে সৈনিকটি তার সাথীকে ডাকলে, "আয় রে—" তারপর দুজনে নীচু হয়ে লাশটাকে টেনে ফেলে দিল। ব্রহ্মপুত্রের জলে ঝপাৎ ক'রে একটা শব্দ হলো মাত্র ………

ইভ্যাকুয়ির ভিড় বেড়েই চলেছে, প্রতিদিনই আসছে দলে দলে। এসে জমা হচ্ছে স্টেশনে, ওয়েটিং রুমের চালার তলায়, বাজারের আনাচে কানাচে, কোন একটু আচ্ছাদনবিশিষ্ট জায়গার রন্ধ্রে রন্ধ্রে—এসে জমা হচ্ছে আবর্জনার স্তূপের মতো। ভিড় যত বাড়ছে, মৃত্যুর সংখ্যা ততই বাড়ছে। মৃতদেহ যখন দুচারটে হতো, তখন স্টেশনের ধাঙ্গড়-মেথর সেগুলোকে টেনে নদীতে ফেলে দিত। মৃত্যুর সংখ্যা যখন দিনপ্রতির সংখ্যা ছেড়ে ঘণ্টাপ্রতির সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে, তখন ধাঙ্গড়-মেথরের দল বেমালুম উধাও হয়ে গেছে। ঝাঁটপাট দেওয়ার জায়গা নেই, পরিষ্কার করার মতো পরিসর নেই—কাজেই তাদের ছুটি। মরা-মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যেখানে সেখানে—তার ওপর বৃষ্টি পড়ছে, রোদ লাগছে, ফুলে ফেঁপে উঠছে শবদেহ। প্রথম প্রথম চিল-শকুন জীবন্ত মানুষের কাছাকাছি আসতে ভয় পেত, কিন্তু এখন তারা নির্ভয়ে এসে ভোজে বসে যায়।

কোম্পানি-অর্ডারে হুকুম জারি হয়েছে—স্টেশন, বাজার আর ফেরিঘাট আউট-অফ-বাউণ্ডস—ইভ্যাকুয়িদের মধ্যে কলেরা লেগেছে। কোম্পানির ছেলেদের ওই এলাকায় যাওয়া, ওখান থেকে কোন জিনিস কিনে খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। বেলা তিনটের সময় ইনঅকুলেশন প্যারেড—ক্যাম্পের প্রত্যেকটি ছেলেকে এ্যান্টি-কলেরা ইনজেকশন নিতে হবে।

অমল কিন্তু ভেবেছিল অন্য রকম। তার মনে হয়েছিল, কোম্পানির প্রতিটি স্পেয়ার ছেলে যদি ফেরিঘাটে আর স্টেশনে গিয়ে ইভ্যাকুয়িদের ষ্টিমার থেকে নামতে আর ট্রেনে উঠতে সাহায্য করে, তাহলে বোধহয় নিছক ঠেলাঠেলি আর দৌড়াদৌড়ি ক'রে মরার হাত থেকে অনেকগুলো মানুষকে বাঁচাতে পারে। আর সেইটাই তো সৈনিকের কাজ!

কোম্পানি-অর্ডার শুনে অমলের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। স্টেশনে সে যাবেই, তাতে তার যাই হোক। দুর্দশা আর মৃত্যুর বিরুদ্ধে মানুষের এই সংগ্রাম তার কাছে নতুন এক দুনিয়াকে মেলে ধরেছে। সে কেবল দেখছে মানুষ—এত রকমের, এত বিভিন্ন ধরনের মানুষ সে আর কখনো দেখে নি! তার কলেজী শিক্ষার ছকে ঢালা মানুষ এরা নয়! এরা জীবন্ত, এরা গতিশীল। সে আরও দেখছে, এই মানুষগুলো কেমন ক'রে বাঁচে। আঘাতে আঘাতে চুরমার হয়ে গিয়েও এরা মরে না, মরতে জানে না! কিন্তু কোথায় এদের প্রাণশক্তি!

ওয়েটিঙ রুমের চালার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে অমল ছোট একটি দলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, একজন সধবা মহিলা, একজন প্রৌঢ়া বিধবা আর একটি ছোট মেয়ে। অমল আন্দাজ ক'রে নেয় কে কি—ভদ্রলোক,

তার স্ত্রী,তার মা আর তার মেয়ে। বাঃ, এমন সম্পূর্ণ একটা পরিবার এ-ক'দিনের মধ্যে তার চোখে পড়ে নি ! সব সময়েই সে দেখছে, ভাঙা ভাঙা টুকরো টুকরো ছন্নছাড়া সংসার।

ভদ্রলোক বলছেন, "দুধ ! তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি ? এক ফোঁটা খাবার জল যেখানে পাওয়া যায় না, সেখানে দুধ কোথায় পাব ?"

সধবা মেয়েটিকে কোলের ওপর টেনে নিয়ে তার চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন, "কিন্তু মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে তো। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে যখন এনেছি, তখন যে কোন উপায়ে হোক, ওকে বাঁচাতেই হবে। না হলে মিনু আমার স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাবে না।"

অমল কথাগুলো সবই শোনে। কোন কিছু না ভেবে ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বললে, "একটু যদি অপেক্ষা করেন, আমি কিছু টিনের দুধ, পাউরুটি আর চিনি এনে দিতে পারি।"

চমকে উঠে ভদ্রলোক অমলের একটা হাত খপ করে চেপে ধরলেন, এত জোরে যে, অমলের হাতটা টনটন ক'রে উঠল। অমল বললে, "বেশ তো, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন—"

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে-বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই চলুন—"

ছোট মেয়েটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার ক'রে উঠল, "না, কিছুতেই যেও না—আমি কারও দয়া চাই না।"

অমল মেয়েটির দিকে ফিরে চায় ! মেয়েটি কোল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে—তার কোটরে ঢোকা চোখগুলো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে—নাকটা ফুলে উঠেছে। ভদ্রমহিলা তাকে টেনে বসাতে চেষ্টা করছেন।

ভদ্রলোক অমলের পিঠের ওপর হাত রেখে বললেন, "কিছু মনে করবেন না ওর কথায়। বছর দশেক বয়েস, কি দুর্ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে যে ওর জীবন চলেছে, সে বোধহয় আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। মানুষের স্নেহ-ভালোবাসার ওপর ওর আর একতিলও বিশ্বাস নেই।"

অমলেরও একথা বহুবার মনে হয়েছে। সে দেখেছে, স্নেহ-প্রেম, ভালোবাসা বলে কোন প্রবৃত্তি যেন এই জগৎটায় নেই—সেসব যেন বইয়ে পড়া নিছক নীতিবাক্য ! সেই বর্বর যুগের বাঁচার প্রেরণা নিয়ে কতকগুলো আদিম মানব যেন আজ এক জায়গায় জড় হয়েছে। সে দেখেছে, কত মৃত্যু, কত কষ্ট ! তবু তো কারও চোখে কান্না আসে না—মানুষে বুঝিবা কাঁদতে ভুলে গেছে ! প্লাটফরমে যখন গাড়ী লাগে, ইভ্যাকুয়ির দল সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

স্বামীকে ফেলে স্ত্রী আগেভাগে উঠে বসে, মাকে ফেলে ছেলে নিজের জায়গা করে নেয়, সন্তানকে ফেলে মা-বাপ জায়গা খুঁজে নেয়। কারও জন্যে কারও দায়িত্ব নেই, নিজেকে ছেড়ে অন্য কারও কথা চিন্তা করার অবসর নেই। শুধু বেঁচে থাকা! যে কোন উপায়েই হোক প্রাণটাকে ধরে রাখা!

অমল জিজ্ঞেস করলে, "মেয়েটিকে কোথায় কুড়িয়ে পেলেন?"

"না না কুড়িয়ে পাইনি, ভগবান আমাদের দিয়েছেন, আমরা মহা ভাগ্যবান মশাই। ওঃ, সে এক বিরাট কাহিনী—"

স্টেশন ছেড়ে বাজারের মধ্যে দিয়ে ক্যাম্পের দিকে ওরা চলেছে। ভদ্রলোক গুম হয়ে আছেন। অমল বারকয়েক তাঁর দিকে ফিরে চাইলে। কয়েকটা ঢোক গিলে ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন, "২৩শে ডিসেম্বর রেঙ্গুনে বোমা পড়ল—শুধু বোমা নয়, তার উপর আবার মেশিন গান। বহুলোক মারা গেল। আমার ছোট ভাই কাজ করত একটা ব্যাঙ্কে, হতভাগা বোমার আওয়াজে বাইরে বেরিয়ে প'ড়ে রাস্তায় ছুটাছুটি করতে করতে মেশিন গানের গুলিতে প্রাণ হারাল—বেচারা বোধহয় আমার খোঁজে বেরিয়েছিল। তার লাশ আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু ছেলেদুটো সেই যে স্কুলে গেল, আর ফিরল না। আট বছর আর বারো বছরের দুটি ছেলে স্কুল বিল্ডিং চাপা পড়ে মরল।

"বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেল—এখনই বর্মা থেকে পালিয়ে চল। বিরাট কাঠের কারবার ফেঁদেছিলাম, অগাধ পয়সা করেছিলাম, তাই ফেলে আর আসতে পারছিলাম না। আরও দিনকয়েক না দেখে চলে আসতে মন সরছিল না। ভাবলাম, ব্রিটিশ জাত, যার রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না, সে কি আর বর্মা রক্ষে করতে পারবে না! বিশ্বাস ছিল, বন্দোবস্ত একটা হবেই। কিন্তু কোথায় কি! এই শুনলাম জাপানীরা টেনাসেরিমে নেমেছে, তারপরই শুনি ট্যাভয় দখল করেছে—হু-হু করে এগিয়ে আসছে মৌলমিনের দিকে। আটকাবার কোন ব্যবস্থাই নেই, তার ওপর আবার শুনলাম মিলিটারী সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। জাপানীরা যখন-তখন যেখানে-সেখানে বোমা ফেলছে, একেবারে ছাদ পর্যন্ত নেমে এসে মেশিন গান চালাচ্ছে—মানুষ মরছে ঝাঁকে ঝাঁকে। রেঙ্গুন শহর লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল—আমার কাঠের গোলাতেও আগুন লাগল।

"ভেবেছিলাম শেষ দেখে যাব। অনেক কষ্টে মানুষ হয়েছিলাম। তাই ঠিক করেছিলাম, অমন ফলাও কারবার ফেলে পালাব না। আসুক জাপানীরা, তাদের রাজত্বেই বাস করব। আমাদের কাছে ব্রিটিশ আর জাপানীতে তফাতটা কোথায়? আমার কারবারটা চালু থাকলেই হলো। ভাবতাম, দুটো ছেলে

মরেছে, তাতে কি হয়েছে। আরও দুটো কেন, দশটাও হতে পারবে—বয়েস আমার এমন কিছু বেশি নয়। কিন্তু অমন কারবার কি আর কোনদিন ফাঁদতে পারব! কিন্তু সে কারবারও গেল, একেবারে পথের ভিখিরী হলাম।

"রেঙ্গুন থেকে কিছুদূরে আসার পর ট্রেনের ওপর বোমা পড়ল। যথাসর্বস্ব ট্রেনের মধ্যে ফেলে রেখে, কেবল গহনা আর নগদ টাকা কোঁচড়ে বেঁধে রাস্তায় নামলাম। তখন আমরা চারজন—আমি, মা, আমার স্ত্রী আর মিনু, আমার ছ-বছরের মেয়ে। রাস্তা হাঁটতে শুরু করলাম। ট্রেনে বোমা পড়ার পরও যারা মরে নি, তাদের সঙ্গে হেঁটে এসে সদর রাস্তায় উঠলাম। সদর রাস্তায় এসে দেখি, যতদূর চোখ যায়, কেবল মানুষের মাথা। মনে বল পেলাম, এত লোক যখন হাঁটছে, তখন আমরাই-বা পারব না কেন! হাঁটছি তো হাঁটছিই—রাস্তার দু-ধারে কেবল মড়া আর তার পচা দুর্গন্ধ। চলতে চলতে একটা গ্রামের ধারে এসে ভাবলাম, ওই গ্রামে ঢুকে একটু বিশ্রাম করব। কিন্তু বর্মিরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রামের রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। গ্রামের মুখ ছেড়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার পর, বর্মি ডাকাতরা আমাদের ওপর হামলা করল। আমার স্ত্রী গহনার পুঁটলিটা তাদের হাতে তুলে দিলেন—অন্তত দশ-বারো হাজার টাকার গহনা।

"ডাকাতের খপ্পরে যারা পড়ল, তাদের অনেকেই খুনজখম হলো, আর আমরা পাশ কাটিয়ে চলে এলাম। মাঝে মাঝে জাপানী প্লেনের ঝাঁক উড়ে আসে, খুব নীচে নেমে এসে মেসিন গান থেকে কয়েক পশলা গুলি চালায়। যাদের গায়ে গুলি লাগে, তারা প'ড়ে চেঁচাতে থাকে। যারা অক্ষত থাকে, তারা মাটি থেকে উঠে, গা ঝেড়ে আবার হাঁটতে শুরু করে। আটদিন ধরে পথ হাঁটার পর মান্দালয়ে এসে পৌছলাম। সেখানেও ওই একই অবস্থা—বিশ্রাম আর নেওয়া হলো না। পথে খাওয়া বলে কিছুই হয় নি, মাঝে মাঝে কাঁচা চাল চিবিয়েছি। নালা-নর্দমা থেকে জল খেয়ে তেষ্টা মিটিয়েছি। ঘুম যে কি জিনিস, তা প্রায় ভুলে গেছি! এরপর মিনু পেট নাবালো, ধীরে ধীরে সে দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল—মাটিতে নামিয়ে দিলেই তার পা কাঁপতে থাকে। কিন্তু আমরাও তো আর বইতে পারি না—ছ-বছরের মেয়ে, সে-ও তো এক বিরাট বোঝা! অনেকবার ভেবেছি, ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে পথের ধারে শুইয়ে দেব। এমন তো প্রায় সকলেই করছে।

"শেষ পর্যন্ত মিনুর বোঝাও লাঘব হলো—রাস্তার ধারে পায়খানা করতে গিয়ে সে একেবারে এলিয়ে পড়ল। মানুষের স্রোত এগিয়ে চলেছে—অপেক্ষা করার অবসর নেই। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, মিনুর শেষ

নিঃশ্বাসটির জন্যে। মিনু ধীরে ধীরে নিঝুম হয়ে পড়ল, চোখ তার বোজা—মুখের দিকে চেয়ে থাকলে বোঝাই যায় না, তার নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা। আর অপেক্ষা করা যায় না, সঙ্গীর দল অনেকখানি এগিয়ে গেছে—আমাদের দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই! আমি উঠে দাঁড়ালাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীও—আবার আমরা যাত্রীদলে মিশে গেলাম। বারবার মনটা খোঁচা দিয়ে উঠেছে, নাড়িটা একবার টিপে দেখলে হতো! কিন্তু দেখি নি যে ইচ্ছে ক'রে, পাছে নাড়িটা তখনও টিপ টিপ করে—"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অমল ভদ্রলোকের মুখের দিকে ফ্যালফ্যালে ক'রে চেয়ে থাকে—আতঙ্কে তার শরীর কাঠ হয়ে যায়—মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, "এ্যাঁ, মিনু তখনও বেঁচে ছিল?"

ভদ্রলোক মাথাটা নীচু করলেন।

মুহূর্তের মধ্যে অমলের চোখের ওপর ভেসে ওঠে তার ছোট বোন রিণির চেহারা। মিনুর জায়গায় রিণির কথা মনে হতেই তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে—প্রাণপণে সে হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে।

ক্যাম্পের পেছনে ধাঙড় বস্তিটার আড়ালে ভদ্রলোককে দাঁড় করিয়ে অমল বেড়া টপকিয়ে ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকল। স্টোর টেন্টের সামনেই বসে রয়েছে কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার ভট্চায। অমল গিয়ে দাঁড়াতেই বললে, "এখন আর কোন জিনিস ইস্যু হবে না—স্টোর বন্ধ হয়ে গেছে।"

অমলের নজরে পড়ল, তাঁবুর ভেতরে বসে স্টোরের অর্ডারলি গুটি চারেক কমলালেবু রস করছে। আমতা আমতা ক'রে সে বললে, "আমি এসেছিলুম একজন বাঙালী ইভ্যাকুয়ি ভদ্রলোকের জন্যে কিছু দুধ, পাউরুটি আর চিনি চাইতে। ভদ্রলোককে ক্যাম্পের পেছনে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। অন্তত কিছু জিনিস আপনাকে দিতেই হবে—না হলে ভদ্রলোকের মেয়েটি মারা যাবে—"

হাবিলদার ভট্চায মিটমিট ক'রে চেয়ে বললে, "তাই বলুন, তা নইলে ইভ্যাকুয়ির ওপর এত দরদ কেন! জিনিস দিতে পারি একটি শর্তে। আমাকেও ভাগ দিতে হবে।"

"ভাগ! কিসের ভাগ?"

"ওঃ, একেবারে যে আকাশ থেকে পড়লেন মশাই! ভাগ কিসের তাও বুঝি বোঝেন না। যে মেয়েটিকে দুধ-রুটি খাওয়াতে চলেছেন, সেই মেয়েটির ভাগ।"

অমল বিস্ময়ে হাঁ ক'রে হাবিলদার ভট্চাযের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হাবিলদার ভট্‌চায বললে, "ভাবছিলেন বুঝি, সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার, আর শিবের বাবাও টের পাবে না! আরে মশাই, এরকম দুধচিনি আমি রোজই রাত্রে দিচ্ছি। যাক, তা কোথায় জায়গা ঠিক করেছেন? ওই অসমীয়া লোকটার চায়ের দোকানটায় তো?"

তখনো অমল সেই একইভাবে হাবিলদার ভট্‌চাযের মুখের দিকে চেয়ে আছে। সমস্ত ব্যাপারটাকে বোঝবার সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

হাবিলদার ভট্‌চায বললে, "কি মশাই, গালে মাছি ঢুকে গেল যে! এ কারবারে এই হাতেখড়ি বুঝি? আরে মশাই ঘাবড়াবার কিছুই নেই, আমাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না, তাহলে সমস্ত ম্যানেজ হয়ে যাবে।"

স্টোরের অর্ডারলি কাঁচের গ্লাসে কমলালেবুর রস এনে হাবিলদার ভট্‌চাযের হাতে দিলে। হাবিলদার ভট্‌চায তাকে বললে, "দাওতো হে এই বাবুকে একটা হাফ-পাউণ্ড পাউরুটি, এক টিন পাতলা দুধ আর খানিকটা চিনি—" গ্লাসে কয়েকটা মৃদু চুমুক দিয়ে অমলকে বললে, "কিন্তু সাবধানে নিয়ে যাবেন মশাই, ওই শালা কেলে মানিক যদি দেখে, তাহলে আর রক্ষে রাখবে না। ও শালার যত রোখ এই আপনার আমার ওপর, অথচ ওঁর ব্যাটম্যানটি দিনে অন্তত দশবার আসছে—এই ঘি-ময়দা দাও, সাহেব লুচি খাবেন—দুধচিনি দাও, সাহেবের পায়েস খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে—সে কত বায়নাক্কা—" আবার গোটা-কয়েক চুমুক দিল কমলালেবুর রসে, আরামে চোখ দুটো তার বুজে আসে!

অর্ডারলি জিনিসগুলো একটা কাগজে মুড়ে নিয়ে এলো। হাবিলদার ভট্‌চায বললে, "নিয়ে যান, আর সময়মত আমাকে ডেকে নিয়ে যাবেন।"

অমল বললে, "আমি যে মেয়েটির কথা বলছি, তার বয়েস দশ বছর।"

সঙ্গে সঙ্গে হাবিলদার ভট্‌চায বলে ওঠে, "ওঃ, তাহলে বুঝি অন্য রফা হয়েছে? তা কত টাকায় হলো?"

অমল শক্ত গলায় বললে, "না, কোনরকম রফাই আমি করি নি। দেখলাম মেয়েটির অবস্থা খারাপ, তাই ভদ্রলোককে সঙ্গে ক'রে এনেছিলাম—"

"অবস্থা ভালো ওই ইভ্যাকুয়িদের মধ্যে আর কারই-বা? তা বলে আপনি স্টেশনসুদ্ধ লোককে ক্যাম্পে এনে হাজির করবেন! আরে মশাই এটা হলো লড়াইয়ের মাঠ, এখানে ওসব সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার চলে না। জানেন ওই ইভ্যাকুয়িদের কাছে হাজার হাজার টাকার বর্মা নোট আছে। এক টাকার জিনিসের জন্যে একটা দশ টাকার নোট ওরা অম্লান-বদনে দিয়ে দেবে। আপনি যা জিনিস দিচ্ছেন, তার জন্যে পঞ্চাশ টাকা ওই ভদ্রলোক হাসিমুখে দেবে।

আমাকে অন্তত কুড়িটা টাকা দিতে হবে।"

অমল বললে, "না, থাকগে। জিনিস আমার চাই না—ওভাবে টাকা আমি চাইতে পারব না।"

"কিন্তু সে ভদ্রলোক তো ক্যাম্পের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন?"

"আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে না হয় চলে যাবেন।"

"ওই তো মশাই আপনাদের বোকামি। আরে মশাই, দুনিয়ায় চোখ মেলে চলতে শিখুন। এমন একখানা টিপস দিলুম, অনায়াসে টু-পাইস করতে পারতেন। তা না, ভালমানুষি আপনাদের আর যেতে চায় না। যাক, ভদ্রলোককে যখন ডেকেই এনেছেন, এবারকার মতো নিয়ে যান। কিন্তু মনে রাখবেন, গ্রাটিশে কারবার বড় একটা আমি করি না।"

রবিবারের সকালবেলা—ছুটির দিন, অর্থাৎ পি. টি. প্যারেড বন্ধ—নিতান্ত জরুরী ফেটিগ ছাড়া অন্য সবরকম কাজও বন্ধ—বিস্তারা ড্রেসিং না করলেও কেউ চোখ রাঙাবে না। ঘুম ভেঙে উঠে প্রথম কাজ চা খাওয়া। অমলকে এক মগ চা এনে দিয়ে অনন্ত তার পাশ ঘেঁষে বসল। অমল বললে, "কি অনন্ত, কিছু বলবে নাকি?"

অনন্ত বললে, "হ্যাঁ, সেদিন তোমায় যে কথাটা বলব বলেছিলুম, সেই কথাগুলো না বলে আর পারছি না—"

শিবেন মগ হাতে এসে উপস্থিত হলো, তার পেছনে এলো সুনীল। অনন্ত চাপা গলায় অমলকে বললে, "এখন থাক—"

পাঁচকড়িকে দেখা গেল মাঠের মধ্যে। অমল বললে, "পাঁচকড়িকে ডাকা যাক—শোনা যাবে মণিপুরের হালচাল কি রকম।"

বোঁচকাবুচকি নামিয়ে রেখে বসতে বসতে পাঁচকড়ি বললে, "ও, এই ইভ্যাকুয়িগুলোর অবস্থা আর চোখে দেখা যায় না!"

জয়ন্ত এসেছে পাঁচকড়ির পেছন পেছন, সে বলে উঠল, "ওদের অবস্থাটা তো কেবল দেখবার জিনিস নয়, ওটা বোঝবারও জিনিস।"

সুনীল বললে, "আমি তো বুঝি না, বর্মা থেকে পালিয়ে এসে রাস্তায় ঘাটে এভাবে কুকুর-বেড়ালের মতো মরবার কি দরকার পড়েছিল!"

শিবেন বললে, "তা ছাড়া আর কি! জাপানীরা কিছু বলত না। হাজার হোক তারা এশিয়ার লোক, এদের কুকুর-বেড়াল মনে করত না।"

অনন্ত বললে, “তা তো বটেই ! ব্রিটিশের তরফে থেকে মরছে কুকুরের মতো গুলি খেয়ে—আর জাপানী তরফে থাকলে মরত বেয়নেটের খোঁচায় ইঁদুরের মতো। মরতে যখন হতোই, তখন আর পালিয়ে আসার কি দরকার পড়েছিল !”

অমল বললে, “জাপানীরা কিছু বলত না, এ গল্প বলে আর লাভ নেই। কাল ইভ্যাকুয়ি এক ভদ্রলোক বললেন, জাপানীরা শুধু শহরে বোমা ফেলে না—রাস্তা দিয়ে যে সমস্ত ইভ্যাকুয়ি হেঁটে আসছে, তাদের ওপর মেশিন গানও চালায়।”

সুনীল বলে উঠল, সে তো চালাবেই, আর চালানোই উচিত। তারা এলো এদের ব্রিটিশের খপ্পর থেকে উদ্ধার করতে, আর এ শালারা কিনা কুকুরের মতো ব্রিটিশ প্রভুর পেছন পেছন পালিয়ে আসছে।”

জয়ন্ত বললে, “তুমি কেবল এদের পালিয়ে আসতেই দেখলে সুনীল ! কিন্তু বুঝলে না, কেন এরা পালিয়ে আসছে। এরা সকলেই সাধারণ মানুষ, নিজের জীবন ছাড়া আর কোন পুঁজি এদের নেই, নিজেকে বাঁচাবার মতো কোন ব্যবস্থাও এদের হাতে নেই। কাজেই পালিয়ে আসা ছাড়া আর কি এরা করতে পারে বলো ? বিদেশী আক্রমণকারীকে শত্রু না ভেবে বন্ধু মনে করার মতো কূট রাজনৈতিক জ্ঞান যে এদের নেই !”

সুনীল ফোঁস ক'রে উঠল, “ওই তো তোমার দোষ জয়ন্ত। তোমার কেবল বড় বড় কথা—সাধে কি আর মেজর রায়ের কাছে মার খেয়েছিলে !”

জয়ন্তর মুখখানা লাল হয়ে ওঠে। অমল অস্বস্তি বোধ করে, অনন্ত বিরক্তি-ভরে সুনীলের দিকে চায়। জয়ন্ত বললে, “তুমি ভুল করলে সুনীল, বড় কথা আমি একটাও বলি নি। আমি বলেছি সরল সাধারণ মানুষের প্রাণের কথা। আমি এই কথাই বলতে চেয়েছি যে, আজ যদি আমি হঠাৎ লাঠিসোটা নিয়ে তোমার বাড়ীতে চড়াও হই, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে সুহৃদ মনে করবে না। আর ওই যে বললে, মেজর সাহেবের হাতে মার খেয়েছি—ওতে আমার অপমান হয় নি, আমার গৌরব বেড়েছে। অত্যাচারীকে অত্যাচারী বলার মতো সৎসাহস আমার আছে—তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো শক্তি আমার আছে—”জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল।

পাঁচকড়ি বললে, “আরে, তা তুমি যাচ্ছ কোথায় ?”

জয়ন্ত যেতে যেতে বললে, “না ভাই, এরপরও আমি থাকলে তোমাদের আড্ডাটাই মাটি হয়ে যাবে।”

অনন্ত বললে, “তোমাদেরই তো দোষ সুনীল। তুমি কেন ফট ক'রে

পার্সোন্যাল এ্যাটাক ক'রে বসলে ?"

সুনীল বললে, "আমি ওর ওই চ্যাটাং চ্যাটাং বুলিগুলো কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।"

ক্যাম্পের গেট দিয়ে খগেনকে ঢুকতে দেখে পাঁচকড়ি চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে, ও খগেন, এদিকে আয় রে। শুনি তোর হালচালটা কি ?" খগেন এসে পৌছলে বললে, "মণিপুরে দেখলাম, তুই আমার একদিন আগে বেরিয়েছিস—কোন ট্রেন নিয়ে এলি ?"

পিঠ থেকে প্যাকটা খুলতে খুলতে খগেন বললে, "আর কোন ট্রেন, সেই ইভ্যাকুয়িজ স্পেশ্যাল—"

পাঁচকড়ি বললে, "আরে, আমিও তো একটা ইভ্যাকুইজ স্পেশ্যাল নিয়ে আজ ভোর রাত্তিরে ফিরেছি। কিন্তু তুই এই একটা পুরো-দিন কোথায় ডিটেনইড্ হলি ?"

একটা বিছানার ওপর শরীরটাকে ছড়িয়ে দিয়ে খগেন বললে, "আমার কথা আর বলিস নি। মণিপুরে কোলিং না করেই আমার ট্রেনটায় একটা ইঞ্জিন দিলে লাগিয়ে। ড্রাইভার খুব আপত্তি করেছিল, কিন্তু মণিপুরের ও. সি. কোয়ার্টার গার্ডের ভয় দেখিয়ে ড্রাইভারকে দিলে জোর করে ইঞ্জিনে তুলে। দল্‌দলিতে এসে সেই যে গাড়ী লুপ্-এ ঢুকল, তারপর একটি দিন আর নট্ নড়ন্‌চড়ন্। ব্যস্, ইঞ্জিনও ডেড্—"

শিবেন বললে, "তা ডেড্ ইঞ্জিনটাকে নিয়ে গিয়ে মণিপুরের ও. সি'র কাছে পেশ ক'রে দিলি না কেন ? কিছুদিন আর্. আই. খাটিয়ে দিত সায়েস্তা করে—" সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠল।

খগেন বললে, "আমাকে একটু চা খাওয়াবি মাইরি, আর যেন পারছি না ! যে কাণ্ডটা ব্রেকে ঘটল, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে !"

পাঁচকড়ি বললে, "তোর আবার কি ঘটল ! আমার কিন্তু একটা কাণ্ড ঘটেছে এই ডাউন ট্রিপে—"

খগেন বললে, "তবে তোরটাই বলতে শুরু কর—আমি ততক্ষণে একটু চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নি।"

পাঁচকড়ি বলতে শুরু করে, "আমার গাড়ী ছাড়বার কথা টোয়েন্টি ফিফটিতে ওয়েস্ট স্ট্র্যপস্ সাইডিং থেকে। রাজ্যের যত খোলা ওয়াগন দিয়েই তো দিয়েছে একটা ট্রেন ফর্ম ক'রে। তারই ওপর উঠে বসেছে ইভ্যাকুয়ির দল। টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে—লোকগুলো বসে বসে ভিজছে, কতকগুলো বমি করছে, কেউ কেউ

পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে, ঠেলাঠেলি, আঁচড়াআঁচড়ি, কামড়াকামড়ি করছে। আর মাঝে মাঝে শোন জঙ্গলের মধ্যে ঝুপ ক'রে একটি শব্দ—তার মানে, মড়া ফেলে দিচ্ছে। টোয়েন্টি ফিফটি তো কোথায়! গাড়ী ছাড়ল প্রায় অড্ আওয়ার্সে! সিগন্যাল দিয়ে ব্রেকে উঠে দেখি, একটি শাড়িপরা বর্মি মেয়ে আমার সিটে বসে।

সুনীল বলে উঠল, "তাই বল, তাহলে রসের ব্যাপার দেখছি"—সে আরও একটু পাঁচকড়ির গা ঘেঁষে বসল।

পাঁচকড়ি বলে চলেছে, "আমি ইংরেজীতে বললাম, ব্রেকভ্যানে মেয়েদের নেওয়ার আইন নেই—সে যেন পরের স্টপেজেই নেমে যায়। মেয়েটি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, আপনি বাঙালী? আমি বললাম হ্যাঁ। সে বললে, আমিও বাঙালী—মানে, আমার বাবা বাঙালী আর মা বর্মি। আবার তাকে বুঝিয়ে বললাম, কোন মতেই আমি তাকে ব্রেক ভ্যানে নিয়ে যেতে পারি না। তা সে কথা কে শোনে! সে তার নিজের কথাই বলে চলেছে—তার বাবা পথে মারা গেছেন, তার মাকে বর্মি ডাকাতেরা ধরে নিয়ে গেছে, তার আর দুটো ভাই ছিল, তারা যে কোথায় গেছে তার কোন পাত্তা নেই। আমি তো মহা ফাঁপরে পড়ে গেলাম। সামনেই লামডিং, হেড কোয়ার্টার স্টেশন, যদি কোন অফিসার বা স্টাফ দেখে ফেলে! তার ওপর মেয়েটির বয়েসটাও খারাপ এই উনিশ-কুড়ির মতন—"

সুনীল পাঁচকড়ির উরুর ওপর একটা চাপড় মেরে বলে উঠল, "তাই বলো না বাবা, বেশ একহাত লুটেছ।"

"তা আমি কি করব বলো। আমার মাথায় ওসব খেয়াল মোটেই আসে নি—ভয়েই আমি আড়ষ্ট, যদি কেউ দেখে ফেলে আর কোম্পানিতে রিপোর্ট করে দেয়! কিন্তু মেয়েটাই তো আমায় চাগিয়ে তুললে। রাঙাপাহাড় ক্রসিং পার হয়ে গেছি, গাড়ী চলেছে বেশ স্পীডে। মেয়েটি বললে, আমায় কিছু খেতে দিতে পারেন—আজ প্রায় চারদিন একমাত্র জল ছাড়া আর কিছুই পেটে পড়ে নি। আমি তো রীতিমত ভাবনায় পড়ে গেলাম, মিলিটারী গার্ডের লাইন-র‍্যাশন একটি মেয়েকে দেব কেমন ক'রে! আমাকে ভাবতে দেখে মেয়েটি বললে, চারদিনের মধ্যে অন্তত চারবারও খেতে পারতাম। কিন্তু যে উপায়ে খেতে হয়, তাতে চেষ্টা করি, যত কম বার খেয়ে পারা যায়। জিজ্ঞেস করলাম, কি উপায়ে খেতে হয়? মেয়েটি বললে, দেহের বিনিময়ে—আমার বয়েসটা কাঁচা বলে বোধ হয় কেউই বিনা প্রতিদানে খেতে দিতে চায় না। কিন্তু আর যেন পারছি না, গাড়ীর ঝাঁকানিতে পেটের ভিতর মোচড় দিচ্ছে, গা বমিবমি করছে।

"এই কথা শোনার পর মেয়েটিকে ভালো ক'রে দেখার লোভ আর সামলাতে পারলাম না। চোখ কুঁচকে সামনের দিকে চেয়ে দেখি মেয়েটি দুহাতে পেটটাকে চেপে ধরে কুঁকড়ে বসে আছে। তাড়াতাড়ি আমি প্যাক খুলে তার মধ্য থেকে পাঁউরুটি আর চিনির কৌটো তার সামনে রেখে, ছিপি খুলে ওয়াটার বটল্‌টা এগিয়ে দিলাম। আলোটা ঘুরিয়ে দিলাম তার মুখের দিকে। দেখলাম চোখ দুটো তার বসে গেছে, গাল শুকিয়ে গেছে, চুল রুক্ষ, তবুও যেন বেশ পরিপাটি ভাব। মেয়েটি অল্প অল্প ক'রে খাচ্ছে, ধীরে ধীরে, অনেকক্ষণ ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে।

"দলদলিতে সিগন্যাল দেখিয়ে আমার জায়গায় এসে বসলাম। চুপচাপ থাকতে কেমন যেন বিশ্রী লাগছিল। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায় যাবেন? বললে—চট্টগ্রামে, সেখানেই আমার বাবার দেশ। এর আগে খুব ছেলেবেলায় একবার এসেছিলাম বাবার সঙ্গে। এবার যাচ্ছি একা, বাবা সঙ্গে নেই, তার ওপর আমিই গিয়ে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দেব। দেখি কাকারা কি বন্দোবস্ত করেন!

"খাওয়া শেষ ক'রে মেয়েটি বললে, আর না, আপনার জিনিসপত্তর তুলে রাখুন—এতক্ষণে যেন শরীরটা ভালো লাগছে। জিনিসপত্তর সব গোছগাছ ক'রে তুলে রেখে দেখি, মেয়েটি দেয়ালে মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে রয়েছে। আর কিছু না বলে, আমার বিছানাটা পেতে দিয়ে বললাম, আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন, লামডিঙে আপনাকে ডেকে দেব'খন।

"দ্বিরুক্তি না ক'রে মেয়েটি শুয়ে পড়ল। আলোটিকে দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে রেখে বাইরে মুখ ক'রে বসলাম। তখন আমার ট্রেন নায়লালং পাস করছে। বরাত আমার নেহাতই ভালো, ল্যাঙচোলিয়েটও পার হয়ে গেলাম। কিন্তু বারলঙফার পার হওয়া—বৈতরণী পার হওয়ার চেয়েও দুঃসাধ্য ব্যাপার! বারলঙফারে ট্রেন ইন করল লুপ লাইনে, বুঝলাম কপাল পুড়েছে। লামডিঙে পৌছনোর জন্যে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। হাতবাতিটা নিয়ে উঠলাম টিবির ওপর স্টেশনে। স্টেশন মাস্টার বললে, 'আরে মশাই, ড্রাইভারকে বলে দিয়ে ঘুমোন গে যান—ভোরের আগে আপনার কোন আশাই নেই। লামডিং একেবারে কনজেস্টেড—ইয়ার্ড ক্লিয়ার না ক'রে ওরা আর কোন গাড়ী নেবে না।'

"তার মানে, তিনটি ঘণ্টা হাপিত্যেশে বসে থাকতে হবে। টিবি থেকে নেমে ব্রেকের দিকে যাচ্ছিলাম। ট্রেনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনি কেবল গোঙানি আর চিৎকার। লাইনের পাশে জঙ্গলের মধ্যে ঝপ ক'রে একটা শব্দ হলো। বুঝলাম, কোন গাড়ী থেকে একটা মড়া ফেলে দিয়ে যাত্রীরা আর একটু

জায়গা ক'রে নিলে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, ব্রেকে গিয়েই বা লাভ কি! সেখানে তো আর ঘুমোবার জায়গা নেই। ফিরে গেলাম ইঞ্জিনের কাছে, ড্রাইভারের সঙ্গে খানিকটা গল্প-গুজব করলাম। তাতেও কি ছাই সময় কাটে। ভাবলাম মেয়েটি বোধহয় এতক্ষণে উঠেছে। তাহলে এইবার তাকে ব্রেক থেকে নামিয়ে একটা ওয়াগনে তুলে দেওয়া যাক—এর পরই তো লামডিং। ব্রেকে ফিরে দেখি, মেয়েটি হুবহু সেই একই ভাবে শুয়ে আছে। কেমন যেন খটকা লাগল, মরে যায়নি তো। এ রকম তো কত যায়। বেশ আছে, বসে আছে কিম্বা শুয়ে আছে—কিছুক্ষণ বাদে দেখি, মরে কাঠ হয়ে গেছে!"

খগেন মাঝখান থেকে বলে উঠল, "আরে, এবারকার ট্রিপে আমার ভাগ্যে একশালা মেজর তো এইভাবে গেল মরে। কতবার ভেবেছি, দিই শালাকে টান মেরে ফেলে, কিন্তু কিছুতেই আর গায়ে হাত দিতে পারলাম না। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ছাব্বিশটা ঘণ্টা মড়া আগলিয়ে বসে থাকার পর লামডিঙে এসে আর. টি. ও'কে বলতে তবে তারা মড়াটা নামিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু আর. টি. ও শালা যে আমার নাম নম্বর টুকে নিলে—ফাঁসিয়ে দেবে না তো?"

শিবেন বললে, "ফাঁসিয়ে দিলেই হলো আর কি! ওরকম কতশত মেজর দেখ গে-যা রাস্তা-ঘাটে পড়ে আছে, আর কাকে-শকুনে তাদের ঠুকরে খাচ্ছে। তবে কি জানিস, চলতি গাড়ী থেকে টান মেরে ফেলে দিলেই আর কোন ঝামেলা থাকত না—"

সুনীল শিবেনকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "থাক ওসব কথা। তারপর বল পেঁচো তোর কারবারটা! হাতের গোড়ায় এমন একটা মাল পেয়ে যখন তুই এত ভেবেছিস, তখন তোকে মিলিটারীতে না রেখে বাবাজীর আখড়ায় ট্রান্সফার ক'রে দেওয়া দরকার—"

সকলেই পাঁচকড়ির দিকে তাকাল। পাঁচকড়ির মুখখানা হঠাৎ যেন কালো হয়ে ওঠে, আমতা আমতা ক'রে বললে, "আমি—মানে আমার—"

আড়মোড়া ভেঙ্গে অনন্ত উঠে দাঁড়াল।

সুনীল বললে, "আরে চললি কোথায়—শেষটা শুনে যা।"

তাঁবু থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে অনন্ত বললে, "শেষ আর কি শুনব—এর শেষ আর শোনার মতো নয়—"

সকালের খানা কোন রকমে সেরে অমল একফাঁকে তারের বেড়াটা টপকিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দু'দুটো ইভ্যাকুয়িজ স্পেশ্যাল এসেছে, এতক্ষণে তার সমস্ত লোক নিশ্চয়ই পাণ্ডু থেকে আমিনগাঁও-এ এসে পড়েছে। পথ চলতে চলতে সে ভাবে, পাঁচকড়ির ব্রেকভ্যানের সেই মেয়েটি যদি এখানে আসত, সে নিশ্চয়ই তাকে চিনে নিতে পারত।

বাজারের মধ্যে দিয়ে স্টেশনে ঢোকবার পথে অমলের নজরে পড়ে একটা চায়ের দোকান। একজন অসমীয়া চা তৈরি করছে, আর তাদের কোম্পানির জনকয়েক ছেলে তার সঙ্গে কথা কইছে। তাহলে এইটিই হলো হাবিলদার ভট্‌চাযের ভাগবথরা বুঝে নেওয়ার ঘাঁটি!

দোকানে ঢুকে অমল এক কাপ চা চাইলে। ছেলেগুলোও হঠাৎ চুপ ক'রে গিয়ে একেবারে নির্বিকার হয়ে উঠল। চায়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে অমল ভাবে সেই বর্মী-বাঙালী মেয়েটি যে এখানে আসে নি, সেটা ভালোই হয়েছে— এলেই হয়তো এদের খপ্পরে পড়ত! হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগে, আচ্ছা মেয়েটি কি পাঁচকড়ির কাছে কোন আপত্তি জানায় নি! সম্পূর্ণ বিবরণটা জানার জন্যে তার ভীষণ কৌতূহল হয়েছিল, কিন্তু অতগুলো ছেলের সামনে এ প্রশ্ন করতে সাহস পায় নি।

ওয়েটিং রুমের চালার নীচে এসে অমল দেখলে, লোক কিলবিল করছে। তিল ধারণের ঠাঁই আর কোথাও নেই। কিন্তু আজকের ভিড়ের যেন একটু বিশেষত্ব রয়েছে। অধিকাংশই আহত, বেশীর ভাগ লোকের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। অমল বুঝলে, এই হলো জাপানী এ্যান্টি-পার্সোনেল বম্বের মহিমা! যন্ত্রণার গোঙানি আর আর্তনাদে জায়গাটা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

অমলের ঠিক সামনে এক ভদ্রলোক শুয়ে পড়ে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছেন আর পরিত্রাহি চিৎকার ক'রে চলেছেন: তাঁর পাশে এক ভদ্রমহিলা নির্বিকার মুখে বসে আছেন। আশপাশের লোকেরা মাঝে মাঝে বিরক্তিভরে ভদ্রলোকের দিকে কটমট ক'রে চাইছে। অমল ঝুঁকে পড়ে দেখলে, ভদ্রলোকের ক্ষতস্থানটা রয়েছে খোলা, তার ওপর ধুলোবালি পড়ছে, মাছি বসছে। সমস্ত পা'টা ফুলে যেন কলাগাছ হয়ে উঠেছে, আর তার রঙ হয়ে গেছে সিঁদুরের মতো লাল। কি করবে, কিছু ঠিক করতে না পেরে অমল ভদ্রলোকের পাশে বসে টুপি দিয়ে মাছি তাড়াতে থাকে। মহিলাটি বারেক অমলের দিকে ফিরে চাইলেন। সে চাহনি দেখে অমলের কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে—এত ঘৃণা সে আর

কখনও কোন মানুষের চোখে দেখে নি !

ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে গেঁজলা উঠতে শুরু করেছে, দেহটা কাঠ হয়ে আসছে, গোঙানি আর আর্তনাদ থেমে গেছে, পায়ের ফুলো জায়গার সিঁদুরে-লাল রঙ ধীরে ধীরে নীল হয়ে যাচ্ছে। মহিলাটি আর একবার ফিরে চাইলেন ভদ্রলোকের দিকে—তাঁর বিবর্ণ মুখখানা একেবারে উদাসীন হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি ধীরে ধীরে চলে গেলেন টিনের চালাটার বাইরে। অমল ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রয়েছে সেই আড়ষ্ট দেহটার দিকে, ভয়ে সে আবিষ্টের মতো উঠে দাঁড়িয়েছে। কিভাবে, কি-যে কোথা দিয়ে ঘটে গেল, সে যেন তখনও বুঝতে পারছে না।

কে যেন আলগোছে তার কাঁধটা চেপে ধরেছে! অমল চমকে পেছন ফিরে চাইলে। জয়ন্ত বললে, "এখানে দাঁড়িয়ে আর লাভ কি! চলুন—"

পাশ থেকে একজন প্রৌঢ় অমলকে উদ্দেশ ক'রে বলে ওঠে, "করবার আর কিছু নেই সেপাইজী, বিলকুল সাবাড়, দেখছ না ধনুষ্টংকার। যাক বাবা, বাঁচা গেল। চিংকার ক'রে কানের পোকা বার করবার জোগাড় করেছিল! আরে বাবা, চেঁচালেই কি আর বাঁচতে পারবি! কলির আয়ু যে শেষ হয়েছে—এইবার সব ধ্বংস হবে—" লোকটি একটানা বকে চলেছে।

অমল জয়ন্তকে বললে, "আপনিও এখানে আসেন নাকি? কই আপনাকে তো কোন দিন দেখি নি!"

জয়ন্ত চলতে শুরু ক'রে বললে, "আপনাকে আমি রোজই দেখি! কিন্তু আপনি থাকেন পরোপকার করার তালে, তাই আমাকে দেখতে পান না।"

অমল বললে, "আমি তো কিছুই করতে পারি না। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত এখানে এসে এদের সাহায্য করা।"

জয়ন্ত মুচকি হেসে বললে, "ওই যে ভদ্রলোকটির পায়ে বোমার স্প্লিনটার লেগে গ্যাংগ্রীন হয়ে গেল, ধনুষ্টংকার হয়ে যে লোকটি মরে গেল, আপনি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে কি করতে পারলেন? ও লোকটি ঠিকই মরে গেল। মাঝখান থেকে আপনি হয়ে গেলেন মহাপুরুষ—এইবার সেবাধর্ম আর মানবতা সম্বন্ধে গালভরা বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করবেন!"

অমল বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। জয়ন্ত যেন বড় বেশী খোঁচা দিয়ে কথা কয়! সুনীল সকালে নিতান্ত ভুল বলে নি।

জয়ন্ত বললে, "তার চেয়ে এক কাজ করুন—ঘুরে ঘুরে দেখুন, কোথায় কি ঘটছে, কেমন ক'রে ঘটছে, আর কারাই বা ঘটাচ্ছে। সেবা আপনাকে

করতে হবে না, ইভ্যাকুয়িদের দৌলতে কারবার বেশ ফলাও হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের এই কারবারীরা শকুনের মতো এসে এদের ছেঁকে ধরবে—ছুটে আসবে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে মাড়োয়ারী রিলিফ কমিটি পর্যন্ত অনেকে, লাখ লাখ টাকা নিয়ে আর হাজার হাজার ভাড়াটে সেবক নিয়ে।"

একটা ভিড়ের সামনে এসে অমল দাঁড়িয়ে পড়ে। ইভ্যাকুয়ির দল একটা দোকানের সুমুখে ঠেলাঠেলি করছে সামনে যাওয়ার জন্যে। ওরা দোকানটার পাশে এসে দাঁড়াল। দোকানটিতে এক মাড়োয়ারী একটি ক্যাশ বাক্সের পাশে টাকার থলি আর নোটের তাড়া সাজিয়ে বসে আছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে এক নেপালী দারোয়ান, একটা দো-নলা বন্দুক হাতে।

অমল জয়ন্তকে একটা ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কি ব্যাপার?"

জয়ন্ত বললে, "পূণ্য কাজ, আর্তের সেবা। বর্মা নোট এখানে অচল বলে, তার বদলে ইনি ভারতীয় নোট বিতরণ করছেন।"

অমল বললে, "ভালোই হলো। এখানকার দোকানদারগুলো বর্মা নোটের বদলে কোন জিনিস বিক্রী করতে চায় না।"

"ইনি দিচ্ছেন ফ্ল্যাট রেট—দশ টাকায় দু-টাকা।"

"আর আট টাকা?"

"বেমালুম হজম! শুধু তাই নয়, বর্মা নোট না থাকলে, যে কোন জিনিসের বদলে নগদ টাকা দিচ্ছেন। ওই দেখুন—"

একটি প্রৌঢ়া মহিলা দু-গাছা সোনার চুড়ি ক্যাশ বাক্সের ওপর রেখে বললেন, "ও বাবা, শুনছ, আমায় পঞ্চাশটা টাকা দিয়ো বাবা—দু-গাছা চুড়িতে পাকা দু-ভরি সোনা আছে।"

মাড়োয়ারীজী জলদগম্ভীর স্বরে বললে, "বিশ রূপয়া—" বলেই দুখানি দশ টাকার নোট তাঁর হাতে দিলে। নোট দুটি দিয়ে ক্ষণেকের জন্যে নাড়াচাড়া ক'রে আবার ক্যাশ বাক্সের ওপর রেখে দিয়ে মহিলাটি বললেন, "না বাবা, কুড়ি টাকায় দিতে পারব না, তুমি আমার চুড়ি ফেরৎ দাও—"

চুড়ি দু-গাছা ততক্ষণে ক্যাশ বাক্সের মধ্যে চলে গেছে। মাড়োয়ারীজী অভ্যর্থনার হাসি হেসে পরের লোকটিকে বললে, "বলিয়ে—আপকো—"

মহিলাটি চটে উঠেছেন, "আমার চাই না টাকা। ওরে বাবা, এ যে ডাকাত রে বাবা, করকরে দু-ভরি সোনার জন্যে দিচ্ছে কি-না কুড়ি টাকা!"

পরবর্তী লোকটি তার শেষ সম্বল পাঁচখানি দশ টাকার বর্মা নোটের বিনিময়ে একটি ভারতীয় দশ টাকার নোট নিয়ে চলে গেল। তার পরের লোকটি

এগিয়ে গেল ক্যাশ বাক্সের দিকে।

মহিলাটি ততক্ষণে ক্ষেপে গেছেন, সামনের লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মাড়োয়ারীটির হাত চেপে ধরলেন, "ভালো চাও তো আমায় পঞ্চাশ টাকা দাও বলছি, না হয় আমার চুড়ি ফেরৎ দাও। নইলে আমি এখানে কুরুক্ষেত্তর করব। জানো আমার ছেলে দারোগা, আসছে সে পেছনেই। সে এলে তোমাকে ফাঁসিতে লটকিয়ে তবে ছাড়ব—"

মাড়োয়ারীজীর মুখে কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। তার স্বভাব-সুলভ স্মিতহাস্যে আর একখানি পাঁচটাকার নোট মহিলাটির হাতে গুঁজে দিয়ে মৃদু কণ্ঠে হাঁকল, "বাহাদুর—"

বন্দুকধারী নেপালী দারোয়ান মহিলাকে বন্দুকের বাট দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বললে, "টুম ডাকা মারনে মাঙটা হ্যায়—চলো—ভাগো—" ভিড়টা দুদিক দিয়ে ফাঁক হয়ে যায় আর বন্দুকধারী নেপালী দারোয়ান ঠেলতে ঠেলতে মহিলাকে ভিড়ের বাইরে বার ক'রে দিয়ে আসে। মহিলা তখনও তাঁর দারোগা ছেলের উল্লেখ ক'রে একটানা চেঁচিয়ে চলেছেন।

অমল হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে যায়। জয়ন্ত তাকে খপ ক'রে ধরে ফেলে বললে, "যাচ্ছেন কোথায় ?"

"ওই মাড়োয়ারীটার কাছে—এভাবে দিনে ডাকাতি চলতেই পারে না।"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু ডাকাত আপনি বলছেন কাকে! খবর নিয়ে দেখুন, এই লোকটি হয়তো লাখ লাখ টাকা দান করে সমস্ত অনাথ-আশ্রমে, হাস-পাতালে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, শত শত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে। এর দানে কত গরীব-আতুর আজও খেতে-পরতে পায়। হয়তো এর মহানুভবতায় প্রীত হয়ে সরকার বাহাদুর এঁকে 'স্যার' টাইটেল দিয়ে ভূষিত করেছেন। এঁরাই তো আমাদের সমাজের মাথা—"

অমল চেঁচিয়ে উঠল, "কিন্তু লোকটা যে একটা জলজ্যান্ত ঠগ—"

জয়ন্ত অমলের হাত ধরে ভিড় থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললে, "এমনই একটা সত্যি কথা আমি বলেছিলাম মেজর সাহেব সম্বন্ধে। তার ফল কি হয়েছিল তা বোধহয় আপনার মনে আছে। আর আমার এই নির্বুদ্ধিতার জন্যে আপনাদের সকলের সামনে সুনীল আজ সকালে আমাকে যা বলেছিল, তাও নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। আপনারা হয়তো আমার জন্যে দুঃখিত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিবাদ করা দরকার মনে করেন নি।"

সংকোচে আর লজ্জায় এতটুকু হয়ে গিয়ে অমল অপরাধীর দৃষ্টি মেলে ধরে

জয়ন্তর মুখের ওপর।

জয়ন্ত অমলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বললে, "এখন বুঝতে পারছেন বোধহয়, মেজর সাহেবকে অত্যাচার করবার অধিকার দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ, সেই অধিকারকে মুখ বুজে মেনে নিচ্ছে সুনীলের মতো উচ্চাভিলাষী মানুষ আর সহায়তা করছে আপনাদের মতো সৎ আর শান্তিপ্রিয় মানুষের দল। তেমনি এই মাড়োয়ারীটিকে অবাধ লুঠের অধিকার দিয়েছে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, সেই অধিকারকে কার্যকরী করছে আপনার মতো মানবতার পূজারী সেবকের দল, আর সহায়তা করছে যত ধর্মভীরু, অজ্ঞ মানুষের দল।"

সাত

সেদিনকার সেই 'বুকে আগুন জ্বলার' কথা বলে ফেলার পর থেকে অনন্ত তার জীবনের মর্মান্তিক ইতিহাস অমলের কাছে বলার জন্যে ছটফট করেছে। সৈনিক জীবনের আওতায় আসার পর থেকে তার ফেলে-আসা জীবনটা বারবার তাকে খোঁচা দিয়েছে। মিলিটারী ব্যবস্থার নগ্ন চেহারা যত বেশী ক'রে সে দেখেছে—ততই সে এই ব্যবস্থাকে নিছক একটা জুলুম বলে সাব্যস্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু তখনই নিজের কাছে নিজেকেও যেন অপরাধী বলে মনে হয়েছে। লীলার সঙ্গে যে ব্যবহার সে করেছে, তার সঙ্গে এই মিলিটারী ব্যবহারের কোথায় যেন একটা সামঞ্জস্য রয়ে গেছে! তাই বারবার তার মনে হয়েছে, অমলকে সমস্ত ব্যাপারটা বলতে পারলেই বোধহয় সে খানিকটা শান্তি পাবে—হয়তো একটা সমাধানের পথও পেতে পারে।

সেদিন থেকেই অনন্ত অমলকে একটু আড়ালে পাওয়ার চেষ্টা করেছে। অবশেষে একদিন অমলকে সে একা পেল গার্ড রুমে। অমলের ছিল গার্ড ডিউটি—বিকেলের দিকে ছিল অফ্। অনন্ত তাকে ডেকে নিয়ে গেল নদীর ধারে—ওখানে গিয়ে বসলেই মনটা যেন তার ছাড়া পায়। অনন্ত বললে, "আচ্ছা অমল, আমি মদ খাই বলে তুমি বোধহয় আমায় ঘৃণা কর, না?"

অমল অস্বস্তি বোধ ক'রে বললে, "কই, ঘৃণা তো আমি তোমায় কোন দিন করি নি অনন্ত—কিন্তু আমি ভেবে পাই না, মদই বা তুমি খাও কেন!"

"না খেয়ে যে পারি নি। মনের যে অবস্থা নিয়ে মিলিটারীতে ঢুকেছিলাম, সে অবস্থায় মদ যদি না ধরতাম, তাহলে হয়তো পাগল হয়ে যেতাম।"

অনন্তর মুখখানা লক্ষ্য ক'রে দেখে অমল বললে, "কি ব্যাপার ?"

অনন্ত বললে, "আমাকে তোমরা সকলেই জানো অবিবাহিত বলে। কিন্তু জানো অমল, আমার বিয়ে হয়েছে আজ থেকে তিন-চার বছর আগে ?"

অমল চমকে উঠল, "তার মানে !"

অনন্ত যা বললে, তার সারাংশটা হলো এই : বাল্যকালেই তার বাবা মারা যান। ভাইদের কাছেই সে মানুষ হতে থাকে। ম্যাট্রিক পাশ ক'রে আর কোন সহায়তা না পেয়ে, টিউশানি ক'রেই সে আই. এ. পাশ করে।

লীলা তার এক ছাত্রীর সহপাঠী—মাঝে মাঝে পড়াশুনায় তাকে কিছু কিছু সাহায্যও ক'রে থাকে। লীলা তাকে একদিন নেমন্তন্ন করে তার মায়ের তরফ থেকে। নিছক নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ার সংকোচ মনে জাগলেও, আরও একটি ছাত্রী পাওয়ার লোভে সে লীলাদের বাড়ী যায়। লীলার মায়ের অনাবিল আত্মীয়তায় সে মুগ্ধ হয়ে যায়—ধীরে ধীরে সে লীলাদের বাড়ীতে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অবিরাম পরিশ্রমের মধ্যে ওই বাড়ীতে কিছুক্ষণ থাকা, তার কাছে যেন একটা বিরতির মতো। এমনই একদিনের অনবধান এক মুহূর্তে লীলা উপযাচিকা হয়ে বিয়ের প্রস্তাব করে। সেদিন সে লীলাকে কোন কথা দিতে পারে নি। কিন্তু লীলার এই প্রস্তাব তার জীবনে আনে উত্তাপ আর আলোড়ন—কয়েকদিন পরে সে সম্মতি জানায়।

কিন্তু বাড়ীর মত পাওয়া যায় না—সকলেরই ঘোর আপত্তি। সে নিজের মতে বিয়ে করবে, এ যেন ঘোর অরাজকতা ! বাড়ীর অমতেই সে লীলাকে বিয়ে করে। মাস দুই পরে আলাদা সংসারও পাতে। বিয়ের মাস ছ'য়েক পরে দাদা-বৌদি এসে সাদরে তাদের ডেকে নিয়ে যান। বাড়ীতে ঢুকে সে দেখে, তার খাতির বেড়ে গেছে দ্বিগুণ, আর লীলার ওপর ব্যবহার চলেছে নিষ্ঠুরতম। সব কিছুই সে দেখে, কিছু কিছু যেন বুঝতেও পারে, পারে না কেবল মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে। প্রতিদিন সে শুনতে থাকে লীলার অজস্র নিন্দা, কুৎসা আর অপদার্থতার কথা। তাদের স্বাধীন সংসারের মধুর রেশটুকুও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে।

চরম পরিণতি ঘটে তার মেজদার মধ্যস্থতায়। তিনি আদেশ দেন, লীলাকে ত্যাগ করতে। লীলার জন্যে সংসারে অশান্তি ঢুকেছে, পাড়ায় দুর্নাম রটেছে, তাঁদের বংশের মাথা হেঁট হয়েছে। এর একমাত্র কারণ, লীলার বিবাহপূর্ব জীবনের চারিত্রিক স্খলন। এই অভিযোগ তিনি প্রমাণ করলেন, লীলার ভূতপূর্ব প্রেমিকের একখানি চিঠি দাখিল ক'রে। তার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে।

প্রতিদিনকার জমা হওয়া সহস্র অশান্তি তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে। সে লীলাকে দোষ স্বীকার করতে বলে। লীলা শুধু একটি কথা বলে, "আমার চেয়ে এ বিষয়ে তোমার দাদা আর যাঁকে দিয়ে তিনি এই চিঠি লিখিয়েছেন, তাঁরাই জানেন ভালো।" লীলার এ উক্তিকে নিছক ঔদ্ধত্য আর অবজ্ঞা বলেই তার মনে হয়। নির্মমভাবে সে লীলাকে প্রহার করতে থাকে। লীলার কপাল কেটে যায়, সর্বাঙ্গ থেঁতলে যায়।

সেই মুহূর্তেই সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। দিন তিনেক পরে যখন সে বাড়ী ফেরে, তখন তার নামে হুলিয়া বেরিয়ে গেছে—লীলা তার বিরুদ্ধে এ্যাসল্ট চার্জের মামলা রুজু করছে। মামলা চলল—তার দুই বড় ভাই যথেষ্ট পয়সা খরচ করলেন। আদালতের রায়ে সে দোষী প্রমাণিত হয়। অর্থদণ্ড দিয়ে সে বাড়ী ফেরে। কিন্তু বাড়ীতে ততক্ষণে তার সম্বন্ধে ব্যবহারের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। মামলায় তার দুই ভাই-ই নাকি সর্বস্বান্ত হয়েছেন। সুতরাং সে যেন পথ দেখে নেয়···

অমল ভাবে, তাই আজ অনন্ত মদ খায়, আত্মঘাতী আক্রোশে সে নিজের ওপর নির্যাতন করে! আবার এমনই একটা আঘাতের ফলে কত লোক তো বিবাগী হয়ে সাধু হয়—কৃচ্ছ্রসাধন আর ব্রহ্মচর্য পালন করে! তবে কি মদের নেশা আর ধর্মবোধ দুর্বল মানুষের ওপর একই কাজ করে!

গার্ডরুমের সামনে বসে নদীর কালো বুকে চোখ রেখে অমল ভাবছে, মিলিটারী মেজর সাহেব চান কোম্পানির প্রতিটি ছেলে হবে তাঁর ক্রীতদাস। অনন্তর দাদারা চেয়েছিলেন—সে তাঁবেদার হয়ে থাক তাদের কাছে। আর অনন্তও তো চেয়েছিল—লীলা তার জুলুম মুখ বুজে সহ্য করুক। এমনি ক'রেই বুঝি ধাপে ধাপে চলেছে একই জুলুমের রাজত্ব!

দশটার ঘণ্টা পড়ল। গার্ড কমাণ্ডার অমলকে বললে, "তিন নম্বর পোস্টে সুনীলকে রিলিভ ক'রে দিন।"

ক্যাম্পের পেছনে ছোট বস্তিটার সামনে তিন নম্বর পোস্ট। প্রথম যখন ক্যাম্প পড়ে, তখন এ পোস্টটা ছিল না। কিন্তু কয়েক দিন পরে দেখা গেল, একটু বেশী রাতে অনেক ছেলেই এই বস্তিটায় যাতায়াত শুরু ক'রে দিয়েছে। একদিন একটি ছেলে মাতাল অবস্থায় একটি মেয়েকে মারপিট করায় বস্তির লোকেরা মেজর সাহেবের কাছে নালিশ করে। সেই থেকে এই পোস্টটির সৃষ্টি।

সুনীলের কাছ থেকে রাইফেলটা নিয়ে অমল বললে, আপনি এবার যেতে পারেন—" সুনীল তবুও ইতস্তত করে। অমল বললে, "ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার আর কিছুই নয়, কেবল আপনার অনুমতিটা পেলেই হয়—"

"অনুমতি! কিসের?"

"ব্যাপারটা তাহলে আপনাকে খুলেই বলি। একটি মেয়ে জোগাড় হয়েছে, কাঁচা বয়েস, এই সামনের বস্তিতেই। বুঝলেন না, রাত আটটার পর মিলিটারী ক্যাম্পের ধারে জল নিতে আসে! আন্দাজ আমি ঠিকই করেছিলুম। দেখেশুনে টোপ ফেলে দিলুম। আরে মশাই না গিলে যাবে কোথায়—"

বিস্ফারিত চোখে অমল সুনীলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সুনীল বললে, "সবই ঠিকঠাক, এখন কেবল আপনার অনুমতিটা পেলেই হয়—"

"আমার অনুমতির কি দরকার!"

"আপনার না তো কি জমাদার সাহেবের! আপনার অনুমতি না হলে, আপনি যে আমাকে সেন্ট্রি থেকে কয়েদি বানিয়ে দিতে পারেন। বুঝলেন না ব্যাপারটা—"

"না, সে ভয় আপনার নেই। আপনাকে ধরিয়ে দিয়ে আমি ল্যান্স-নায়েক হওয়ার চেষ্টা করব না।"

সুনীল হাত কচলে বললে, "সে কি আর আমি জানি না। জানি বলেই না আপনার কাছে কথাটা পাড়তে সাহস পেলুম। তবে কথা দিচ্ছি বঁড়শিতে যদি গাঁথতে পারি, তাহলে আপনার পাতও নিরামিষ যাবে না।" এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে সে সুট ক'রে গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

রাইফেলটাকে অমল 'সোলডার আর্ম' ক'রে নিলে। যথারীতি মার্চ ক'রে বিট-এর মধ্যে টহল দিতে থাকে। পাশে ক্যাম্প—লাইট-আউট হয়ে গেছে। নানাজাতের নাক ডাকার শব্দে একটা একঘেঁয়ে কলরব সৃষ্টি হয়েছে। একটানা বেজে চলেছে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ঐকতান। অমলের কদম ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে—চলার তাল যাচ্ছে কেটে। তার মাথার মধ্যে যেন ঝাঁঝাঁ করছে—সময় বয়ে চলেছে মৌন এক আশঙ্কায়।

গলিটার মুখোমুখি অমল এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। পা দুটো তার থরথর ক'রে কাঁপছে—ঘন ঘন ক্যাম্পের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। গলিটার মধ্যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, চোখ কুঁচকে অমল লক্ষ্য করতে থাকে সুনীল ফিরছে কিনা!

তাহলে সুনীল বঁড়শিতে গেঁথেছে! সুনীল বলেছে, গাঁথতে যদি সে পারে, তাহলে তার পাতও নিরামিষ যাবে না।

'না-না—' ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার সে টহল দিতে শুরু করে। একাজ সে করতেই পারে না। গলির মুখে ফিরে এসে আবার অমল দাঁড়িয়ে পড়ে।

'কেনই বা না'—সমস্ত মনটা তার গর্জে ওঠে, 'কেন না ?' পাঁচকড়ি তো ছেলে ভালোই, কিন্তু সে তো বর্মি-বাঙালী মেয়েটিকে ছেড়ে কথা কয় নি ! হাবিলদার ভট্‌চায ভদ্র ঘরের শিক্ষিত মানুষ, কিন্তু সেও তো ইভ্যাকুয়ি বলে করুণা দেখায় না ! ওই মাড়োয়ারীটি, ও তো একজন পরহিতব্রতী, কিন্তু পরোপকারের নামে দিনে-ডাকাতি করতে তো তার বিবেকে বাধে না ! আর সুনীল, শিক্ষিত-সভ্য আর ভদ্র, কিন্তু সম্পূর্ণ অচেনা একটি মেয়ের কাছে দেহভোগের প্রস্তাব করতে তো দ্বিধা করে নি !

ডান হাতটা তার কাঁপছে। ট্রিগার-গার্ডের মধ্যে আঙুল দুটো টনটন করছে, কাঁধ থেকে হাতটা বুঝি এখনই ছিঁড়ে পড়বে ! রাইফেলটাকে অমল স্লিঙ-আর্ম ক'রে নিলে—শরীরের ওপর একটা ঝাঁকানি দিয়ে লম্বা ধাপ ফেললে—বুক চিতিয়ে, দুহাত দুলিয়ে আবার টহল দিতে লাগল।

সুনীল ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলে, "কেউ খোঁজ করেছিল নাকি ?"

অমল বললে, "না।"

"দিন তবে রাইফেলটা—" বলেই অমলের কাঁধ থেকে রাইফেলটা নিয়ে বললে, "যান চট ক'রে ঘুরে আসুন। ডান হাতে তিন নম্বর দরজা। তিনটে টোকা মারলেই খুলে দেবে।"

বস্তির চালার ওপর দিয়ে রেলওয়ে ইয়ার্ডের আলো কিছুটা এসে পড়েছে সুনীলের মুখের ওপর। মিনমিনে ঘামে সুনীলের কপালটা ভিজে উঠেছে, মুখটা রক্তের আভাসে জ্বলজ্বল করছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

অমলের কাঁধের ওপর একটা চাপড় মেরে সুনীল বললে, "আরে, আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলে কি হবে ! কাম অন—বাক আপ—" ঠেলতে ঠেলতে সে অমলকে গলির মুখ পর্যন্ত পৌঁছে দিলে।

অমল এগিয়ে চলেছে। নিজের বুকের ঢিপঢিপ শব্দ সে নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছে। প্রথম দরজা—দ্বিতীয় দরজা—এইবার তৃতীয় ! তার গতি মন্থর হয়ে আসে। তৃতীয় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে হাত তোলে টোকা মারবার জন্যে—উদ্যত সেই হাতে তার ঘর্মাক্ত মুখখানা একবার মুছে নেয়। চকিতের জন্যে ভাবে, এক দৌড়ে আবার সে তার পোস্টে ফিরে যাবে।

দরজার ওপর অমল তিনটে টোকা মারলে। কই দরজা তো খুলছে না ! ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দ আসছে না ! প্রতিটি লোমকূপ তার উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে, নিঃশ্বাস যেন তার বন্ধ হয়ে আসছে !

ভাঙা দরজার ফাটলের মধ্যে দিয়ে খানিকটা আলো এগিয়ে আসছে। অমল

এক পা পেছিয়ে দাঁড়াল। তার সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে! প্রদীপ হাতে একটি মেয়ে, কপাট খুলে পাশে সরে দাঁড়িয়েছে ভেতরে যাওয়ার মৌন অনুজ্ঞা জানিয়ে। অমল থমকে গেছে, তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠেছে, হাত দুটো তার কাঁধ থেকে অসহায়ভাবে ঝুলছে।

মেয়েটি চাপা গলায় বললে, "চলে আসুন তাড়াতাড়ি।"

একলাফে অমল ভেতরে ঢুকে পড়ল। মেয়েটি দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে বললে, "সাবধানে আসুন আমার সঙ্গে, কোন শব্দ করবেন না যেন—" কিছু দূর গিয়ে মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে ফিসফিস ক'রে বললে, "একটু দাঁড়ান, আলোটা ও-ঘরে রেখে আসি।" ঘরের মধ্যে ঢুকে এক কোণে একটা দেলকোর ওপর প্রদীপটা রেখে, একটা বিছানার পাশে সে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর বেরিয়ে এসে বললে, "আসুন—"

মেয়েটিকে অনুসরণ ক'রে অমল আর একটা ঘরের মধ্যে ঢুকল। ছেঁচা বেড়ার দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ইয়ার্ডের আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যেকার মাচাটার ওপর। মেয়েটি মাচাটিকে দেখিয়ে বললে, "বসুন।"

অমল বসল। মেয়েটি তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। বেবাক বিস্ময়ে অমল তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলে, "ও-ঘরে কে?"

"আমার বাবা, রোগে শয্যাশায়ী, আমাদের আর কেউ নেই—"

অসীম করুণায় অমলের মনটা টলমল ক'রে ওঠে। মেয়েটির কোমর ডান হাতে জড়িয়ে ধরে টেনে নেয় নিজের বুকের কাছে, বলতে ইচ্ছে করে, 'কেন আমি তো রয়েছি—'

ধীরে ধীরে মেয়েটি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মাচার ওপর শুয়ে পড়ে। অমল ঘুরে বসে মেয়েটির মুখোমুখি—করুণ এক বেদনায় তার বুকটা শিরশির করতে থাকে। মেয়েটি বললে, "তাড়াতাড়ি সেরে নেবেন কিন্তু—"

কখন তার নিজেরই অজ্ঞাতে অমল মেয়েটির ওপর ঝুঁকে পড়েছে। অপার বিস্ময়ে অনুভব করছে তার আকৈশোর কৌতূহলের বস্তু—নারীর দেহ। অনাবৃত বক্ষের ওপর হাতদুটি রেখে সুদীর্ঘ এক নিঃশ্বাস জমে উঠেছে তার বুকের মধ্যে —মনে জেগেছে স্তন্যপায়ীর উদ্বেলতা। অমল মুখটা নামিয়ে আনে। মাথাটা ঠেলে দিয়ে মেয়েটি বললে, "সেরে নিন না তাড়াতাড়ি।"

অমলের বুকটা ব্যথায় টনটন করছে, তার অসার্থক জীবনের সমস্ত বেদনা উদ্বেল হয়ে উঠেছে, তার অনাঘ্রাত পৌরুষ ব্যথায় ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে। তার মনের গোপন কোণে যে কাঙ্গাল অহরহ কেঁদে মরে, সে বুঝিবা এখনি মেয়েটির

পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে! অমল মিনতির সুরে বললে, "আমাকে একটু তোমার বুকের মধ্যে চেপে ধরবে?"

মেয়েটি ঝংকার দিয়ে ওঠে, "ওসব হবে-টবে না, এইবার আপনি যান।"

অমল সটান দাঁড়িয়ে ওঠে। মাচাটার পাশ থেকে এক ধাপ সে পেছিয়ে দাঁড়ায়। না, না—এ জিনিস সে চায় নি! সে চেয়েছিল, মেয়েটি তাকে একটু —একটু—হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু ভালোবাসুক···

অমলকে দেখে সুনীল বললে, "ওঃ, আপনি এত দেরি করছিলেন!"

অমল সুনীলের হাত থেকে রাইফেলটা টেনে নিলে। সুনীল বললে, মেয়েটা বড্ড গরীব। শরীরে কিচ্ছু নেই—কেবল এক আঁটি হাড়। কিছুদিন ভালো ক'রে খাওয়ানো দরকার—তবেই তো শাঁসালো হবে।"

অমল চুপ ক'রে থাকে। সুনীল আরও কাছ ঘেঁষে বললে, "আসুন অমলবাবু, লেট আস শেয়ার। ওই কি ছাই একটা বিছানা!"

অমল বললে, "আমি আর কোনদিন যাব না।"

"কেন! শালী কোন খারাপ ব্যবহার করেছে নাকি? দিলেন না কেন এক-ঘা বুটের ঠোক্কর—"

"না, খারাপ ব্যবহার করে নি। আমি নিজেই আর যাব না।"

কিছুক্ষণ অমলের মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রে হাল্কা হেসে সুনীল বললে, "ওঃ এই বুঝি আপনার প্রথম!"

গার্ড ডিউটি থেকে অফ্ হয়ে এসে অমল তাঁবুর পর্দা ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়েছে। বিষম ক্লান্তিতে তার সমস্ত মনটা যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। গতরাতের ঘটনা তাকে বিব্রত ক'রে তুলছে—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান ভাবে সে ভেবে চলেছে সেই মেয়েটির কথা। তার তো মেয়েটিকে বেশ ভালো লেগেছিল, সে তো ভালো ব্যবহারই করেছিল তার সঙ্গে—তবে কেন মেয়েটি তার সঙ্গে ওরকম করলে! একের পর এক তার মনে পড়ে মেয়েদের সম্বন্ধে রজতের ধারণা, বাঁড়ুজ্যেদাদার স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতির নমুনা, হাবিলদার ভট্‌চাযের ইভ্যাকুয়ি মেয়েটির ভাগ চাওয়া, পাঁচকড়ির এই ইতস্তত করেও শেষ পর্যন্ত সেই বর্মি-বাঙালী মেয়েটির ওপর ব্যবহার, সুনীলের এই মেয়েটিকে শেয়ার করার প্রস্তাব! তবে কি মেয়েরা কেবল ফুর্তির খোরাক! তাদের একমাত্র দাম ওই দেহটুকুর জন্যে!

কিন্তু মেয়ে বলতে কি কেবল এদেরই বোঝায়! মিনি তো বড় হয়েছে, রিণিও বড় হবে, তারাও কি এই রকম ব্যবহার পাবে। ভাবতে ভাবতে অমলের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এ কেমন ক'রে সম্ভব! মেয়ে বলতেই বোঝায় তার দেহটুকু—মানুষ হিসাবে তার কোন মূল্য নেই?

তাঁবুর পর্দাটা ন'ড়ে চ'ড়ে উঠতে অমল চমকে উঠল। এই রে, হয়তো কেউ আসছে ব্যাপারটা নিয়ে রস-মস্করা করতে। সুনীল কি আর এতক্ষণ কাকেও বলে নি! তাকে কি আর একটা আস্ত গাধা বলে সকলের কাছে প্রতিপন্ন করে নি! কিন্তু সে করবে কি! তার যে কিছুতেই প্রবৃত্তি হলো না—এ জিনিস তো সে চায় নি!

পর্দা সরিয়ে ঢুকল জয়ন্ত। অমল যেন আশ্বস্ত হলো। না, জয়ন্ত অন্তত এসব ব্যাপার নিয়ে খানিকটা বদরসিকতা করবে না। তাঁবুর পর্দাদুটো তুলে দিতে দিতে জয়ন্ত বললে, "কি মশাই, সব সময়ে এমন মনমরা হয়ে থাকেন কেন?"

আস্তে আস্তে উঠে বসে অমল বললে, "এখানে মনমরা হয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কি! খুশি হওয়ার মতো তো কিছু দেখতে পাই না।"

"চলুন না, খানিকটা ঘুরে আসি—"

"কোথায়ই বা আর যাবেন! হয় বাজারে, না হয় স্টেশনে। ইভ্যাকুয়িদের নিয়ে এই ছিনিমিনি যেন আর সহ্য হয় না—"

"বেশ তো, ইভ্যাকুয়িদের ভিড়ে নাই বা গেলাম। চলুন না, নর্থ গৌহাটির দিকে। ওখানে খুব পুরনো একটা মন্দির আছে পাহাড়ের ওপর। পাহাড়ের ঢল্ নেমে গেছে একেবারে নদীর বুকে। তা মন্দ কি, খানিকটা প্রকৃতির শোভা দেখা যাবে।"

অমল বুট পরে পট্টি জড়াতে জড়াতে বললে, "তাহলে আপনার প্রাণেও কাব্য আছে দেখছি!"

জয়ন্ত বললে, "না থাকলেও সন্ধান তো মাঝে মাঝে করি—"

পিথ হ্যাট্‌টা হাতে নিয়ে অমল বললে, "তাহলে চলুন—"

স্টেশন পার হয়ে, পোস্ট অফিস ছাড়িয়ে, ওরা উঁচু লাল রাস্তাটা ধরেছে। রাস্তার বাঁদিকে মিলিটারী ক্যাম্প—পাইওনীয়র কোরের। সোজা লাইনে তাঁবুর সারি, দুদিককার ফ্ল্যাগ তোলা, প্রত্যেকটি বিছানা পরিপাটিভাবে সাজানো। অমল বললে, "কি রকম ঝকঝকে তকতকে ক্যাম্প দেখছেন—"

জয়ন্ত বললে, "আমার কিন্তু এই ক্যাম্পের চেয়ে তার লোকগুলোর চেহারাই চোখের ওপর ভাসছে। ভাবুন তো দেখি, তাদের ওপর কত জুলুমই না করে,

যার জন্যে ক্যাম্প এমন ঝকঝকে তকতকে—"

অমলের মনে হলো, ঠিকই তো কথাটা ! ট্রেনিং ক্যাম্পে ঢুকে প্রথম দিন তারও তো মনে হয়েছিল, কত সুন্দর ! সেদিন সে ছিল বাইরের লোক। আর আজ সে সৌন্দর্যবোধ কোথায় উবে গেছে !

এতক্ষণে ওরা গ্রামের মধ্যে এসে পড়েছে। নদীকে ডাইনে রেখে গ্রামের রাস্তা ক্রমশই বাঁয়ে ঘেঁষে চলেছে। পাতলা বসতি শুরু হয়েছে। রাস্তার দুধারে পতিত জমি, তার বুকে আগাছা উদ্ধত দম্ভে বেড়ে উঠেছে। উঁচু রাস্তার দুপাশে নাবাল জমি বর্ষার জলে ভরে উঠেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ন্যাকড়া-কানি পরে, কোমরে খাঁচা ঝুলিয়ে, জলাগুলোর মধ্যে ছিপ ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।

অমল আর জয়ন্তকে দেখে ওই ছেলেমেয়ে মহলে যেন একটা সাড়া পড়ে গেল। গুটি গুটি তারা জলার ধার থেকে রাস্তায় উঠে আসে—ড্যাব ড্যাব ক'রে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ তারা দৌড়তে শুরু করে। অমল বললে, "ব্যাপারটা কি বলুন তো ! ওরা পালাচ্ছে কেন ?"

জয়ন্ত বললে, "পালাচ্ছে, গোরাপল্টন দেখেছে বলে।"

অমল থমকে দাঁড়াল। জয়ন্ত বললে, "কি হলো, দাঁড়িয়ে পড়লেন যে !"

"থাক, তবে আর গিয়ে কাজ নেই—"

জয়ন্ত বললে, "কেন, ভয় করছে ?"

অমল আবার চলতে শুরু করে। গ্রামের মাঝামাঝি তারা এসে পড়েছে। রাস্তার দু'ধারে বসতি ধীরে ধীরে ঘন হয়ে উঠেছে। একটা আর্তনাদের শব্দে অমল আর জয়ন্ত একই সঙ্গে সেইদিকে ফিরে চায়। একটি বছর বারো-তেরো বয়েসের মেয়ে ছোট্ট একটি ছেলে কোলে ক'রে দাওয়ায় বসেছিল—তারই এই আর্তনাদ। ছেলেটিকে মাটির ওপর ফেলে রেখে সে দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে—তার কাপড়ের আধখানা তখনো দরজার বাইরে। বাড়ীর ভেতর থেকে চেঁচামেচির রোল উঠল। এক সঙ্গে অনেকগুলি মেয়েলী স্বর, তার কোনটি কান্না, কোনটি আর্তনাদ, কোনটি অনর্গল প্রশ্ন !

এতক্ষণে অমল আর জয়ন্ত সেই বাড়ীটার সামনে এসে পৌঁছেছে। তারা দেখলে,কয়েক জোড়া আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ জানলাটাকে সজোরে বন্ধ ক'রে দিয়ে চট ক'রে সরে গেল। দাওয়ার ওপর শিশুটি তখনও পরিত্রাহি কাঁদছে। অমল বললে, "আরও আগে আপনি যেতে চান নাকি ?"

জয়ন্ত বললে, "নিশ্চয়ই—"

"ওরা কিন্তু আমাদের আক্রমণ করতে পারে ?"

"সে তো পারেই। সেই জন্যেই তো আমাদের এগিয়ে যাওয়া বিশেষ ক'রে দরকার। ব্রিটিশের তাঁবেদারী ফৌজে ভর্তি হয়েছি বলে, আমরাও তো আর ব্রিটিশ হয়ে যাই নি !"

গ্রাম আরও ঘন হয়ে উঠেছে। প্রায় প্রতি বাড়ীর সামনে একজন দুজন ক'রে পুরুষমানুষ দাঁড়িয়ে আছে। অমল বললে, "ওরা বোধহয় আমাদের ঘিরে ফেলবে।"

জয়ন্ত বললে, "ফেলুক না, আমাদের ভয়টা কি !"

"কিন্তু—"

"না অমলবাবু, এর শেষ আমাদের দেখতেই হবে—মিলিটারী আর সিভিলিয়ানের মধ্যেকার বেড়া ভাঙতেই হবে। এদের সঙ্গে আমরা আলাপ করব—এদেরই সঙ্গে মিলেমিশে থাকব।"

"সে কেমন ক'রে সম্ভব !"

"সম্ভব এই জন্যে যে আমরা পল্টন হলেও সাধারণ মানুষ—" সামনে একটা চায়ের দোকান দেখে বললে, "চলুন একটু চা খাওয়া যাক—"

অমল আবার বললে, "একেবারে ফাঁদের মধ্যে গিয়ে পড়বেন ?"

"উপায় নেই অমলবাবু। মোকাবিলার কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে নেওয়া ভালো।" দোকানের দাওয়ায় উঠে বললে, "হ্যাঁ ভাই, চা পাওয়া যাবে ?"

দোকানী ফ্যাকাশে মুখে মাথাটাকে ঈষৎ দুলিয়ে জানাল, "না।"

জয়ন্ত মাথা থেকে টুপি খুলে, বাঁশের মাচাটার ওপর বসে বললে, "আহা, আমাদের এত ভয় পাচ্ছ কেন ভাই ? আমরা তো আর গোরা পল্টন নই, আমরা তোমাদেরই দেশের মানুষ।"

দোকানী ওদের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, বারকয়েক আপাদমস্তক দেখে বললে, "আপনালোক বঙাল ন হয় ?"

অমল বললে, "বাঙালী না তো সাহেব নাকি !"

জয়ন্ত বললে, "তবে ভাই এবার একটু চা খাওয়াও, অনেক দূর থেকে আসছি। যাব অশ্বক্রান্তার মন্দির।"

দোকানী যেন সন্দিগ্ধ ভাবটা কাটিয়ে ওঠে। সহজভাবেই বললে, "মই ভালো চা করি দিম—" ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে একটা আধনিভন্ত উনানে খান কয়েক ঘুঁটে ফেলে দিয়ে, বাঁশের একটা চোঙের মধ্যে দিয়ে ঘন ঘন ফুঁ দিতে লাগল। ঘুঁটে জ্বলে উঠল, ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গেল। একটা টিনের পাত্রে জল চড়িয়ে দিয়ে

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে বললে, "আপনালোক এই ফালে কেনেকৈ আহিলা ?"

জয়ন্ত বললে, "কেন বলো তো ?"

"খবর আহিছে, গোরাপল্টন মাইকি মানুহরে ধাওয়া করিব লাগিছে—"

জয়ন্ত বললে, "এমন খবরটি তোমাদের দিলে কে ?"

দোকানী এ কথার কোন জবাব না দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। এক দল লোক দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—তাদের প্রত্যেকেরই হাতে একটা না একটা হাতিয়ার। অমলের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। জয়ন্ত দোকানীকে বললে, "ওদের সর্দারকে একটু ডেকে নিয়ে এসো তো।"

দোকানী বললে, "ভয় ন করিবা, মই সকল কথা কহি দিম্—" বাইরে বেরিয়ে, দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দোকানী খুব হাত-পা নেড়ে যেন কি সব বললে। তার কথা শেষ হলে, একজন লোক তার সঙ্গে ভেতরে এলো।

জয়ন্ত পাশে জায়গা দেখিয়ে বললে, "এসো সর্দার, বসো।"

সর্দার সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের আপাদমস্তক লক্ষ্য করতে থাকে। জয়ন্ত বললে, "তোমরা ভুল করেছ সর্দার, আমরা পল্টন হলেও গোরা-পল্টন নই —আমরা তোমাদেরই দেশের মানুষ—পেটের দায়ে মিলিটারীতে ঢুকেছি। আমরা তোমাদের ওপর জুলুম করব না।"

সর্দার বললে, "আপনারা আর কখনও গ্রামে ঢুকবেন না।"

অমল বললে, "আমাদের কি তোমরা বিশ্বাস করতে পার না ?"

সর্দার বললে, "গ্রামের মধ্যে আমরা পল্টন ঢুকতে দেব না।"

"কিন্তু সর্দার, যখন জাপানীরা এসে দেশ দখল করবে, তখন তোমরা কেমন ক'রে গ্রাম রক্ষে করবে ?" সর্দার কোন উত্তর না দিয়ে, কেবল তার হাতের দা'খানা তুলে ধরল।

দোকানী ইতিমধ্যে কাঁচের গ্লাসে চা আর শালপাতায় চারখানা ক'রে লবঙ্গলতিকা ওদের সামনে দিয়েছে। খেতে শুরু ক'রে অমল সর্দারকে বললে, "আমরা ভেবেছিলাম, অশ্বক্রান্তার মন্দিরটা দেখতে যাব—"

"যেতে পারেন। কিন্তু কোন ভালো-মন্দ হলে আমরা জানি না।"

জয়ন্ত বললে, "তাহলে আমরা ফিরে চললুম সর্দার—"

সর্দার বললে, "আপনাদের কোন ভয় নেই, আমাদের লোক আপনাদের গ্রামের সীমানা পার ক'রে দিয়ে আসবে।"

রাস্তায় নেমে অমল একবার পেছন দিকে দেখে নিলে। জন চারেক লোক

কিছু তফাতে তাদের পেছন পেছন আসছে। অমল বললে, "কই জয়ন্তবাবু, এরা তো আমাদের বিশ্বাস করল না!"

জয়ন্ত বললে, "আমি ভুল করেছিলাম অমলবাবু, আমার চেয়ে এদের দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ। আমরা বাঙালীই হই, আর অসমীয়াই হই, আমরা হচ্ছি সৈনিক —যে সৈনিক ওদের ওপর আবহমানকাল ধরে অত্যাচারই করেছে—সুতরাং আমরা ওদের শত্রু। আমরা যদি কোন দিন ওদের শত্রুর সঙ্গে লড়াই ক'রে প্রাণ দিতে পারি—সেই দিনই ওরা আমাদের বিশ্বাস করবে।"

জয়ন্তর কথাগুলো শুনতে শুনতে অমল কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মনে পড়ে তার সেই মেয়েটির কথা। তাহলে মেয়েটিও নিশ্চয়ই তাকে বিশ্বাস করতে পারে নি—তাকে মনে করেছে সুনীলের মতোই একটি জীব—সুতরাং অবিশ্বাস্য—

দুপুরের খানার পর ঘণ্টা দেড়েকের অবসরটা ছেলেরা সাধারণত ঘুমিয়ে, না হয় গল্প ক'রে কাটিয়ে দেয়। অনন্ত বকের মতো পা ফেলতে ফেলতে এসে তাঁবুর মধ্যে ঢুকল—কাদায় সারা মাঠটা প্যাচ প্যাচ করছে। জামার বোতাম খুলে দিয়ে, বুটের কাদা চাঁছতে শুরু ক'রে বললে, "ওঃ, জীবনটা বিষময় ক'রে তুলেছে! এই শালা বৃষ্টি যেন এন. সি. ও'দের চেয়েও অসহ্য!"

সুনীল বললে, "বৃষ্টি পড়ছে, তাও কি এন. সি. ও'দের দোষ! তোদের দেখছি এ এক রোগ হয়েছে—"

অনন্ত বললে, "রোগ হলো আমাদের! গাছতলায় বসিয়ে রাইফেল-ক্লাস করবার কি দরকারটা বাবা! আর ওরই ফাঁকে ঝাল ঝেড়ে নেওয়া! আমরা যে কি এমন ওদের পাকা ধানে মই দিয়েছি বুঝি না।"

সুনীল বললে, "কিন্তু ওদের কথাই-বা তোরা যে কেন ভাবিস না, আমি বুঝতে পারি না। ওদের দোষটা কি! ওরা তো হুকুমের চাকর।"

বুটের তলা সাফ করা শেষ ক'রে অনন্ত সুনীলের পাশে শুয়ে পড়ে বললে, "অমলটা দিন দিন কেমন যেন বদলে যাচ্ছে।"

সুনীল বললে, "সে জানিস না বুঝি? ওর মাথাটি খাচ্ছে ওই জয়ন্তটা। ওটা যেমন ট্যাক-ট্যাক করে কথা বলে, আজকাল অমলও দেখি তাই শুরু করেছে। আরে বাবা, 'ব্লাডি বাস্টার্ড' তো মিলিটারীতে একটা কথার মাত্রা বিশেষ—ও নিয়ে এত চটাচটি করবার কি কোন মানে হয়?"

সন্তোষ ছিল স্থনীলের পাশে শুয়ে। তড়াক ক'রে উঠে বললে, "দেখ স্থনীল, নিজের কাপুরুষতাকে বুদ্ধির কসরৎ দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করিস নি—"

স্থনীল বলে উঠল, "আর এঁরা হলেন অমলবাবুর চেলা। পেছন থেকে খুব বাহবা দেন। কিন্তু অমলকেই তো সাত দিন আর. আই. খাটাতে হবে!"

সন্তোষ বললে, "মানুষের মতো মানুষ হলে, তারাই এগিয়ে যায়—"

অনন্ত বললে, "ব্যাপারটা হয়েছিল কি?"

সন্তোষ বলতে থাকে, "হবে আর কি! হাবিলদার মুখার্জিকে তো জানোই, ওই যে শালা মিছরির ছুরি! রাইফেলের ক্লাস নিতে নিতে হঠাৎ তাঁর প্রাণে উচ্ছ্বাস জেগে উঠল। তিনি তাঁর আত্মচরিত শোনাতে শুরু করলেন। ম্যাগনোলিয়ার তিনিই নাকি হর্তা-কর্তা ছিলেন, দুনিয়ার যত রাজা-মহারাজা ছিল তাঁর খদ্দের—এই সব যত গ্যাঁজা আর কি। অমলের পাশে বসেছিল ফায়ারম্যান পি. বি. মুখার্জি আর ব্লাকস্মিথ এন. বি. দে; তারা বোধহয় ভেবেছিল, হাবিলদার সাহেব যখন খোস মেজাজে আছেন, তখন তারাও একটু আধটু গল্প-সল্প করতে পারে। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস ক'রে তারা গল্প শুরু ক'রে দেয়। আর যাবি কোথায়! হাবিলদার সাহেবের মেজাজ গরম—ভক্তি গদগদ চিত্তে তাঁর আত্মচরিত না শুনে কিনা গল্প জুড়ে দিয়েছে! হাবিলদার সাহেব মুখচোখ লাল ক'রে বলে উঠলেন, "সাট আপ—ইউ বাস্টার্ড।" অমল কি মনে করেছিল কে জানে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'ইউ উইথড্র।' হাবিলদার মুখার্জি এক লাফে অমলের সামনে এসে তেড়ে উঠলেন, 'কি, কি বললে তুমি?' অমলও সোজা জবাব দিলে, 'আপনি যা বলেছেন, তা প্রত্যাহার করুন—গালাগালি দেওয়ার অধিকার আপনার নেই।' হাবিলদার মুখার্জি প্রথমটা যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। আমাদের সকলের দিকে একবার কটমট ক'রে চাইলে। আমাদের হাত পা গুলো তখন ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। আর কিছু না বলে ব্যাটা গটমট ক'রে চলে গেল। আমি অমলকে বললুম, 'বোধহয় মেজর সাহেবকে ডাকতে গেল।' অমল বললে, 'বেশী আর কি হবে, না হয় জয়ন্তর মতো খানিকটা মার খেতে হবে! কিন্তু এদের এই জঘন্য ব্যবহার বন্ধ করতেই হবে।' একটু পরে হাবিলদার মুখার্জি জমাদার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো। অমলকে দেখিয়ে বললে, 'এই যে স্যার, ইনি—এঁকে জী হুঁজুর না বললে এঁর অপমান হয়।' জমাদার সাহেব বললেন, "তা তো হবেই —উনি যে গ্র্যাজুয়েট!' তারপর অমলের সামনে দাঁড়িয়ে মোগলাই কায়দায় কুর্নিশ ক'রে বললেন, "হুজুর, এ বান্দাকি গোস্তাকী মাফ করনা—আইয়ে জী

হামারা সাথ'—বলে শালা হাঁটতে শুরু করল কোয়ার্টার গার্ডের দিকে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললে, 'হুজুরকে তো গোঁসাখানায় দিয়ে এলাম—হাবিলদার সাহেবের কথায় আর কারও গোঁসা হয়েছে নাকি ?'

অনন্ত বলে উঠল, "এরা মনে করেছে কি ! আমরা কি ভেড়ার পাল নাকি ! যা বলবে, তাই শুনে যাব—প্রতিবাদও করতে পারব না ?"

সুনীল বললে, "প্রতিবাদ ক'রে আর লাভটা কি ! ওই তো কোয়ার্টার গার্ড খাটতে হবে। আর ক'টা দিন মুখ বুজে সয়ে যা না বাবা, ওদিকে মণিপুর তো হয়ে গেছে—"

সন্তোষ বললে, "ওই আনন্দেই থাক। জাপান এসে তোমাদের মতো ভেড়ুয়াদের স্বাধীন ক'রে দেবে।"

অনন্ত বললে, "যাক, তারপর কি হলো বল্ ?"

সন্তোষ বলতে লাগল, "তারপর জমাদার সাহেবের তম্বিগম্বি, 'ওকে আমি কোয়ার্টার গার্ড খাটাবই—কোন স্যাপার একজন হাবিলদারের সামনে মাথা তুলে কথা বলবে, সেটি এখানে চলবে না, বুঝলে ? আর ওর বিরুদ্ধে তোমাদের দু'জনকে সাক্ষী দিতে হবে।' আমাদের ছুটি হয়ে গেল। পি· বি· মুখার্জি বললে, 'খবরটা অমলবাবুকে দিয়ে আসি, আর বলে আসি, আমরা কেউ তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেব না।' অমলকে মেজর সাহেবের কাছে পেশ করল জমাদার সাহেব, তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হলেন হাবিলদার মুখার্জি।"

অনন্ত ফোঁস ক'রে উঠল, "হাবিলদার মুখার্জি কেমন ক'রে সাক্ষী হবে ! সেই তো নালিশ করেছে।"

সন্তোষ বললে, "তাতে কি হয়েছে, সে যে হাবিলদার ! হাবিলদার মুখার্জি বানিয়ে বানিয়ে এক গণ্ডা মিথ্যে কথা বলে গেল। জমাদার সাহেব বেছে বেছে একজন পয়েণ্টম্যানকে অনেক শিখিয়ে পড়িয়ে সাক্ষী খাড়া ক'রে দিলে। সে কিন্তু যা সত্যি ঘটেছিল তাই বলেছে। জমাদার সাহেব তো ক্ষেপে গিয়ে তাকে একস্ট্রা ফেটিগ দিয়েছে—নদী থেকে ত্রিশ বালতি জল তোলা। আর মেজর সাহেব অমলকে মাত্র সাত দিনের আর· আই· দিয়েছেন, 'পয়লা কসুর' বলে।"

সুনীল বললে, "তাছাড়া মেজর সাহেবের আর উপায়ই বা কি। কোম্পানিতে ডিসিপ্লিন বজায় রাখতে হবে তো। অমলকে কোন শাস্তি না দিয়ে যদি ছেড়ে দিতেন, তাহলে এরপরে স্যাপাররা কি আর কোন দিন এন· সি· ও'দের মানত ?"

অনন্ত ফ্যালফ্যাল ক'রে সুনীলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে,

"তুমি কি বলছ সুনীল! শুধু ডিসিপ্লিনের নামে তুমি এতবড় একটা অন্যায়ের পক্ষে ওকালতি করছ?"

সুনীল বললে, "ওকালতি আমি করছি না। কিন্তু যাদের ওপর এতবড় এডমিনিস্ট্রেশন চালানোর ভার তাদের কথাটা একবার ভাববে না?"

সন্তোষ বললে, "তোমার প্রভুভক্তির জন্যে, তুমি হয়তো শিগগীরই এন. সি. ও হয়ে যাবে। কিন্তু আমার মন বলছে, এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এই কায়দা বোধহয় আর খুব বেশীদিন চলবে না।"

আট

বর্ষা নেমেছে—বৃষ্টি শুরু হলে আর থামতে চায় না। তাঁবুর আউটার ফ্ল্যাপ ভারী হয়ে ইনার ফ্ল্যাপে ঠেকে যায়—বৃষ্টির ছাঁটে আর বুটের জলে তাঁবুর মাটি কাদা হয়ে ওঠে। বাইরে থেকে ঘুরে এসে ছেলেরা জামার বোতাম খুলে দেয়—দেহের উত্তাপেই জামা শুকিয়ে যায়। পিথ হ্যাট্‌টা ভিজে ভিজে যখন নরম হয়ে ওঠে, তখন লঙ্গরখানায় উনানের পাশে রেখে সেটাকে সেঁকে নেয়। কিন্তু বিপদ ওই বুটজোড়াকে নিয়ে! ঘুম থেকে উঠেই পা দুটো গলিয়ে দিতে হয়। সারাদিন ধরে জলে-কাদায় ভিজে তলা থেকে ওপর পর্যন্ত চ্যাবচ্যাব করতে থাকে, ভেতরের গরম মোজা ভিজে ওঠে। তবুও রাত আটটায় রোলকল শেষ হওয়ার আগে বুট খোলার অবকাশ নেই। রোলকলের শেষে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে, মাথাপিছু একহাত জমির ওপর নিজের নিজের বিছানায় বসে, নিজেরাই নিজেদের পায়ের তলায় হাত ঘষে পা দুটোকে গরম করে নেয়।

এক-একটা তাঁবুর মধ্যে আঠারো থেকে কুড়িজন লোকের থাকার হুকুম। তবুও যৌথভাবে বিছানা পেতে একটু হাত পা খেলিয়ে আরাম ক'রে শোয়ার উপায় নেই। এক বিছানায় দু'জন লোক শোওয়া মারাত্মক গর্হিত কাজ! যেহেতু ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের নিয়েই ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোড়াপত্তন, সেই জন্যে তাদের বদ অভ্যাসগুলির প্রতিরোধক এই আইন আজও বলবৎ। সুতরাং প্রত্যেককে আলাদা আলাদা বিছানা পাততেই হয়। একখানা

গ্রাউণ্ড-শীট লম্বালম্বি দু-ভাঁজ ক'রে পেতে মাথাপিছু বিছানা—তারই ওপর এক সারিতে দশ জন ছেলে যদি চিৎ হয়ে শোয়, তাহলে আর 'এক বিস্তারামে দো আদমি'র মতো 'বুরা কাম' এড়িয়ে চলা যায় না। কাজেই আইন রক্ষার দায়ে প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে মশারি খাটিয়ে ব্যবধান রচনা করতে হয়।

তাঁবুর চারপাশের নালাকে রোজই সংস্কার করতে হয়। জল নিষ্কাশনের পথ সুগম না থাকলেই, একটু বেশী বৃষ্টিতে তাঁবুর মধ্যে বন্যার সম্ভাবনা। শুধু নালাতেই রেহাই নেই, তাঁবুর পেগগুলোকেও পরখ ক'রে দেখতে হয়—তাঁবুর দড়িগুলোকে টানটান ক'রে দিতে হয়। রোলকলের পর বিছানার মধ্যে ঢুকেও শান্তি নেই। নানাজাতের দুর্যোগ আশঙ্কায় মনটা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ঘুম আসার আগে পর্যন্ত গল্প চলতে থাকে, কোন একদিনের দুর্যোগকে কেন্দ্র ক'রে। প্রবল বৃষ্টিতে কেমন ক'রে নালা ছাপিয়ে জল ঢুকেছিল তাঁবুর মধ্যে—দমকা বাতাসে কবে কোন তাঁবু গিয়েছিল উপড়ে। তাঁবুর জল বার করার জন্যে কে কে বুটে ক'রে জল সেচেছিল, কিংবা তাঁবু সামলাবার জন্যে কে কে তাঁবুর খুঁটি ধরে সারারাত বসে ছিল, এইসব গল্প চলতে থাকে। এরই মধ্যে নেমে আসে অবসন্নতা, ক্লান্তিতে চোখের পাতা ভারী হয়ে ওঠে—ছেলেরা একে একে ঘুমিয়ে পড়ে।

খগেন আর পাঁচকড়ি লাইন থেকে ফিরেছে। তাঁবুর হাল দেখে নিজেরাই লেগে গেছে পেগগুলো ঠুকে দিয়ে দড়িগুলো টানটান ক'রে দিতে। দুপুর বেলায় অন্য ছেলেরা তাঁবুর মধ্যে ঘুমোচ্ছে। খগেন বা পাঁচকড়ি কেউই তাদের ঘুম ভাঙিয়ে ডাকতে পারে নি, কেমন যেন সঙ্কোচ লেগেছে। তারা টেকনিক্যাল ডিউটিতে রয়েছে, ফেটিগ খাটতে হয় না, প্যারেড করতে হয় না—এর জন্য নিজেদেরই যেন অপরাধী মনে হয়!

মেডিক্যাল এন. সি. ও. হাবিলদার ক্লার্ক ব্যানার্জি হাঁক মেরে উঠল, "এই শুনো জোয়ান, আজ তিন বজে 'সর্ট আর্ম' ইন্সপেকশন—হরেক জোয়ান আড়াই বজে ফার্স্ট এইড পোস্টকা সামনামে ফল্‌ইন—"

খগেন ডাকলে, "ও বাঁড়ুজ্যেদা, শোন না এদিকে!"

হাবিলদার ব্যানার্জি তাঁবুর একটা পোল ধরে দাঁড়িয়ে বললে, "কি হে, সব ঠিকঠাক আছে তো? তোমাদের নিয়েই তো ভাবনা বেশী। লাইনে যাচ্ছ, কোথায় কি ক'রে আসছ, কে জানে! আচ্ছা চলি ভাই, আবার সব তাঁবুতে তাঁবুতে বলে দিতে হবে। আমারও যেমন পাপের ভোগ—কার গণোরিয়া হলো, সিফিলিস হলো, আমাকেই বসে বসে দেখতে হবে।"

হাবিলদার ব্যানার্জি চলে গেলে পাঁচকড়ি ফিসফিস করে বললে, "এইবার তো

তাহলে সুনীলটা মরবে দেখছি !”

খগেন বললে, “সুনীল ! কেন, ও-কি তিন নম্বর গেটের খদ্দের নাকি ?”

“না রে, এলেম থাকলে সবই হয়, ও এইখানেই একটা জুটিয়ে নিয়েছে।”

“তাই বল। আর শয়তানটা আমাকে একটি কথাও বলে নি। তাই মাঝে মাঝে আমার কাছে দুচার টাকা ধার নেয় ! হ্যাঁ রে, কতদিন হলো রে ?”

“তা ব্যাপারটা আজ প্রায় একমাস হতে চলল। আরে ছাই, আমিও কি জানতাম নাকি ! সেদিন রাত প্রায় এগারোটার সময় দেখি, সুনীল মশারি থেকে বেরিয়ে, খালি পায়ে, বগলের তলায় একটা পুঁটলি নিয়ে গুটিগুটি বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি না চুপিসাড়ে উঠে বসে ধরলাম ওর একটা ঠ্যাঙ চেপে। তখন ও একে একে সমস্ত বললে। মেয়েটি নাকি ভীষণ গরীব। ও একটা কম্বল দিয়েছে, আর রোজ সের দুয়েক চাল, কিছু ডাল আর চিনি দিয়ে আসে। কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার ভট্‌চাযের সঙ্গে মাসে পাঁচ টাকায় একটা রফা ক'রে নিয়েছে। আর সত্যিই দেখলাম, মেয়েটার ওপর ওর রীতিমতো মায়া পড়ে গেছে।”

তিনটে বাজতে পনের মিনিটে হুইসিল পড়ল। ছেলেরা সব খালি গায়ে আণ্ডার-ওয়্যারের দড়ি বা হাফ প্যাণ্টের বোতাম খুলে রেডি হয়ে আছে। একে একে ক্যাপটেন সাহেবের সামনে গিয়ে কাপড় সরিয়ে দাঁড়াচ্ছে—ইন্সপেকশন শেষ হলে আবার তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছে।

দুটি ছেলে ধরা পড়েছে। তারা ছেলেদের দিকে পেছন ক'রে হসপিট্যাল টেণ্টের মধ্যে বসে আছে। অন্য আর সকলের বুক ধড়াস-ধড়াস করছে—কে জানে যদি তাদের কিছু গলদ বেরিয়ে পড়ে !

বাচ্চা মতন একটা ছেলেকে টানতে টানতে এনে জমাদার সাহেব বললেন, “দিস ব্যাগ্‌গার ওয়াজ ট্রাইং টু এসকেপ স্যার—”

ক্যাপটেন সাহেব ছেলেটির পিঠে একটি হাত রেখে বললেন, “কোই ডর নেহি—প্যাণ্ট খুলো—” ছেলেটিকে ইতস্তত করতে দেখে জমাদার সাহেবকে বললেন, “নাউ ইউ ক্যান গো জমাদার সাব—” মনক্ষুণ্ণ হয়ে জমাদার সাহেব চলে গেলেন। ক্যাপটেন সাহেব ছেলেটিকে আবার বললেন, “ঘাবড়াও মত্‌ বেটা, বেমার হোয়েগা, হম আচ্ছা কর ডেগা—” ভয়ে ছেলেটির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—কান্নায় সে ফুঁপিয়ে উঠেছে। ক্যাপটেন সাহেব নিজেই তার প্যাণ্ট খুলে দেখে বললেন, “টুমভি উধর বৈঠো—”

ইন্সপেকশন শেষ হলে হাবিলদার ব্যানার্জি ছেলে তিনটির রোগের ইতিহাস নিতে বসল। প্রথম দুটি সোজাসুজি স্বীকার করল, তারা তিন নম্বর গেটে

গিয়েছে। তৃতীয়টির দিকে ফিরে হাবিলদার ব্যানার্জি খিঁচিয়ে ওঠে, "এইতো কচি ছেলে, গলা টিপলে এখনো দুধ বেরোয়—গণোরিয়া বাঁধিয়ে বসেছে! কি রে, তোর বয়স কত?"

ছেলেটি বললে, "আজ্ঞে, ষোল বছর!"

"তবে তুই ভর্তি হ'লি কি ক'রে? বয়েস ভাঁড়িয়েছিলি বুঝি?"

"না বাবু, আমি বয়েস ভাঁড়াই নি—"

"তা বেশ করেছ। বলো তো বাছাধন, রোগটি বাঁধালে কি ক'রে?" ছেলেটি মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগল। হাবিলদার ব্যানার্জি বললে, "কাঁদলে কি হবে? রোগ যখন বাঁধিয়েছ, তখন মরো—আমি কি করব?"

হাবিলদার ব্যানার্জির পা জড়িয়ে ধ'রে ছেলেটি বললে, "বাবু আমারে বাঁচান। আমি যাতি চাই নি—হাবিলদার সাহেব আমারে নে গেল।"

"হাবিলদার সাহেব! কোন হাবিলদার সাহেব?"

"উই হাবিলদার জামান সাহেব।"

"ওঃ, তাই বলো! সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বল দেখি, কিচ্ছু লুকোবি না। একটা মিথ্যা কথা বলেছিস কি তোর নির্ঘাত মৃত্যু।"

ছেলেটি চোখের জল মুছে, কয়েকটা ঢোক গিলে বললে, "আমি এক্কেবারে সত্যি কথা বলতিছি বাবু। উই দিন হাবিলদার জামান সাহেব আমারে বলল, 'চল, গৌহাটি সফর করে আসি।' আমি তেনার সাথে গেলাম। গৌহাটিতে একটা বাড়িতে যাইয়া হাবিলদার সাহেব সিভিলিয়ান পোশাক পরলেন, আর আমারেও কাপড় দিলেন। তারপর রেল লাইনের ধারে একটা বস্তিতে নে গেলেন। সেখানে অনেকগুলো মেয়েলোক হাবিলদার সাহেবের সাথে কি সকল ফষ্টি-নষ্টি করল। তারপর একটা ঘরের মধ্যে যাইয়া হাবিলদার সাহেব আমারে বিছানার ওপর শোয়াইয়া জোর ক'রে খারাপ কাজ করলেন। আমি হাবিলদার সাহেবের পায়ে ধরে অনেক মানা করলাম—তবুও হাবিলদার সাহেব শোনলো না—"

হাবিলদার ব্যানার্জি সরব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "হুম—তা হাবিলদার সাহেব যা করল, বেশ করল। কিন্তু তোর রোগ হলো কি ক'রে?"

ছেলেটি কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললে, "আমি কি করব বলেন। হাবিলদার সাহেব বাইরে যাইয়া একটা মেয়েলোকরে ঘরের মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন। সেই মেয়ে লোকটাই তো জোর করিয়া আমারে—"

হাবিলদার ব্যানার্জি আর্তস্বরে বলে উঠল, "থাম—উঃ নরক—" ঝট ক'রে

উঠে পড়ে বললে, "দাঁড়া দেখছি, এই হাবিলদার সাহেবটির একটা ব্যবস্থা হয় কি না।" একটু পরেই জমাদার সাহেবের কাছ থেকে ধমক খেয়ে ফিরে এসে হাবিলদার ব্যানার্জি নিজের কর্তব্য কর্মে মন দিলে। নিজে হাবিলদার হয়ে তার জানা উচিত ছিল, কোন স্যাপারের মুখ থেকে হাবিলদারের বিরুদ্ধে নালিশ শোনা মিলিটারীতে চলে না।

মর্নিং সিক রিপোর্ট তৈরি ক'রে হাবিলদার ব্যানার্জি ক্যাপটেন সাহেবের কাছে এগিয়ে দিলে। সই করতে করতে ক্যাপটেন সাহেব বললেন, "ইট ইজ ফর ইওর নেগলিজেন্স, ব্যানার্জি—"

বিস্ময়ে হতবাক হাবিলদার ব্যানার্জি বললে, "হাউ—স্যার!"

ক্যাপটেন সাহেব বললেন, 'ইউ স্যুড হ্যাভ ইস্যুড প্রফিল্যাকটিক প্যাকেটস টু দিজ মেন। ইউ ক্যানট স্টপ দেম গোয়িং টু দি প্রস্টিটিউটস, বাট ইউ ক্যান প্রিভেন্ট দেম কনট্র্যাকটিং ভি. ডি।"

তিনটি ছেলে লজ্জিত, বিমর্ষ মুখে মাথা নীচু ক'রে হসপিট্যাল ট্রাকে উঠে বসল। ক্যাপটেন সাহেব তাদের দিকে বারেক চেয়ে, হাবিলদার ব্যানার্জিকে বললেন, "টেল দেম নট টু বি ওয়রিড—ভি. ডি. ইজ এ মার্শাল ডিজিজ—"

মশারি ফেলার সিডিউল্‌ড টাইম্ তখনও হয় নি। দিনের আলোয় সময়টা কোন রকমে কেটে যায়। তাঁবুর মধ্যে বিছানা থাকে গুটানো, শুধু গ্রাউণ্ড-শীট পেতে নিয়ে স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর বসে জনকয়েক মিলে গল্পগুজব করা চলে, পা ছড়িয়ে বুট-পট্টি পরেও খানিকটা শুয়ে থাকা চলে। কিন্তু দিনের আলো যতই ম্লান হয়ে আসতে থাকে, সে ম্লানিমা ছেলেদের মন ততই আচ্ছন্ন করতে থাকে। তারা ভাবতে বসে তাদের জীবনের কথা—যে জীবন আজ স্থির, অচঞ্চল, ঝিঁঝি পোকার অশ্রান্ত কাঁদনের মতো এক ঘেঁয়ে—যে জীবনের গণ্ডি হলো ক্যাম্পের এলেকা, আর তার পরিবেশ হলো—একদিকে কতকগুলো এন.সি.ও. ভি.সি.ও. অফিসার, আর অপরদিকে আজ্ঞাবহ কতকগুলো নির্জীব আধমরা মানুষ। একদল হুকুম করে, অপরদল হুকুম তামিল করে। তাই দিন যখন ম্লান হয়ে যায়, তখন ছেলেরা ভাবতে থাকে তাদের ফেলে-আসা জীবনের কথা, তাদের বাড়ীর লোকের কথা, আর তাদের অতি প্রিয়জনদের কথা।

বিপদ বাঁধে সন্ধ্যে থেকে রোলকলের সময় পর্যন্ত ফাঁকটাকে নিয়ে। আইন হচ্ছে, সন্ধ্যের আগে বিছানা পেতে মশারি ফেলে দিতে হবে, কিন্তু রোলকলের

আগে বুট-পট্টি খোলার হুকুম নেই। বাইরে অবিরাম বৃষ্টি ঝরে, তাঁবুর মধ্যে আঠারোটা মশারির চাপে দম বন্ধ হয়ে আসে। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের মন জীব-জগতের স্বাভাবিক বৃত্তির বশে উষ্ণ একটা আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু সে আশ্রয় কোথায়? তাই কারও চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে, আর কেউ কেউ ছোটে মদ আর নারীদেহের সন্ধানে।

কয়েকটা তাঁবুর পাশ দিয়ে মেজর সাহেব হনহন ক'রে হেঁটে চলে যান। মেডিক্যাল অফিসার পরামর্শ দিয়ে গেছেন, ছেলেদের যথেষ্ট পরিমাণে ঘুরেফিরে বেড়াবার ছুটি দিতে। তাহলেই আর তারা বেশ্যাবাড়ীর দিকে যাওয়ার জন্য অত বেশী ঝুঁকবে না—কোম্পানিতে ভি. ডি. রুগীও এত বেশী হবে না। মেজর সাহেব নিজে বেরিয়েছেন দেখতে, আটক অবস্থায় ছেলেরা ক্যাম্পের মধ্যে কি করে। মাঝামাঝি একটা তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে একটি ছেলেকে কাছে ডেকে বলেন, "তোমরা এ সময়ে তাঁবুর মধ্যে বসে আছ কেন?"

ছেলেটি মেজর সাহেবের লাল লাল চোখ আর থমথমে মুখের দিকে চেয়ে আমতা আমতা ক'রে বলে, "বিছানা করছিলাম স্যার—"

"ব্লাডি, ঝুটা বাত মত্ বলো—সাফ্ সাফ্ বাতাও, কোই ডর নেহি—"

নির্ভয়ে বলার আশ্বাসে ভয় আরও বেড়ে যায়। অফিসাররা যখন কড়া মেজাজে থাকেন, তখন ছেলেরা তাঁদের সহজে বুঝতে পারে। কিন্তু তাঁরা যখন সহানুভূতি দেখান, বন্ধুভাবে কথা বলেন, তখনই তারা পড়ে যায় ফাঁপরে—মন তাদের সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। ছেলেটা মরিয়া হয়ে বললে, "ছুটি নহি মিলতা সাব—"

মেজর সাহেব পা ঠুকে মাথা নেড়ে বললেন, "ঠিক হ্যায়", তারপর হনহন ক'রে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

সেদিনকার রোলকলে একটা ঘোষণা শুনে ছেলেরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রতিদিন ত্রিশজন ছেলেকে ছুটি দেওয়া হবে গৌহাটিতে সিনেমায় যাওয়ার জন্যে। রোজ বিকেল পাঁচটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত অফ্ ডিউটির ছেলেরা বাজারে, ফেরিঘাটে বা নদীর ধারে বেড়াতে পারবে, কিন্তু বাজারে কিছু কিনে খেতে পারবে না বা গ্রামের দিকে যেতে পারবে না।

ছেলেরা খুশি হলো। সকলের তো আর গ্রাম বা বস্তির দিকে যাওয়ার ঝোঁক প্রবল নয়। সাধারণের ঝোঁক বিকেলের দিকে একটু ঘুরে ফিরে বেড়াবে, দু-দশটা লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবে, দরকারি জিনিসপত্তর কিনবে—ব্যস। কিন্তু পরদিন সকালে কোম্পানির রেজিমেন্টাল পুলিশের পাঁয়তারা দেখে ছেলেরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। বাছাই করা বারোজন তাগড়া তাগড়া ছেলেকে নিয়ে

হলো আর. পি. স্কোয়াড। তাদের বুট থেকে মাথার চুল পর্যন্ত পালিশ করা হয়েছে, বাঁ হাতে আর. পি. লেখা ব্যাজ আর ডান হাতে দেড় হাত লম্বা ডাণ্ডা।

জয়ন্ত অমলকে বললে, "এটি হলো নতুন একটি ফাঁদ। ঠিক ফ্লাইট্র্যাপের মতো। একটা কাগজে খানিকটা চিটে-গুড় মাখিয়ে খোলা যায়গায় রেখে দিলে, যাতে মাছি এসে বসে।"

বেলা চারটের সময় ত্রিশজন ছেলে ফুল-ইউনিফর্মে কোয়ার্টার গার্ডের সামনে ফল্-ইন করল। তাদের ইন্সপেকশন করলেন সুবেদার সাহেব। প্রত্যেকটা ছেলের বুটের পালিশ, পট্টি বাঁধা, প্যাণ্টের ক্রীজ, জামার আস্তিন গুটানো, হ্যাট পরা, সব কিছুই তিনি তন্নতন্ন ক'রে দেখলেন। জনকয়েককে আবার বুট পালিশ ক'রে আসতে হলো, জনকয়েককে নতুন করে জামার বোতাম বসাতে হলো, দু'জনের প্যাণ্টের ফিটিং ঠিক না হওয়ায় নামই কাটা গেল। পরিশেষে ফৌজের সাজগোজ সম্বন্ধে সুবেদার সাহেব বললেন, "ফৌজকা ওয়ার্দি হোনা চাহি বিলকুল রেগুলাকা মাফিক—উস্‌সে যেতনা চমকায়গা, ওতনা অফসর্‌লোগ খুশি হোগা—ঔর তামাম্ আদমী জানেগা, ফৌজ কোই ভিখ্ মাঙনেওয়ালা নহি হ্যায়।"

সাড়ে চারটের সময় এক হাবিলদার সাহেব সিনেমা-স্কোয়াডের পেছনে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়েন, "সিনেমা-স্কোয়াড, বাই দি রাইট—কুইক মার্চ—"প্রথম ধাপ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের মনে খটকা লেগেছে, তারা সিনেমা দেখতে যাচ্ছে—না প্যারেড করছে! সিনেমা দেখার জন্যে যে সামান্য স্বাধীনতাটুকু একান্ত প্রয়োজন, সেটুকুও কি তারা পাবে না!

সিনেমার বই নির্বাচন থেকে বসার বন্দোবস্ত, সবই হাবিলদার সাহেবের হুকুম মতো করতে হলো। সিনেমা ভাঙার পর মার্চ ক'রে গৌহাটি স্টেশনে যাওয়া, সিঙ্গল লাইনে গাড়ীতে ওঠা, পাণ্ডুতে নেমে আবার ইন-থ্রিজ ফল্-ইন্, সিঙ্গল লাইনে ফেরি-ষ্টিমারে ওঠা, আমিনগাঁও-এ আবার ফল্‌ইন, আবার মার্চ ক'রে ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে হল্ট—রাইট্ ড্রেস—ডিসমিস্...

ক্ষুধায় পেটে জ্বালা ধরেছে, রাগে সমস্ত শরীর আগুন হয়ে উঠেছে। ছেলেরা গুম হয়ে বসে আছে, কথা কইলেই বুঝিবা বোমার মতো ফেটে পড়বে! মশারির মধ্যে থেকে কেউ জিজ্ঞেস করলে, "কি রে, কেমন সিনেমা দেখলি?" আবার কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলে, "কোন রেস্টুরেণ্টে খেলি রে?"

সিনেমা প্রত্যাগত ছেলেদের দাঁত কড়মড় ক'রে ওঠে। ইচ্ছে হয়, প্রশ্নকারীদের মুখের ওপর একটি ঘুঁষি জমিয়ে দিয়ে চিরদিনের মতো স্তব্ধ ক'রে দেয়! ওরা কি জানে না, একটা হাবিলদারকে যদি পাছায় লেলিয়ে দেওয়া হয়,

তাহলে কেমন সিনেমা দেখা হতে পারে ? কোন উত্তর না দিয়ে মগ আর প্লেট নিয়ে তারা লঙ্গরে চলে যায়।

খাওয়ার জিনিস যা কিছু, সবই আলগা পড়ে রয়েছে। কালিপড়া লণ্ঠনটা দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া বেরোচ্ছে—আলোটা লালচে হয়ে উঠেছে। টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। ত্রিশজন ছেলে সেখানে এসে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। একজন বললে, "আমি এসে দেখি, এক শালা কুকুর সুড় সুড় করে বেরিয়ে গেল।"

আর একজন বললে, "তাহলে নিশ্চয়ই খাবারে মুখ দিয়েছে—"

"দূর, মুখ দেবে কেন রে ! সেন্টি ডিউটি দিচ্ছিল।"

কয়েকজন হাঁক পাড়লে লঙ্গর কমাণ্ডারকে। একজন বলে উঠল, "অনর্থক চেঁচামেচি ক'রে লাভ কি, কোন কথা কি আর কানে যাবে—গাঁজার টানে এতক্ষণে বোধহয় শালাদের কানে তালা লেগে গেছে। যাও যাদুদের হাত ধরে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে এস।"

"কোথায় আছে বলো না, শালাদের ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে আসছি—"

"কোথায় আবার থাকবে—ওই আবগারী টেন্টে, মানে হাবিলদারস মেসে —দেখগে যা, মদ-গাঁজা খেয়ে সব শালা কাৎ হয়ে পড়ে আছে।"

"আর অর্ডারলি এন. সি. ও. ?"

"তিনি হয়তো সুবেদার সাহেবের পা টিপছেন—"

"তাহলে আমরা খাব কি ?"

"খাবে আর কি, বুড়ো আঙ্গুল চুষতে চুষতে শুয়ে পড়গে। মেজর সাহেব দয়া ক'রে সিনেমা দেখতে দিলেন, আবার খাওয়া !"

জনকয়েক গজ গজ করতে করতে তাঁবুর দিকে চলে গেল। বাকী যারা আছে, তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে, "খাবার আমাদের দিতেই হবে, না হলে সব শালা অফিসারকে টেনে হাজির করব। শালারা মদ গিলে আর মাগী নিয়ে পড়ে থাকবে, আর আমরা পেটের জ্বালায় ছটফট করব। মুখে তো দেখি সব শালাই গরীবের মা-বাপ—"

একজন বললে, "চলো, শালা গরীবের মা-বাপ মেজর সাহেবের কাছে—" আর একজন দৌড়ে গিয়ে ক্ষিপ্তের মতো বাসনগুলোর ওপর বুটসুদ্ধ লাথি মারতে লাগল। লাথির চোটে ভাত রাখার হুইল-ব্যারোটা উল্টে পড়ে গেল লণ্ঠনটার ওপর। বারকয়েক দপ দপ ক'রে উঠে লণ্ঠনটা গেল নিভে। হুড়মুড় ক'রে একরাশ অন্ধকার যেন সমস্ত জায়গাকে গিলে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন আঁতকে উঠল।

জমাদার দাশগুপ্ত ছুটে আসেন ক্যাম্পের মধ্যে। ছেলেরা থতমত খেয়ে যায়। জমাদার সাহেব হুংকার ছাড়লেন, "ব্যাপার কি, রাত দুপুরে এমন হট্টগোল করছ কেন ?"

একজন উত্তর দিলে, "আমাদের জন্যে কোন খাবার নেই।"

জমাদার সাহেব খিঁচিয়ে উঠলেন, "তোমরা এতক্ষণ ছিলে কোথায় ?"

"আমরা সিনেমায় গিয়েছিলাম।"

"তবে আর কি, আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করেছ! কে এমন তোমাদের কোলের মাগটি এখানে আছে যে, ভাত আগলে বসে থাকবে ? যাও, ওই যা আছে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে খেয়ে শুয়ে পড়গে—"

একজন রুখে ওঠে, "ওতে কুকুরে মুখ দিয়েছে—ওসব খাওয়া চলে না।"

জমাদার সাহেব বললেন, "না চলে, চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়।"

একটি ছেলে হঠাৎ আর সকলকে ঠেলেঠুলে জমাদার সাহেবের সামনে এসে বললে, "কেন, কেন আমাদের জন্যে খাবার রাখা হয় নি ?"

জমাদার সাহেব চোখ কুঁচকে ছেলেটির মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "কে হে ছোকরা, খুব যে লম্বা লম্বা কথা কইছ দেখছি। সামনে এস তো একবার, দেখি তোমার চাঁদবদনটা—"

ছেলেটি একেবারে জমাদার সাহেবের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। জমাদার সাহেব বললেন, "কি, তোমার কথার জবাব চাই নাকি ?"

ছেলেটি বললে, "নিশ্চয়ই—" কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমাদার সাহেব তার গালে ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলেন।

কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে ছেলেরা স্তব্ধ হয়ে যায়। তার পরই ঝটাপটির শব্দ, কয়েকটা গোঙানি, কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি—তারপর জমাদার সাহেবের আর্ত-চিৎকার, "গার্ড কমাণ্ডার—গার্ড কমাণ্ডার—"

সবকটা তাঁবু থেকে ছেলের দল পিলপিল ক'রে বেরিয়ে আসে। অনেকগুলো টর্চের আলোয় সকলকেই পরিষ্কার দেখা যায়। জমাদার সাহেবের জামাকাপড়ে কাদা মাখামাখি, মুখময় কাদা লেপা, আর গালের কষ বেয়ে রক্তের একটি ধারা গড়িয়ে পড়ছে···

একটু পরেই সুবেদার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে জমাদার সাহেব ঢুকলেন গার্ড-রুমে। নতুন কয়েদী চারজন একটা স্লিপারের ওপর বসে আছে হাঁটুর মধ্যে

মাথা গুঁজে। সুবেদার সাহেব তাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে গার্ড কমাণ্ডারকে তাড়া ক'রে উঠলেন, "এখনো এদের হ্যাণ্ড-কাপ লাগাও নি! হোয়াট দি ব্লাডি হেল আর ইউ ডুইং?"

গার্ড কমাণ্ডার থতমত খেয়ে ইয়াক্‌দানটার মধ্যে হাতড়াতে থাকে। অন-ডিউটি সেন্ট্রি প্রাণপণে রাইফেলটা চেপে ধরে, আর বেচারা স্পেয়াররা বিছানার ওপর বসে থাকার জন্যে ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে—ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে জমাদার সাহেবের ফুলে ওঠা মুখটার দিকে।

হ্যাণ্ড-কাপ লাগানো হলে, সুবেদার সাহেব একজনের চুলের ঝুঁটি ধরে বললেন, "বলো, কে তোমাদের একাজ শিখিয়ে দিয়েছে?

ছেলেটি অবাক হয়ে সুবেদার সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সুবেদার সাহেব স্বরের পর্দা নামিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি, তোমাদের কোন দোষ নেই, পেছন থেকে কেউ তোমাদের উস্কিয়ে দিয়েছে।"

ছেলেটি আরও ঘাবড়ে যায়। সুবেদার সাহেবের মোলায়েম স্বর আর সহানুভূতিতে সে ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলে। গ্রামের সাধারণ ছেলে, সরল মনে ভাবে, সুবেদার সাহেব বুঝি তাদের ওপর দয়াপরবশ!

কিন্তু সুবেদার সাহেবের প্রশ্নের জবাব তারা কেউই দিতে পারল না। তারপর, এক-একজনকে নিয়ে যাওয়া হলো সুবেদার সাহেবের তাঁবুতে। অতি মোলায়েম স্বরে সুবেদার সাহেব বললেন, "তোমরা যে কাজ করেছ, তার শাস্তি কি জানো? তোমাদের গুলি ক'রে মারা। কিন্তু বাঁচবার পথ এখনও তোমাদের আছে। বলো, জয়ন্ত আর অমল তোমাদের কি কি বলেছে?"

নির্বাক কয়েদীকে আপ্যায়ন ক'রে নিজের বিছানার ওপর বসতে বলে, তার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে সুবেদার সাহেব বললেন, "জয়ন্ত আর অমল যে একাজ করতে তোমাদের শিখিয়ে দিয়েছে, শুধু এইটুকু স্বীকার করলেই তোমরা ছাড়া পাবে। তার ওপর তোমাদের পুরস্কার দেওয়া হবে। যদি ছুটি চাও—কালই ছুটি নিয়ে বাড়ী যেতে পারবে। মাইনে তোমাদের বেড়ে যাবে। আর আমি তোমাদের ল্যান্স-নায়েক বানিয়ে দেব।"

ছেলেটি কান্নায় ভেঙে পড়ল, "আমি তো কেবল ওঁদের চিনি, কিন্তু কোন দিন তো ওনাদের সঙ্গে কথা কই নি স্যার—"

জমাদার সাহেব তার পিঠ চাপড়ে বললেন, "তাতে কি হয়েছে! তোমরা চারজনই যদি বলো, তা হলেই হবে। তাহলে তোমাদের শাস্তিটা তারাই পাবে, আর তোমরা ছাড়া পেয়ে যাবে।"

আধঘণ্টা তাদের সময় দেওয়া হলো ভেবে দেখবার জন্যে। একজন প্রায় রাজি হয়ে অপর তিনজনকে বললে, "যদি শুধু ওদের নামটা বললেই আমরা ছাড়া পাই—তা মন্দ কি!" পাশে দাঁড়িয়েছিল সেন্টি্র। সে বলে ওঠে, "খবরদার বেইমানি করবি না—জান দিবি তবু ইমান দিবি না।"

জয়ন্ত আর অমলকে যখন ফাঁসানো গেল না, তখন সুবেদার আর জমাদার সাহেব উঠলেন ক্ষেপে। শুরু হলো মারধোর। চারজনের আর্তনাদে আর কান্নায় ক্যাম্পের ঘুমন্ত ছেলেদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাদের মধ্যে কেউ বারেকের তরে বিছানার ওপর উঠে বসে, কেউ কেউ বিছানার মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে, আর কতক বারেক কান পেতে শুনে আবার পাশ ফিরে শোয়।

পরদিন সকাল দশটায় মেজর সাহেবের কাছে চারজনকে হ্যাণ্ড-কাপ বাঁধা অবস্থায় পেশ করা হলো। তাদের দেখেই মেজর সাহেব চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন—রিভলভারটাকে হোলস্টার থেকে টেনে নিয়ে গর্জন করে ওঠেন, "ব্লাড়ি, আই উইল শূট ইউ—"

সুবেদার সাহেব পেশ করলেন, জমাদার সাহেব সাক্ষীর জবানবন্দী দিতে শুরু করলেন। শুনতে শুনতে মেজর সাহেবের আঙ্গুল ক'টি রিভলভারের গ্রিপের ওপর নিশপিশ করতে থাকে। জবানবন্দী শেষ হলে মেজর সাহেব তাদের নাকের ডগায় রিভলভারটা নাড়তে নাড়তে বললেন, "ব্লাড়ি, তুম্‌লোগোঁকো হম্‌ আভভি গোলি করেগা—বোলো, ক্যা বল্‌নেকা হ্যায়?"

তাদের মধ্যে থেকে একজন যেন কিছু বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু মুখ থেকে কোন কথা বার হয় না, কেবল নীচের ঠোঁটটা কেঁপে ওঠে। মেজর সাহেব তার থুতনিতে একটি ঘুঁষি জমিয়ে দিয়ে বললেন, "বোলো—জলদি।"

হ্যাণ্ড-কাপ বাঁধা হাতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে ছেলেটি তার পাশের ছেলেটিকে আঁকড়ে ধরে কান্নায় একেবারে ফেটে পড়ে, "আমায় মেরে ফেলুন স্যার, খুন করুন, এখুনি গুলি করুন,—আর পারছি না স্যার—"

মেজর সাহেব চিৎকার ক'রে উঠলেন, "শাট আপ—" রিভলভারটাকে হোলস্টারের মধ্যে রেখে বললেন, "তোমাদের আমি কোর্ট-মার্শাল করব—তোমাদের পাগলা কুকুরের মতো গুলি ক'রে মারা হবে।"

বিস্ফারিত চোখে চারজন কয়েদী মেজর সাহেবের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে, তারপর অফিসের প্রত্যেকটি লোকের মুখের ওপর চোখগুলো ঘুরতে ঘুরতে জমাদার সাহেবের ফুলে ওঠা মুখখানার ওপর থেমে যায়।

মেজর সাহেব বললেন, "নন্দী, টেক দেম টু গার্ড রুম—"

সুবেদার সাহেব হাঁকলেন, "এ্যাকিউজড এ্যাণ্ড এসকর্ট—"

একটি ছেলে মাথা গুঁজে হঠাৎ মেজর সাহেবের পায়ের ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে ওঠে, "জমাদার সাহেবকে আমি মেরেছি স্যার—রাগে আর খিদেয় একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলুম। এমন কাজ আর কখনো করব না স্যার—হাজার গালাগাল খেলেও একটি কথা কইব না স্যার—মার খেতে খেতে মরে গেলেও কোনদিন হাত তুলব না স্যার। এবারকার মতো আমার প্রাণটা ভিক্ষা দিন। আমার বিধবা মাকে লুকিয়ে আমি মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছি। আমি মরে গেলে আমার মা-ও মরে যাবে স্যার—"

মেজর সাহেব পাইপটা ধরাতে ধরাতে হাঁকলেন, "নন্দী—"

সুবেদার নন্দী ঝুঁকে পড়ে শার্টের কলার ধরে ছেলেটিকে এক হেঁচকায় টেনে তুললেন। অন্য আর তিন জনের সঙ্গে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হাঁকলেন, "এ্যাকিউজড এণ্ড এসকর্ট—টু দি গার্ডরুম—কুইক মার্চ—"

সেইদিনই বেলা তিনটের সময় পুরো কোম্পানি ফল্‌ইন করিয়ে, ওই চার জনকে হ্যাণ্ড-কাপ বাঁধা অবস্থায় এনে মাঠের মাঝে দাঁড় করানো হলো। মেজর সাহেব বললেন, "এই চারজনকে কোম্পানি থেকে আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি। এরা সৈনিক হওয়ার অযোগ্য। যারা সামান্য ক্ষুধার জ্বালায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে, তাদের স্থান মিলিটারীতে নেই। আমি চাই ইস্পাতের মতো শক্ত মানুষ, কিন্তু এরা মেয়েমানুষেরও অধম। কাল রাতে এরা কতবড় অপরাধ করেছে, তা তোমরা জান। এদের শাস্তি দিতে হলে গুলি ক'রে মারা উচিত। কিন্তু এদের মতো নপুংসককে সে শাস্তি দিতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে। তাই আমি এদের কোম্পানি থেকে তাড়িয়ে দিলুম।"

বক্তৃতা দিয়ে মেজর সাহেব চলে গেলেন। সুবেদার সাহেব চারজন ল্যান্স-নায়েককে হুকুম দিলেন, "ওদের সমস্ত জামা কাপড় খুলে নাও।"

গার্ড কমাণ্ডার হ্যাণ্ড-কাপ খুলে নিয়ে চলে গেল। ল্যান্স-নায়েকেরা একে একে ওদের বুট, মোজা, জামা খুলে নিলে। ওরা চারজন দাঁড়িয়ে আছে কাঠের পুতুলের মতন। বাকি কেবল প্যাণ্টটা, ল্যান্স-নায়েকরা একটু ইতস্তত করে। সুবেদার সাহেব তাড়া দেন, "প্যাণ্টটা খুলে নাও।"

প্যাণ্টের বোতামে হাত দিতেই একটি ছেলে ল্যান্স-নায়েকটির হাত চেপে ধরে। গালফোলা জমাদার দাশগুপ্ত দৌড়ে গিয়ে, এক হেঁচকায় ল্যান্স-নায়েককে সরিয়ে দিয়ে, টানা হেঁচড়া ক'রে প্যাণ্টটা খুলে ফেলেন। ফল্‌ইন করা স্যাপারদের মধ্যে থেকে কে যেন চাপা গলায় বলে উঠে, "দূর শালা—" চাপা এই স্বর

ছড়িয়ে পড়ে প্রতিটি ছেলের কানে কানে—তারা একটু নড়েচড়ে দাঁড়ায়। সমস্ত কোম্পানিটা গুম হয়ে থাকে।

সুবেদার সাহেব মেজাজ আরও চড়িয়ে হুকুম দেন, "গলা ধাক্কা মারতে মারতে ওদের ক্যাম্পের বাইরে বার ক'রে দাও—"

ল্যান্স-নায়েকরা তাদের পিঠের ওপর হাত রাখতেই, চারটি উলঙ্গ পুরুষ-মানুষ যান্ত্রিক গতিতে চলতে থাকে। সুবেদার সাহেব হাঁক দেন, "কোম্পানি—এ্যাটেন—শান—" তারপর তিনি বলতে শুরু করেন, "আশা করি, এই দৃশ্য তোমাদের মনে থাকবে, যতদিন তোমারা মিলিটারীতে আছ। মিলিটারীতে ক্ষমা নেই—" তারপর একটু থেমে ছেলেদের মুখগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেন। তাড়াতাড়ি হুকুম দেন, "কোম্পানি—ডিসমিস—"

ডিসমিস হবার পরও ছেলেরা যেন নড়তে পারছে না। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে, ভয়ে তারা কেমন যেন জড়সড় হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে একজন দু'জন ক'রে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে—কারও মুখে একটি কথাও নেই।

হঠাৎ অনন্ত বলে ওঠে, "আমরা এতগুলো লোক চুপচাপ এমন একটা অমানুষিক কাণ্ড দেখে গেলাম!"

পাঁচকড়ি বললে, "আমরা দুচারজনে আর কি করতে পারি বলো!"

"পারতুম পাঁচকড়ি, অনন্ত অমলের মতো প্রতিবাদও করতে পারতুম।"

"তাতে আর কি লাভ হতো! অমলের মতো আর. আই. খাটতে হতো—কিন্তু এদের ওপর এই অত্যাচার তো বন্ধ হতো না।"

অমল বললে, "আমার একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি আছে, তোমাদের প্রাইভেট জামাকাপড় যা আছে দাও—ওদের দিয়ে আসি।"

জয়ন্ত বলে ওঠে, "ঠিক বলেছেন অমলবাবু। ক্যাম্পের ছেলেদের কাছ থেকে জামাকাপড়, আর তার সঙ্গে কিছু টাকা যদি ওদের হাতে দিয়ে আসতে পারেন, তাহলে মেজর সাহেবের ওই লেকচারের মাপসই জবাব দেওয়া হবে।"

পাঁচকড়ি লাফিয়ে ওঠে, "ঠিক বলেছ জয়ন্ত। আর ওদের বলে দেব, আমাদের দেওয়া জামাকাপড় প'রে, পকেটে টাকা ঝনঝনিয়ে যেন ওরা কোম্পানি অফিসের সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে যায়।"

কোম্পানি যেন শীগগিরই মুভ করবে, এমন একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে! আরও এগিয়ে যেতে হবে, একথা ভাবতে ছেলেদের বুক কেঁপে ওঠে। সমস্ত

বর্মাই তো এখন জাপানের দখলে, আসামের পূর্ব সীমানায় তারা প্রতীক্ষা করছে। মাত্র ছমাসের মধ্যে যে জাপান সিঙ্গাপুর থেকে মিচিনা দখল করেছে—তার কাছে আসাম আর কত দিন! আর তারা চলেছে সেই পূর্ব সীমান্তে! জাপানের হাতে নাস্তানাবুদ সৈনিক আর নাগরিক ইভ্যাকুয়িদের চেহারাগুলো বারবার চোখের ওপর ভেসে ওঠে।

ডিট্যাচমেণ্ট গুটিয়ে ছেলেরা ফিরে আসছে, আউট স্টেশন থেকে সকলকে উইথড্র করা হয়েছে, সমস্ত বুকিং ক্যানসেল ক'রে দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্প আবার জমজমাট। শিবেন বললে, "তাহলে শেষ পর্যন্ত প্রাণটা নিয়ে আর ফিরতে দিলে না দেখছি!"

খগেন বলে ওঠে, "এ শালার যুদ্ধ কি আর খতম হবে না! মস্কো-লেনিনগ্রাদ, কোনটাই তো ফল করল না, উল্টে জার্মানই এখন পেছু হটছে—তার মানে, যুদ্ধ এখন চলতেই থাকবে।"

সুনীল বললে, "জার্মানির জন্যে তো আমাদের কিছু এসে যাচ্ছে না। আমাদের ভাবনা জাপানকে নিয়ে। দুদিন বম্বিং ক'রে সেই যে ঘাপটি মেরে বসে গেছে, আর তো কোন সাড়াশব্দ দেখছি না। এদিকে এ শালারাও তৈরী হয়ে নিচ্ছে!"

সন্তোষ বললে, "কিন্তু একথা আমি বিশ্বাস করি না যে, জাপান এসে আমাদের স্বাধীন ক'রে দেবে।"

স্বরাজ বললে, "আর স্বাধীন হয়ে কাজ নেই, আগে প্রাণটাই বাঁচুক!"

অনন্ত বললে, "কিন্তু প্রাণ আর বাঁচবে কোথা থেকে? এ শালারাই তো চটকে প্রাণটাকে বার ক'রে দেওয়ার জোগাড় করেছে। আমার কি মনে হয় জানো? এ যুদ্ধের সবকিছুই নির্ভর করছে ইউরোপের ওপর। কিন্তু হিটলার-বাবা তো দেখছি নাজেহাল! সমস্ত ইউরোপ তুড়ি মেরে দখল ক'রে, শেষে কিনা রাশিয়ায় একেবারে ন্যাজে-গোবরে হয়ে পড়ল!"

জয়ন্ত বলে উঠল, "আর ওই রাশিয়ার মাটিতেই হিটলারকে কবরে যেতে হবে। ওখানে আর জারিজুরি খাটবে না—সমাজতন্ত্রের দেশ, সেখানকার মানুষই আলাদা। প্রত্যেকটা মানুষ জানে, তারা নিজের স্বার্থেই লড়াই করছে—আমাদের মতো ভাড়াটে সৈন্য তো আর নয়।"

সুনীল বললে, "তার মানে, রাশিয়ার কাছে হিটলার হেরে যাবে?"

"নিশ্চয়ই—রাশিয়ার জয় হবেই। রাশিয়া যে আজ আর আলাদা একটা দেশ নয়—রাশিয়া আজ দুনিয়ার মানুষের মুক্তির প্রতীক—যে সুখ আর যে শান্তির

জন্মে আমরা দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি—সেই সুখ আর শান্তি তারা গড়ে তুলেছে—"

বাইরে থেকে হন্তদন্ত হয়ে এসে অমল জয়ন্তর কাঁধে একটা টোকা মেরে ডাকলে, "শুনুন তো—একটু বাইরে আসুন।"

জয়ন্ত উঠে এসে বললে, "ব্যাপার কি ?"

"আপনার সঙ্গে কথা আছে, একটু আড়ালে বলতে হবে।"

জয়ন্ত চেয়ে দেখে অমলের মুখখানা উত্তেজনায় থমথম করছে। নদীর পাড় থেকে নেমে একেবারে জলের ধারে বসে জয়ন্ত বললে, "কি ব্যাপার ?"

অমল বারকয়েক আশে পাশে দেখে নিয়ে বললে, "জানেন, সুবেদার আর জমাদার সাহেব আমাদের দুজনকে ফাঁসাবার চেষ্টা করেছিল, ওই চারজন ছেলেকে দিয়ে—"

জয়ন্ত হেসে বললে, "সে তো ওরা করবেই। এরই জন্মে আপনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন !"

অমল বললে, "না, ঠিক তা নয়, আরও খবর আছে। সোহরাব আমাকে আড়ালে ডেকে বললে—"

"কি বললে ?"

"ওই চারজন ছেলেকে এরা ষড়যন্ত্র ক'রে তাড়িয়েছে। ঘটনার দিন রাত্রে সুবেদার সাহেবের মারের চোটে একজনের দাঁত নড়ে যায়, একজনের জিভ কেটে যায়, আর একজনের চোখে চোট লাগে—তা ছাড়া সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত তো হয়ই। পরদিন সকালে মেডিক্যাল এন. সি. ও. হাবিলদার ব্যানার্জি ডাক্তার সাহেবের কাছে ওদের দেখায়। ঠিক হয়, পরদিন ওরা হাসপাতালে ভর্তি হবে। এই না শুনে মেজর সাহেবের ভয় ঢুকে যায়। মিলিটারী আইনে কারও গায়ে হাত তোলার অধিকার কোন অফিসারেরই নেই। হাসপাতালে গিয়ে যখন ওরা সব কথা বলে দেবে, তখন নাকি হেড কোয়ার্টারস থেকে মেজর সাহেবের ওপর চাপ আসতে পারে। তাই মতলব ক'রে ওদের দিলে তাড়িয়ে, আর অফিসের কাগজ পত্তরে লিখে রেখেছে 'ডেজার্টার' বলে—"

জয়ন্ত গুম হয়ে বসে থাকে, বারেক কেবল 'হুম' ক'রে একটা শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

অমল আরও বলে, "আমরা যে ওদের জামা-কাপড় আর টাকা-পয়সা দিয়েছি, তা জানতে পেরে মেজর সাহেব তেড়েফুঁড়ে উঠেছিলেন। সুবেদার সাহেব নাকি তাঁকে ঠাণ্ডা করেন। তবে সুবেদার সাহেব বলেছেন, আমাদের তিনি

দেখে নেবেন।"

জয়ন্ত উত্তেজনায় ফুলে উঠল, "কিন্তু এ সমস্ত কথা আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন কেন অমলবাবু! আপনার উচিত ছিল ওদের সকলের সামনে বলা। এদের মুখোশ যতই খুলে দিতে পারবেন, ততই আমাদের শক্তি বাড়বে। সোহরাব যে আপনাকে ডেকে এই সমস্ত কথা বলেছে, কেন বলতে পারেন? বলেছে এইজন্যে যে, ও যা ভাবে, ও যা করতে চায়—সে কাজ আপনি করেছেন আগে।"

নয়

কয়েক দিনের মধ্যেই কোম্পানি মুভ করল। বিরক্ত, বিমর্ষ, বিবর্ণ মুখে আবার ছেলেরা কোম্পানির যাবতীয় মালপত্র ওয়াগনে বোঝাই করে। বিছানা কাঁধে নিয়ে বুকেপিঠে ওয়েব্ ইকুইপমেণ্ট এঁটে, তালে তাল মিলিয়ে মার্চ করে। কোথায় চলেছে, সে প্রশ্নটা বারম্বার মনকে নাড়া দিলেও, প্রথম বারের মতো ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করে না। যাযাবর এই জীবনের ছাঁচে তারা অনেকখানি ঢালাই হয়ে এসেছে।

ফেরিঘাটে ফিরে তারা স্টিমারে ওঠে। আপার ডেকে উঠে ছেলেরা সার বেঁধে রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়ায়। বর্ষার ব্রহ্মপুত্র দুকূল ভাসিয়ে হু-হু স্রোতে নেমে চলেছে। স্রোতের পানে চেয়ে চেয়ে দৃষ্টিবিভ্রম জাগে, যেন ইভ্যাকুয়ি সৈনিকের দল মিছিল ক'রে নেমে আসছে!

কে একজন বলে ওঠে, "ওরে, জাহাজখানার নাম প্রিন্স-অফ-ওয়েলস্—" আচম্বিতে তাদের মন আঁতকে উঠে—প্রিন্স-অফ-অয়েলস্! অপারাজেয় প্রিন্স-অফ-ওয়েলস্! আর জাপানীরাও তো খুব বেশী দূরে নয়!

পাণ্ডুতে নেমে কোম্পানি নদীর ধারে প্রকাণ্ড এক মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। একজন হাবিলদার পাংশুমুখ ছেলেদের ওপর দয়াপরবশ হয়ে বললেন, "ঘাবড়ো মত্ জোয়ান—কোম্পানি হিঁয়াই রহেগা।"

একটা ছেলে বললে, "এরই জন্যে এত পাঁয়তারা! এই যে এতক্ষণ ধ'রে কোথায় যাচ্ছি—কোথায় যাচ্ছি ক'রে হাঁপিয়ে মরলুম, এর জন্যে যে হার্টের অসুখ হয়ে যেতে পারে!"

আর একটি ছেলে বললে, "তা হোক—তা বলে তো হুকুম অমান্য করা যায় না। হেড কোয়ার্টারসের হুকুম, মুভমেণ্টের খবর গোপন রাখতে হবে। সুতরাং তুমি যদি তাঁবু থেকে বেরিয়ে পায়খানায় যাও, সে কথা তুমি কাউকেও জানাতে পারবে না।"

মাঠের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে শুরু হলো লেকচার। বিষয়টা হলো, অবস্থার পরিবর্তন। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতটে সমস্ত এলেকা সমরাঙ্গন বলে ঘোষিত হয়েছে। সুতরাং নদী পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রবেশ করেছে খাস লড়াইয়ের মাঠে—ফিল্ড সার্ভিসে। নদী পার হওয়ায় তারা হয়ে উঠেছে অগ্রগামী বাহিনী, এখানে তাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। এখন থেকে চলাফেরা করতে হবে অত্যন্ত সাবধানে, সবদিকে নজর রেখে, কথা কইতে হবে একেবারে মেপেজুঁকে। সিভিলিয়ানদের সঙ্গে মেলামেশা করা চলবে না—শত্রুর কান সর্বত্রই পাতা আছে।

একটি ছেলে বললে, "শুধু ব্রহ্মপুত্র পার হওয়ায় এত কাণ্ড ঘটে গেল!"

"তা গেল না? এখান থেকে আর যে পালিয়ে বীরত্ব দেখানোর পথ পাবে না—এই ব্রহ্মপুত্রে ডুবে মরতে হবে!"

খুশ-খবরও ছিল এর সাথে। ফিল্ড সার্ভিসে আসার জন্যে স্যাপাররা পাবে মাসে পাঁচ টাকা ভাতা, বাড়ীতে চিঠি লিখতে পারবে বিনা ডাক টিকিটে, মাথা পিছু র‍্যাশান এখন থেকে ডবল।

এই খবরটা দিয়েই কোম্পানিকে ডিস্‌মিস্ করে দেওয়া হলো। খুশির যে রেশটুকু মনের মধ্যে গুঞ্জন করতে থাকে, তারই সূত্র ধরে ফেটিগ শুরু হয়। ওয়াগন খুলে, তাঁবু নামিয়ে শুরু হয়ে যায় কাজ। মেজর সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে স্পেশ্যাল পার্টি তৈরি ক'রে হুকুম দেন, "ম্যায় এক ঘণ্টাকে অন্দর হরেক জোয়ানকে লিয়ে চা রেডি মাঙতা।" হুকুমটা এমন ভাবে দেওয়া হয়, যাতে কোম্পানির অধিকাংশ ছেলেরই কানে কথাটা পৌঁছায়। ফেটিগ খাটার উৎসাহ যেন আরও খানিকটা বেড়ে যায়। সেই উৎসাহের মুখে ছেলেরা তাদের অজান্তে বারেক ভেবে ফেলে, "না, মেজর সাহেব লোকটা মন্দ নয়—প্রাণে মায়া-মমতা আছে।"

মাঠটা বেশ বড়ই। প্ল্যান হলো—মাঝখানে থাকবে প্যারেড গ্রাউণ্ড, আর তার চারপাশে পড়বে তাঁবু। লোকো আর ট্রাফিক তাঁবু খাটানো হয়ে গেলেই আধঘণ্টার ব্রেক-অফ্। সেই ফাঁকে দেওয়া হলো চা আর জ্যাম-বিস্কিট। মেজর সাহেবের জয়জয়কার পড়ে গেল।

পাণ্ডু ক্যাম্পের জীবনে নতুনত্ব কিছু না থাকলেও স্বাচ্ছন্দ্য যেন আর একটু

বেড়েছে। জায়গা অনেকখানি, তাঁবুও পড়েছে অনেকগুলো, তাঁবু পিছু লোকের সংখ্যাও কম। খাওয়ারও উন্নতি হয়েছে। মানে, পরিমাণের কড়াকড়ি অনেক কমেছে। জায়গা হিসাবে পাণ্ডু আমিগাঁও-এর তুলনায় অনেক ভালো। ওখান থেকে কামাক্ষ্যা যাওয়া যায়, গৌহাটি হেঁটেই ঘুরে আসা যায়। স্টেশনের ধারে বাজার, স্টেশনের ওপর ভালো চায়ের স্টল, বাজারের পাশেই রেলওয়ে কলোনি। ক্যাম্পের সামনের রাস্তা ধরে দক্ষিণ মুখে কিছুটা হাঁটলে বেশ কিছুটা বর্ধিষ্ণু একটি গ্রাম।

এখানে এসে টেকনিক্যাল ডিউটির ওপর চাপ পড়েছে আরও বেশী। কোম্পানির দুই-তৃতীয়াংশ ছেলে নিজেদের ক্যাটেগরির কাজে বহাল হয়েছে। কাজেই অবশিষ্ট ছেলেরা কোয়ার্টার গার্ড ডিউটি থেকে লঙ্গরখানায় আলুছাড়ানো ফেটিগ পর্যন্ত সমস্ত কাজই ক'রে চলে।

কিন্তু আকস্মিকভাবে আর অতি সঙ্গোপনে একটা পরিবর্তন ঘটে গেল কোম্পানিতে। জুলাই মাসের শেষ তারিখে মেজর রায় হঠাৎ কোম্পানি থেকে চলে গেলেন। এর আগেও তিনি মাঝে মাঝে চলে গিয়েছেন, আবার দু'এক দিনের জয়ট্রিপের পর ফিরে এসেছেন। কিন্তু এবার আর ফিরলেন না। যেমন নিঃশব্দে মেজর রায় চলে গেলেন, তেমনি নিঃশব্দে এলেন এক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেজর। কোম্পানির ছেলেরা মেজর রায়কে না দেখে যতটা অস্বস্তি বোধ করেছে, তার চেয়ে বেশি অস্বস্তি বোধ করেছে পরদিন মেজর ব্রাউনকে দেখে।

শেষ পর্যন্ত কোম্পানি-অফিসের হাবিলদার ক্লার্কেরা ঘটনার ওপর আলোক-পাত করলেন। ক্রীপস প্রস্তাব কংগ্রেস সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে—মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, দেউলিয়া ব্যাঙ্কের ওপর ফাঁকা চেক ভারত গ্রহণ করবে না। এর ফলে ভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব জটিল হয়ে পড়েছে—যে-কোন দিনই ভারতবাসীর বিক্ষোভ ফেটে পড়তে পারে। মেজর রায়ের অপসারণ নাকি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। একে মেজর রায় বাঙালী, তার ওপর কোম্পানির অধিকাংশ ছেলেও বাঙালী। তাই উর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষ মেজর রায়কে সরিয়ে নিয়েছে। বিদ্রোহী বাঙালী জাতিকে ব্রিটিশ সরকার বিশ্বাস করে না।

কোম্পানির জীবনে এটা একটা রাজনৈতিক ঘটনা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এ ব্যাপারটা জড়িত। কিন্তু এমন দিশেহারা ছেলেরা আর কোন দিন হয় নি। যে মেজর রায় ব্রিটিশের নীতিতে অত্যাচার আর নির্যাতন চালিয়ে এতগুলো মানুষকে ক্রীতদাসের পর্যায়ে এনে ফেলেছে—এ হেন বিশ্বস্ত অনুচরকেও ব্রিটিশ সরকার বিশ্বাস করে না!

ছেলেরা এই যেন প্রথম উপলব্ধি করে, মেজর রায় ছিলেন একজন বাঙালী। বাঙালী বলতে যে বিশেষ ধরনের চরিত্রকে বোঝায়, তার কোন আভাস তো এই সুদীর্ঘ দিনের মধ্যে তারা পায় নি। তারা দেখেছে, মেজর রায় ছিলেন শুধুই একজন অফিসার, মিলিটারী আইনে ব্রিটিশ অফিসার—যে অফিসারের কাজ হচ্ছে বেয়নেটের ডগায় আনুগত্য আদায় করা।

বিস্মিত, বিমূঢ় ছেলের দল ভেবেছে, এ হেন মেজর রায় বিদ্রোহ করতে পারেন—এ সন্দেহ যারা করেছে, তারা আবার কোন জাতের লোক! মেজর রায় বিদ্রোহ করবেন কার বিরুদ্ধে?

৯ই আগস্ট ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে যে আলোড়ন আনল, তার প্রতিঘাত সৈনিক জীবনে বিরাট এক সমস্যার সৃষ্টি করল। জাতীয় নেতৃবৃন্দকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করায় সৈনিকদের মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু সংগঠন তাদের মধ্যে নেই; অত্যাচারে, নিষ্পেষণে তাদের জীবনকে দলে পিষে দিয়েছে সামরিক কর্তৃপক্ষ। সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গেও তাদের কোন যোগাযোগ নেই। তাই পথ তারা জানে না তাদের বিক্ষোভকে প্রকাশ করার। জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এই মানুষের দল রুদ্ধ ক্রোধে ফুলে ওঠে, নিস্ফল আক্রোশে ঠোঁট কামড়ে ধরে, হতাশায় মুহ্যমান হয়ে যায়।

ক্রীপস মিশন সৈনিকদের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। তারা যে অনাথের মতো ব্রিটিশের খপ্পরে এসে পড়েছে, উপায় খুঁজে না পেয়ে অত্যাচার আর নির্যাতন সহ্য ক'রে চলেছে—এই শোচনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একটি মাত্র রাস্তা তারা দেখেছিল একটি জাতীয় সরকারের মধ্যে। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের কলঙ্কিত এই সৈনিকের পোশাক আবার গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠবে—মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা তারা পাবে।

কিন্তু ঘটনার গতি যেভাবে ঘুরে চলেছে, তাতে তাদের সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। খবর এসেছে, কামপুর স্টেশনে এক জনতা মিলিটারী স্টেশন মাস্টারকে মেরে জখম করেছে—নওগাঁয় একটা মিলিটারী ক্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়েছে—গৌহাটির রাস্তায় কয়েকজন সৈনিক লাঞ্ছিত হয়েছে।

এই খবরের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পের আবহাওয়া যায় বদলে। সমস্ত ক্যাম্প এলেকাটাকে কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। কোম্পানির ওপর ব্যারাক কনফাইনমেন্টের হুকুম জারি হয়। ক্যাম্প ডিফেন্সের জন্যে ফ্লাইং গার্ড মোতায়েন

হয়ে যায়। ছোট ছোট ডিট্যাচমেণ্টগুলো তুলে এনে, বড় ডিট্যাচমেণ্টগুলোয় রিইনফোর্সমেণ্ট পাঠানো হয়। ক্যাম্পে পি. টি. প্যারেড সবই বন্ধ। তাঁবুর বাইরে ছেলেরা বড় একটা যায় না—সারাদিন গুম হয়ে বসে থাকে, হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে কেবল ভাবে আর ভাবে—সে ভাবনার যেন আর শেষ নেই! এই দোটানার মাঝে তারা কি করবে ভেবে পায় না। দেশের লোক তাদের শত্রু মনে করছে। আর দেশের যারা শত্রু, তারা তাদের ব্যবহার করছে দেশের লোকের বিরুদ্ধে! কিন্তু দেশের দুয়ারে ফ্যাশিস্টরা বর্বর থাবা মেলে বসে আছে!

সুনীল বলে উঠল, "ওঃ, শেষ পর্যন্ত এই কপালে ছিল! শেষে কিনা সত্যি-সত্যিই দেশের শত্রু হলাম!"

পাঁচকড়ি বলে উঠল, "শত্রু তো আর আমরা হই নি—ওরা শুধু শুধুই আমাদের শত্রু মনে করছে।"

শিবেন বললে, "শত্রু ছাড়া আর কি! সারা ভারতবর্ষে যখন বিদ্রোহ চলেছে, তখন আমরা ব্রিটিশের হুকুমে তাদের ওপর গুলি চালাচ্ছি!"

জয়ন্ত বললে, "এ তো বিদ্রোহ হচ্ছে না, এ হচ্ছে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা। ভারতবর্ষটা ব্রিটিশদের দেশ নয়—আমাদের দেশ।"

খগেন বললে, "ঠিকই তো। আর ব্রিটিশকে যদি কাবু করতে হয়, সে তো আমরাই পারি। আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে সে কাজ করলেই তো হতো। তা না, আমাদের পুড়িয়ে মেরে দেশ স্বাধীন হচ্ছে—কেন আমরা কি ব্রিটিশবাচ্চা নাকি?"

পাঁচকড়ি ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে চুপ করতে ইশারা করলে। জমাদার দাশগুপ্ত তাঁবুর মধ্যে ঢুকে বললেন, "কি হে, কিসের মিটিং হচ্ছে?"

পাঁচকড়ি বললে, "মিটিং না স্যার—এই একটু গল্প-গুজব করছি—"

এদিক ওদিক একটু দেখে নিয়ে জমাদার সাহেব চাপা গলায় বললেন, "শুনেছ, কোলকাতায় ভীষণ কাণ্ড হচ্ছে! কংগ্রেসদের সঙ্গে মিলিটারীদের রীতিমত লড়াই শুরু হয়ে গেছে। এইভাবে যদি আর কিছুদিন চলে, তাহলে আর জাপানকে ঠেকায় কে! কিন্তু জাপান যে কেন বর্মা দখল ক'রে চুপচাপ বসে রয়েছে, বুঝি না! এই তো মৌকা! এই মৌকায় চটপট এসে ঢুকে পড়ুক—তাহলে তো সব ঝামেলাই চুকে যায়—"

জয়ন্ত কি একটা বলার জন্যে মুখিয়ে ওঠে, পাঁচকড়ি তার হাতটা চেপে ধরে। জমাদার সাহেব বললেন, "আজ তোমাদের আট জনের নাইট ডিউটি। ভালো ক'রে ডিউটি দিও কিন্তু—এখানকার হালচাল তেমন ভালো নয়—অনেক রকম

সন্দেহজনক খবর এসেছে—"

শিস দিতে দিতে জমাদার সাহেব বেরিয়ে গেলেন। পাঁচকড়ি জয়ন্তকে বললে, "তুমি চট ক'রে অমন মাথা গরম কর কেন? ও শালার কুত্তাকে ওসব কথা বলে লাভ কি?"

জয়ন্ত ফুঁসে উঠল, "দেখ একবার মজাটা! এখানে দেশসুদ্ধ লোক জাহান্নমে যাক, তাতে ওঁর কিছু এসে যায় না! ওঁর যত ভরসা জাপানের ওপর! জাপান যেন শ্রীগৌরাঙ্গের চেলা হয়েছে; আর মালয়, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, বর্মায় প্রেম বিলিয়ে বেড়াচ্ছে! এদেরই মতো সব লোক আজ আমাদের মতো মানুষের ব্রিটিশ-বিদ্বেষের সুযোগ নিচ্ছে। ও ভাবছে, জাপান ভারতে ঢুকলেই মোসাহেবি ক'রে একটা মেজর কি কর্ণেল হয়ে যাবে!"

রাত দুটো থেকে চারটে ক্যাম্পের উত্তর-পূর্ব কোণে পাঁচকড়ির ফ্লাইং গার্ড ডিউটি। রাইফেলটাকে স্লিং-আর্ম ক'রে সে টহল দিচ্ছে। তার কাছে আছে দশ রাউণ্ড গুলি, পাঁচ রাউণ্ড লোড করা আর পাঁচ রাউণ্ড পাউচ-এ। তাদের ওপর ঢালাও হুকুম, দিনের বেলায় পঞ্চাশ গজ দূরে হণ্ট করানো, আর রাতের বেলায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে কাউকে দেখলে বিনা বাক্যব্যয়ে গুলি করা।

ঘুম থেকে উঠে এসেছে পাঁচকড়ি—চোখে তখনও ঘুম জড়িয়ে আছে। আশেপাশে বারকয়েক চেয়ে দেখলে, একটি খুঁটিও নেই যে তাতে হেলান দিয়ে একটু ঝিমিয়ে নেবে। বিরক্ত হয়ে সে জোর কদমে খানিকটা টহল দিতে থাকে, ঘুমের আমেজটা কাটিয়ে নেওয়াই ভালো।

টহল দেওয়ার মাঝখানে কান খাড়া ক'রে হঠাৎ পাঁচকড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। যেন চাপা একটা ফিসফিসানির শব্দ ভেসে আসছে! কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কান পেতে—নাঃ, তেমন কিছু নয়, বোধহয় মনের ভুল! রাইফেলটার ম্যাগাজিনে একটা চাপড় মেরে আবার টহল দিতে থাকে। আবার সে থমকে পড়ে—সত্যিই যেন অনেকগুলো লোকের চাপা স্বর ভেসে আসছে পুব দিক থেকে। নিশুতি অন্ধকার রাত, জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। কেবল দূর থেকে ওয়াগনের ঠোকাঠুকি আর ইয়ার্ড পাইলটের হুইসিল মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। কিন্তু তারই মাঝে সত্যি যেন অনেকগুলো লোকের চাপা স্বর দূরে একটা জায়গায় জমে আছে। তার কপালটা কুঁচকে ওঠে, শরীরটা সিরসির করতে থাকে।

ক্যাম্পের সামনে প্রায় একশো গজ ফাঁকা জায়গা, তারপর পাণ্ডু ইয়ার্ড—সব কটা লাইনে ওয়াগন ভর্তি। পাঁচকড়ির সন্দেহ হয়, ওই ওয়াগনগুলোর পেছন থেকে ফিস্‌ফিস্‌ শব্দটা ভেসে আসছে। রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে সে

মাজল মাটির দিকে নামাল। বুড়ো আঙ্গুলে সেফটি ক্যাচটাকে ঠেলে দিয়ে, বোল্ট পেছনের দিকে টানলে। একটা রাউণ্ড ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে রাউণ্ডটা কুড়িয়ে নিয়ে ম্যাগাজিনের মধ্যে পুরে দিলে। নীল্ ডাউন পজিশনে রাইফেল ধরে বাঁ চোখ বুজে, ডান চোখে 'ফোর সাইটকা নক ঔর ব্যাক সাইটকা ইউ' কিছুই দেখতে পেলে না। অন্ধকারে সমস্তই একাকার হয়ে গেছে।

হঠাৎ পাঁচকড়ির মনে হয়, সত্যিই যদি লোকগুলো আক্রমণ করে! পাঁচ রাউণ্ড গুলিতে সে কি অতগুলো লোককে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে! ডান হাতে পাউচটা টিপে দেখে, আরও একটা চার্জার ভর্তি গুলি রয়েছে। কিন্তু ওই অতগুলো লোক যখন তেড়ে আসবে, তখন কি আর সে লোড করার সময় পাবে? বাকী পাঁচ রাউণ্ড লোড ক'রে নিলে কেমন হয়?

আগুনের একটা শিখা দেখে পাঁচকড়ি চমকে দুপা পেছিয়ে যায়। আগুনটা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে, টকটকে লাল আগুন আর তার কুণ্ডলী পাকানো কালো কালো ধোঁয়ায় ইয়ার্ডের আলোটা ঢেকে যাচ্ছে। পাঁচকড়ির পা দুটো ঠক-ঠক ক'রে কাঁপছে, বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে। কপালের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম মিশে গিয়ে একটি ধারা হয়ে নেমে আসছে, বড় একটা ফোঁটা হয়ে নাকের ডগায় ঝুলছে। মাথার মধ্যে কী যেন একটা দপ দপ ক'রে জ্বলছে। হাতের চেটোয় সে তার সমস্ত মুখটা মুছে নিয়ে হ্যাটটা পেছনে ঠেলে দিলে।

ওয়াগনের পেছনে সেই চাপা স্বর হঠাৎ চিৎকারে ফেটে পড়ল। পাঁচকড়ি রাইফেল কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে ট্রিগারে আঙুল রাখলে। ব্যাকসাইটের মধ্যে দিয়ে ফোরসাইটের নক্ এবার সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। অনেকগুলো লোক গোটাকুড়ি মশাল হাতে জমা হয়েছে। তাদের রণধ্বনি ফেটে পড়ল, "ব্রিটিশ—ভারত ছাড়ো।"

পাঁচকড়ির হাত কেঁপে ওঠে। 'গুলজারিকে বিচেবিচ্ ছে বজে' থেকে রাইফেলের মুখ সরে যায়—তার শিথিল হাতের ওপর রাইফেলটা কাৎ হয়ে পড়ে। কেমন করে এদের ওপর সে গুলি চালাবে! এরা যে দেশভক্ত, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—প্রতিটি ভারতবাসীর শত্রু—ব্রিটিশকে উচ্ছেদ করতে!

আবার চিৎকার উঠল, "ব্রিটিশ—ভারত ছাড়ো—" লোকগুলি জ্বলন্ত মশাল উঁচু ক'রে দুরন্ত বেগে দৌড়ে আসছে। উন্মত্তের মতো মশালগুলো মাথার ওপর তুলে ধ'রে বন বন করে ঘোরাচ্ছে।

পাঁচকড়ি আবার রাইফেলটা মজবুত ক'রে ধরেছে, বাটের ওপর তার উত্তপ্ত গাল চেপে ধরে নিশানা নিচ্ছে। আর বেশী দূরে নয়, বড় জোর পঞ্চাশ গজ! ক্যাম্পে পাঁচশো ছেলে ঘুমোচ্ছে—তার হাতে তাদের নিরাপত্তার ভার তুলে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে! তারা তো দেশের শত্রুতা করার জন্যে মিলিটারীতে ভর্তি হয় নি! দেশ-গাঁয়ে পেট চলে নি, শহরে চাকরী জোটে নি, বৃদ্ধ বাপ-মার মুখে অন্ন দিতে পারে নি, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোনদের পেট ভরে খাওয়াতে পারে নি—তাই তারা আজ মিলিটারীতে!

রাইফেলের গ্রিপে পাঁচকড়ির হাত আরও চেপে বসেছে, বাটটা কাঁধের ওপর ঠেসে ধরেছে, পয়েণ্ট-অফ-ব্যালান্সে তার হাত স্থির হয়ে গেছে, কেবল ট্রিগারের ওপর তর্জনিটা তার কাঁপছে।

পাঁচকড়ি চিৎকার ক'রে ওঠে, "হল্ট"—এতজোরে চিৎকার সে বোধহয় তার জীবনে আর কোন দিন করে নি। মশালের আগুন তখনো সেই উন্মত্ত গতিতে এগিয়ে আসছে। আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে সেই একটি মাত্র রণধ্বনি, "ব্রিটিশ—ভারত ছাড়ো।"

পাঁচকড়ির শরীর টলছে। নিঃশ্বাস সে এবার বন্ধ করেছে, ট্রিগারের ফার্স্ট প্রেসার নেওয়া হয়ে গেছে। তার কানে ক্যাম্পের পাঁচশো ছেলের অসহায় আর্তনাদ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। চোখ বুজে পাঁচকড়ি ট্রিগার দাবালে, বোল্ট টেনে আবার ট্রিগার দাবালে—আবার বোল্ট টানলে—আবার ট্রিগার দাবালে—আবার আবার—

কোয়ার্টার গার্ডের পাগলা-ঘন্টি তখনো বেজে চলেছে। ক্যাম্পের সমস্ত ছেলে মাঠের মাঝে ফল্‌ইন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। "গার্ড—স্ট্যাণ্ড-টু" পজিশনে কোয়ার্টার গার্ডের কোণে কোণে সেন্ট্রিরা খাড়া হয়ে গেছে। ফায়ার-ফাইটিং-পার্টি ফায়ার-এক্সটিনগুইশার নিয়ে 'অন গার্ড' পজিশনে দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াটার-ফেটিগের দল নদীর ধারে গিয়ে প্রাণপণে হ্যাণ্ড পাম্প চালাচ্ছে।

সুবেদার নন্দী আর তিনজন অফিসার রিভলভার নিয়ে পাঁচকড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। পাঁচকড়ির চোখের ওপর মশালের আলোগুলো তখনো ঘুরছে—নেবুলার মতো ঘুরছে—কেবল ঘুরছে আর ঘুরছে……

কয়েকদিন পরের ঘটনা—আবহাওয়াটা যেন অনেক সরল হয়ে এসেছে—কোম্পানির স্বাভাবিক জীবন ধীরে ধীরে ফিরে আসছে।

কোম্পানির ডাক এসে পৌঁচেছে। ছেলেরা অফিসের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে—কখন অর্ডারলি এন. সি. ও. চিঠির বাণ্ডিলটা নিয়ে বেরিয়ে আসবে! একখানি চিঠির প্রত্যাশায় সমস্ত মনটা তাদের আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। তাদের ফেলে-আসা জীবনের সঙ্গে আজকের জীবনের এই তো একটি মাত্র গ্রন্থি! চিঠির মধ্যেকার দুটো স্নেহের কথা, দুটো সহানুভূতির কথা, তাদের হিতাহিতের জন্যে কারও আকুল আকুতি, তাদের পথ চেয়ে কারও অধীর প্রতীক্ষা—ওইটুকুই সৈনিক জীবনের পাথেয়। তাই চিঠিই তাদের সম্বল।

ডাক বিলি হয়ে গেছে। যাদের চিঠি এসেছে, তারা খুশিতে ভরপুর হয়ে একান্তে গিয়ে চিঠি পড়তে বসেছে। যাদের আসে নি, তারা মুখ ভার ক'রে শুয়ে পড়েছে—চোখ বুজে কপালের ওপর হাত রেখে ভাবছে, কেন তার বাড়ীর লোক তার প্রতি এত নির্মম! তাকে কি আর তাদের কোন প্রয়োজনই নেই! অভিমানে তাদের বুকের মধ্যেটা গুমরে গুমরে ওঠে।

অমল পেয়েছে একখানা চিঠি। চিঠিখানা পকেটে রেখে সে অন্য সমস্ত কাজ একে একে শেষ করেছে। শত কাজের মধ্যে বারবার সে বুক পকেটের ওপর চাপ দিয়ে খামখানাকে অনুভব করেছে। থেকে থেকে আনমনা হয়ে ভেবেছে, কে লিখেছে—বাবা? বিমল? কমল? মিনি? কিংবা রিণি কি তার আঁকা-বাঁকা অক্ষর দিয়ে একখানা কাগজ ভরে দিয়েছে! চোখের ওপর ভেসে উঠেছে তাদের ছোট গৃহখানি—আনাচে কানাচে তার কতই না স্মৃতি মাখানো। বারবার তার চোখ ফেটে জল এসেছে।

সব কাজ সেরে ব্যারাকে ফিরে, বিছানাটা পেতে শুয়ে অমল হাত-পা ছড়িয়ে দিলে—এইবার সে চিঠিটা পড়বে। একথাটা ভাবতেই যেন মনটা কানায় কানায় ভরে ওঠে। তাহলে সে এখনো বেঁচে আছে—তার জীবনকে ঘিরে আছে আরও অনেক লোক! খামখানা সে খুলে ফেললে—

পূজনীয় মেজদা,

অনেকদিন তোমার কোন খবর পাই নি। তোমার জন্যে ভেবে ভেবে আমরা পাগল হয়ে যাব নাকি! এখানে যে সমস্ত কাণ্ড হচ্ছে, তা দেখে তো আর স্থির থাকা যায় না। মিলিটারীরা যে অত্যাচার করছে, সে তো আর সহ্য করা যায় না।

তুমি মিলিটারীতে কেন গেলে মেজদা! তোমার জন্যে লজ্জায় বাবা কারও কাছে মুখ দেখাতে পারছেন না। ছোড়দার বন্ধুরা বাড়ী ব'য়ে এসে ছোড়দাকে যা তা বলে গেল—সেই-না শুনে রিণিটা কেঁদে-

কেটে অস্থির হচ্ছে। ওরা তো জানে না, তুমি কেন মিলিটারীতে গিয়েছ।

এখানে রোজ মারামারি হাঙ্গামা লেগে আছে। কত ছেলে যে মিলিটারীর গুলিতে প্রাণ দিচ্ছে, তার যেন আর ইয়ত্তা নেই। দেশসুদ্ধ লোক তোমাদের বিশ্বাসঘাতক বলছে। মিলিটারী দেখলেই তাদের ওপর ইট পাটকেল মারছে। এরকম হলে তুমি কি ক'রে বাঁচবে মেজদা ?

তুমি মিলিটারী থেকে চলে এস মেজদা। লোকে তোমাকে শুধু শুধু গালাগালি দেবে, এ আর আমরা সইতে পারছি না। রিণিটা পাশে বসে কাঁদছে আর বলছে, মেজদাকে পালিয়ে আসতে লিখে দে দিদি। আবার বলছি, মেজদা তুমি চলে এস—এমন মিলিটারীতে তুমি থেক না। তোমার জন্যে আমরা পথ চেয়ে রইলুম—

ইতি

তোমার আদরের বোন

মিনি আর রিণি

অমলের চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছে। চিঠিটার আখরগুলো মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে—তার মধ্যে মিনি আর রিণির মুখ দুটি যেন ভাসছে! অমলের মনে হয়, হ্যাঁ, হ্যাঁ আদরের বোন—সত্যিই বড় আদরের···

হঠাৎ ফোঁপানির একটা শব্দে অমল চমকে ওঠে। দেখে, শিবেন উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে মাথা গুঁজে কান্না চাপবার চেষ্টা করছে। খগেন উঠে গিয়ে শিবেনের পিঠের ওপর একটা হাত রেখে বললে, "কি হয়েছে শিবেন ?"

শিবেন তার চিঠিটা খগেনের হাতে দিয়ে বালিশের ওপর মুখ চেপে ধরল। খগেন চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে চলল। ধীরে ধীরে তার মুখটাও ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। বাকী সকলে খগেনের মুখের ভাব লক্ষ্য করছে।

অমল জিজ্ঞেস করলে, "ব্যাপারটা কি খগেন ?"

"শিবেনের বন্ধুর চিঠি—তবে শোন," খগেন পড়তে শুরু করে, "১২ই আগস্ট বিকেলবেলা তোর মা সুখেনকে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে পাঠান, কোথায় যেন সেদিন তোদের নেমন্তন্ন ছিল। বাড়ীর লোকের কাপড়-চোপড় পরা হয়ে গেছে, সুখেনেরও সাজগোজ হয়ে গেছে। সে হেদুয়ার মোড়ে যায় ট্যাক্সি ডাকতে। ঠিক সেই সময় একটা ট্রামে একদল লোক আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ আর মিলিটারীতে লোকগুলোকে তাড়া করে। বাচ্চা ছেলে সুখেন ধুতি পরে তেমন দৌড়তে পারে না। নয়ান চাঁদ দত্ত স্ট্রীটের মোড়ে লোকের

ঠেলা-ঠেলিতে কাপড়ে পা আটকে পড়ে যায়। একটা সার্জেণ্ট সেই অবস্থায় তার পিঠের ওপর পর পর চারটে গুলি করে। তারপর পাড়াসুদ্ধ লোক সুখেনকে কোলে ক'রে নিয়ে যায় তোদের বাড়ীতে। জানিস শিবু, তোর মা কিন্তু এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলেন নি—"

খগেন চুপ করল। আর সকলে স্তব্ধ হয়ে গেছে। শিবেনকে সান্ত্বনা দেবে? কিন্তু কি বলবে শিবেনকে!

পাঁচকড়ি ছিল চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে। হঠাৎ সে আপন মনে বিড়বিড় ক'রে উঠল। অমল তার পাশে গিয়ে বললে, "তুমি চুপ কর পাঁচকড়ি—একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।"

পাঁচকড়ি তেড়ে উঠল, "কেন আমি চুপ করব? আমরা বুঝি দেশের লোক নই! মিলিটারীতে ঢুকেছি বলে দেশের শত্তুর হয়ে গেলাম?"

অমল পাঁচকড়ির কপালে হাত রেখে বললে, "আর কথা বলো না।"

পাঁচকড়ি চেঁচিয়ে উঠল, "কথা বলব না মানে! চোখ বুজলেই যে জলন্ত মশালের সেই আলোগুলো তাড়া ক'রে আসে—আর সেই ছেলেটির চিৎকারে কানে যেন তালা ধরিয়ে দেয়! আর ঐ শালা লেফটেন্যাণ্টগুলো কিনা আমার পিঠ চাপড়ে বললে, 'সাবাস, দিস ইজ এ গ্যালাণ্ট সোলজার!' আমার কি ইচ্ছে হয়েছিল জানো, ম্যাগাজিনের বাকী গুলিগুলো দিই চালিয়ে ওই শালা কুকুরগুলোর ওপর। কিন্তু আমি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, না?" কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে থেকে কি যেন সে মনে করবার চেষ্টা করে, তারপর হঠাৎ অমলের একটা হাত চেপে ধরে বলে, "আচ্ছা অমল, আর ছ'মাস আগে আমিও তো ওদেরই একজন ছিলাম, আর আজ কিনা ওরা আমাকে শত্রু মনে করে! কিন্তু আমরা কি শিবেনের ভাইকে গুলি ক'রে মারার জন্যে মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছি? বলো? তুমিই বলো—"

বিছানা থেকে পাঁচকড়ি উঠে পড়তে চায়। অন্য ছেলেরা বিমর্ষ মুখে তার দিকে চেয়ে থাকে। অমল জোর ক'রে তাকে শুইয়ে রাখে—খগেন ওয়াটার বটল থেকে জল নিয়ে তার চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দেয়—অনন্ত হ্যাট দিয়ে তার মাথায় হাওয়া করতে থাকে।

এরই ফাঁকে সবার অলক্ষ্যে সুবেদার সাহেব এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর ওপর প্রথম চোখ পড়ে খগেনের। খগেন বললে, "পাঁচকড়ি আবার সেই রকম ক্ষেপে উঠেছে স্যার—আর শিবেনের বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, ওর ছোট ভাই পুলিশের গুলিতে মারা গেছে।"

সুবেদার সাহেব শিবেনের পাশে বসে পড়েন। শিবেন উঠে বসে মুখে হাত চাপা দেয়। সুবেদার সাহেব ক্ষণেকের জন্যে অস্বস্তি বোধ করেন। তারপর শিবেনের পিঠে একটা হাত রেখে বলেন, "এই হলো পরাধীনতার প্রায়শ্চিত্ত শিবেন—তুমি আমি এর কি বিহিত করতে পারি!"

বিস্মিত দৃষ্টিতে সকলে সুবেদার সাহেবের মুখের দিকে তাকায়। সুবেদার সাহেব চট ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "কই, শিবেনের চিঠিটা দেখি—"

খগেন চিঠিখানা সুবেদার সাহেবের হাতে দিলে। চিঠিটা নিয়ে ভাঁজ করতে করতে সুবেদার সাহেব বললেন, "চিঠিটা পড়ে আমি ব্যাটম্যানের হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" শিবেনের কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, "শিবেন, তোমার আজ ছুটি—বিকেলের প্যারেড মাফ—"

সে দিন রাতে রোলকলে নতুন কোম্পানি-অর্ডার জারি হলো, "এখন থেকে কোম্পানির ছেলেদের সমস্ত চিঠি, যা তারা বাড়ী থেকে পাবে, সেগুলোও সেন্সর করা হবে।"

দশ

ইতিমধ্যে কেটে গেছে দেড়টি মাস। আগস্ট আন্দোলনের শেষ রেশটুকুও থেমে গেছে। পাঁচকড়ি আবার সুস্থ হয়ে উঠেছে, শিবেন আবার সহজ জীবনে ফিরে এসেছে, অমল তার মনের অসীম হতাশাকে কাটিয়ে উঠেছে।

জার্মানরা মস্কো দখল করতে পারে নি, লেলিনগ্রাদের দিকে আর এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতে পারে নি। এবার তারা ঢুঁ মারছে ককেশাসের দিকে। ইম্ফল অবরোধ ক'রে জাপান সেই একই ভাবে বসে রয়েছে। যুদ্ধের পরিস্থিতে এই মন্দাভাব কোম্পানিতে এনেছে অলস, মন্থর একটা আমেজ!

মেজর ব্রাউনের দৌলতে তাঁবুতে তাঁবুতে বাঁশের মাচা হয়েছে—খেলা-ধুলার হরেক রকম ব্যবস্থা হয়েছে—ছেলেদের জন্যে 'স্টেটসম্যান' আর 'ফৌজি আকবর' নেওয়া হচ্ছে—গান-বাজনার জলসা সপ্তাহে অন্তত একবারও হচ্ছে। চার্জ-শীটের সংখ্যা কমে নি, কিন্তু কয়েদীর সংখ্যা কমেছে। আর. আই. না দিয়ে তিনি সাধারণ ভাবে মাইনে কেটে নেন। ছেলেরা মনে করে আর. আই.-এর বদলে মাইনে কাটা নতুন মেজর সাহেবের অসীম করুণা।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কোম্পানিতে দু'দিন ছুটি, অষ্টমী আর বিজয়ার দিন। অমল তাঁবুর মধ্যে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। মেজর ব্রাউন ছুটির দিন সিভিলিয়ান পোশাক পরার অনুমতি দিয়েছেন। জনকয়েক ছেলে অল্প কিছুক্ষণ আগে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে রেলওয়ে কলোনির পূজামণ্ডপে গেছে। তাদের পোশাক-আসাক দেখে অমলের মনটা কেমন যেন আনচান ক'রে ওঠে। বারবার তার মনে হয়, মিনি আর রিনির জন্যে পূজোর জামা-কাপড় কেনা হয়েছে কি ?

পাঁচকড়ি আর অনন্ত তাঁবুর মধ্যে ঢুকল। পাঁচকড়ির আছে একটা সিভিলিয়ান শার্ট—সেইটাই সে খাকি ফুল-প্যান্টের ওপর চড়িয়ে নিয়েছে। অমলকে শুয়ে থাকতে দেখে অনন্ত বললে, "তোমার কি হলো অমল ?"

পাঁচকড়ি বললে, "আর কি, বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে—"

অমল উঠে বসে বললে, "সত্যিই একটু মন কেমন করছে। বাবা কিছুতেই পূজোর সময় কাউকেও বাইরে যেতে দিতেন না। এই বোধহয় প্রথমবার, পূজোর সময়ে বাড়ীর বাইরে রইলুম।"

অনন্ত আর পাঁচকড়ির মুখটাও ক্ষণেকের জন্যে করুণ হয়ে ওঠে। পাঁচকড়ি সামলে নিয়ে বললে, "গুলি মারো ওসব সেন্টিমেণ্টাল ব্যাপারে, তার চেয়ে জমাট একটা আড্ডা জমিয়ে নরক-গুলজার করা যাক—"

অনন্ত বললে, "সুনীল তো সেই সকালে বিল্বমঙ্গল-এর মতো নদী পার হয়ে তার চিন্তামণির সন্ধানে গেছে।"

অমল বললে, "তবুও তো সে একটা কিছু করছে। কিন্তু আমাদের কি—"

"তাহলে কি আমরা তিন নম্বর গেটের পথ ধরব নাকি ?"

"তা আমি বলছি না ; কিন্তু আমাদেরও কিছু একটা করা উচিত—বড় নির্জীব হয়ে পড়েছি।"

"কিন্তু কি করতে চাও তুমি ?"

পাঁচকড়ি বললে, "দাঁড়াও, ওদের সকলকে ডাকি—মতলব একটা চট ক'রে ফেঁদে ফেলা যাবে"—তাঁবুর বাইরে গিয়ে সে নাম ধরে হাঁকডাক শুরু ক'রে দিলে। একে একে এলো খগেন, জয়ন্ত আর শিবেন। তাঁবুর মধ্যে ওরা ঢুকতেই অনন্ত বলে উঠল, "এই পূজোতে একটা কিছু উৎসব আমাদের করতেই হবে।"

শিবেন বললে, "এটা কি আর উৎসব করার জায়গা—এখানে বসে শুধু মরণের দিন গোনা চলে।"

জয়ন্ত ধমক দিয়ে ওঠে, "আঃ শিবেন, এমন করলে আর বাঁচবে ক'দিন ! দেখ, বাঁচার দায়িত্বটা আমাদেরই, কাজেই তার রসদ আমাদেরই জোগাড় ক'রে

নিতে হবে।”

শিবেন বললে, “করো তাহলে, আমি কিন্তু তেমন জোস পাচ্ছি না।”

পাঁচকড়ি বললে, “তাহলে একটা থিয়েটার কর।”

জয়ন্ত বললে, “অত সময় কই! তার চেয়ে একটা বিজয়া সম্মিলনী করা যাক। বিজয়ার দিন একটা ভোজ, আর ছোট্ট একটা স্টেজ বেঁধে ভ্যারাইটি শো। কোম্পানির ছেলেরা যে যা জানে—নাচ, গান, আবৃত্তি, কমিক, ম্যাজিক, সবই সেই দিন দেখাবে।”

পাচকড়ি বললে, “কিন্তু চাঁদা আর কত উঠবে! দেবে তো শুধু হিন্দুরা।”

জয়ন্ত বললে, “কেন ? মুসলমানরাও দেবে। আমরা তো আর ফুল-বিল্বিপত্তর নিয়ে পূজো করতে যাচ্ছি না। আমরা করতে চলেছি সমস্ত কোম্পানিকে নিয়ে একটা উৎসব—বিজয়াটা তার উপলক্ষ্য মাত্র।”

অনন্ত বললে, “কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটি বাঁধবে কে ?”

জয়ন্ত বললে, “কেন, আমরা। এখনই তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে আমাদের মতলবটা জানাব। তাঁবুর লোকেরা তাদের একজন করে প্রতিনিধি ঠিক করবে। সেই প্রতিনিধিরাই সমস্ত ব্যবস্থা করবে।”

পাঁচকড়ি বললে, “কিন্তু এর মধ্যে কোন এন. সি. ও. নেওয়া হবে না।”

খগেন সমর্থন করে, “কোন মতেই না। ওরা তো কাজের চেয়ে মাতব্বরীই করবে বেশী, আর শেষ পর্যন্ত দেবে ভণ্ডুল ক'রে।”

অমল বললে, “আমরা ক'জনে এখানে বসে এই রকম একটা নিয়ম খাড়া করেত পারি না। যদি কোন এন. সি. ও-কে কোন তাঁবু তাদের প্রতিনিধি ক'রে পাঠায়, তাহলে আমরা তাকে মেনে নিতে বাধ্য।”

জয়ন্ত বললে, “তার চেয়েও একটা বড় কথা আছে অমলবাবু। এন. সি. ও. মাত্রেই তো আর আমাদের শত্রু নয়। ল্যান্স-নায়েক দত্ত বা মেডিক্যাল এন. সি. ও. হাবিলদার ব্যানার্জি কিন্তু হাবিলদার মুখার্জির জাতের মানুষ নয়। কাজেই, মাতব্বরী বা ভণ্ডুল করার মতলব না নিয়ে যারাই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে, আমরা নিশ্চয়ই তাদের নেব।”

সমস্ত ক্যাম্পে একটা সাড়া পড়ে গেছে। সকলেই এই উৎসবে রাজি, তাদের মহা উল্লাস, মরা গাঙে আবার যেন জোয়ার এসেছে। চাঁদা উঠতে থাকে, প্রতি মুহূর্তে চাঁদার অঙ্ক বাড়তে থাকে। তাঁবুতে তাঁবুতে কবিতা মুখস্থ চলেছে, সিলেক্টেড সীন, আর কমিকের রিহার্শাল চলেছে। ম্যাজিশিয়ান বৃদ্ধ গোপ মশাই তাঁর আনুষঙ্গিক জোগাড়ের চেষ্টায় আদাড়ে-আঁস্তাকুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

গানের রিহার্শাল হচ্ছে একটা তাঁবুর মধ্যে—'জনগণমন' কোরাস গানে ক্যাম্পটা মুখর হয়ে উঠেছে।

জয়ন্ত অমলকে বললে, "এই হচ্ছে সুযোগ অমলবাবু, এদের ধরে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার ক'রে দি'ন। যত রকমের বেড়া এখানে আছে—লোকো ট্রাফিকের বেড়া, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের বেড়া, মাইনের তারতম্যের বেড়া, ধর্ম-ভেদের বেড়া, এমন কি র্যাঙ্কের বেড়া—সব ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে দি'ন।"

লাঙ্গরীদের ছুটি দিয়ে 'বড় খানা'র জন্যে রান্নাজানা ছেলেদের নিয়ে একটা দল হলো। ভ্যারাইটি শো-এর স্টেজ বাঁধা আর তার সংশ্লিষ্ট কাজের জন্যে একটি দল হলো। বাজার থেকে খাবার ও অন্যান্য জিনিসপত্তর কিনে আনার জন্যে একটা দল, চাঁদা তোলার একটা দল, খাওয়ার সময়ে পরিবেশন করার জন্যে একটা দল। ভ্যারাইটি শো-এর অভিনেতাদের অন্য সমস্ত কাজ থেকে রেহাই দেওয়া হলো। সমস্ত ব্যাপারটা তদারক করার জন্যে ভার পড়ল অমল, জয়ন্ত আর অনন্তর ওপর। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, জনকয়েক এন. সি. ও. ছাড়া ক্যাম্পের প্রায় সব ছেলেই একটা না একটা কাজে লেগে গেছে। ছেলেরা নিজেরাই দলে দলে গিয়ে মোটা মোটা স্লিপার কাঁধে ক'রে আনছে, সমস্ত ক্যাম্পটাকে ঝকঝকে তকতকে ক'রে ফেলেছে। কোথায় কি করতে হবে না হবে, তারা নিজেরাই আলোচনা ক'রে স্থির করছে, আর সেই অনুযায়ী কাজ ক'রে চলেছে।

অমল দেখে আর ভাবে, কোম্পানির নিত্যনিয়মিত ফেটিগও তো এই একই পর্যায়ের কাজ—অথচ কোম্পানি-ফেটিগের সময়ে ছেলেরা তার সবটাই ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। আর আজ! তারা সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়ে দৈত্যের মতো কাজ ক'রে চলেছে।

অনন্ত এসে খবর দেয়, জনকয়েক হাবিলদার আর নায়েক চাঁদা তো দিচ্ছেই না, উপরন্তু অন্য এন. সি. ও-দের ভাঙানোর চেষ্টা করছে। অমল মুষড়ে পড়ে—শেষ পর্যন্ত একটা গণ্ডগোল কি তাহলে হবেই!

জয়ন্ত বললে, এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই অমলবাবু। কোম্পানির সাধারণ ছেলেদের ওপর বিশ্বাস রাখুন—আমাদের উৎসব সফল হবেই, আর ওদের এই বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে ওদের মুখোশ পড়বে খসে—আর আমাদেরও মোহমুক্তি ঘটবে।"

সন্ধ্যের কিছু পরে একটি ছেলে এসে খবর দেয়, "সুবেদার সাহেবের ঘরে দেখলাম মিটিং বসেছে। জমাদার সাহেব, হাবিলদার মুখার্জি, নায়েক চ্যাটার্জি,

আরও যেন কে কে রয়েছে। লুকিয়ে আমি শুনলুম, আমাদের বিজয়া-সম্মিলনী সম্বন্ধে কি যেন বলাবলি করছে।"

ছেলেটিকে অমল চিনতে পারল না। জয়ন্ত বললে, "এখন থেকে দেখবেন, এমন অনেক অচেনা ছেলে এমনি ভাবে নানান খবর নিয়ে ছুটে আসবে। তারাও সজাগ আছে—এ উৎসব যে তাদেরই।"

রোলকলে জমাদার আর স্থবেদার সাহেব তুজনেই এসেছেন। স্থবেদার সাহেব বিজয়া-সম্মিলনী সম্বন্ধে প্রচুর উৎসাহ দিয়ে, মেজর সাহেবের মহানুভবতার লম্বাচওড়া প্রশস্তি গেয়ে চুপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে জমাদার সাহেব বলে উঠলেন, "কারও যদি কিছু বলবার থাকে তো বলতে পার।"

নায়েক চাটুজ্যে বললে, "আমার স্যার একটা কথা বলবার আছে—"

স্থবেদার সাহেব অনুমতি দিলেন, "ঠিক হ্যায়—বলো।"

অমলের মনে পড়ে সেই ছেলেটির রিপোর্ট। তাহলে এরা ষড়যন্ত্র ক'রে এসেছে বিজয়া-সম্মিলনীর ওপর আঘাত হানতে!

নায়েক চাটুজ্যে বললে, "কোম্পানিতে যে বিজয়া সম্মিলনী হচ্ছে, তার কে যে কি করছে, তা আমরা কেউই জানি না। অথচ দেখছি, সকলের কাছ থেকেই চাঁদা নেওয়া হচ্ছে। এটা তো আর কারও ঘরোয়া ব্যাপার নয়! এর জন্যে কোন কমিটি হয়েছে কিনা, তাও আমরা জানি না। মিলিটারীতে থেকে একটা কাজ যদি ডিসিপ্লিনের সঙ্গে না করতে পারি, তার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি থাকতে পারে!"

রোলকলের মধ্যে থেকে একটা স্বর বলে ওঠে, "আপনি কত চাঁদা দিয়েছেন মশাই!"

নায়েক চাটুজ্যে বললে, "চাঁদা দেওয়ার জন্যে আমি এখনও তৈরি। কিন্তু যার তার হাতে আমি চাঁদা দেব না।"

স্থবেদার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের চাঁদার টাকা কার কাছে জমা হচ্ছে?"

কয়েকজন এক সঙ্গে বলে উঠল, "অমলবাবুর কাছে।"

জমাদার সাহেব খেঁকিয়ে ওঠেন, "বাবু-টাবু এখানে চলবে না। কেন, স্যাপার বলতে কি লজ্জা করে নাকি?"

স্থবেদার সাহেব অমলকে সামনে ডাকলেন। অমলের কানে কানে জয়ন্ত ফিসফিস ক'রে বলে দেয়, "সাবধান অমলবাবু, ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছে—মনে রাখবেন, আপনি হচ্ছেন কোম্পানির সবকয়টি স্যাপারের প্রতিনিধি।"

অমলকে স্থবেদার সাহেব বলছেন, "আমি কোন কৈফিয়ৎ তলব করছি না। কোম্পানির ছেলেরা জানতে চায়, বিজয়া-সম্মিলনী সম্বন্ধে কি কি বন্দোবস্ত তুমি করেছ।"

অমলের বুকটা কেঁপে ওঠে, তার গলার স্বর কেমন যেন বুজে আসে। রোলকলের মধ্যে থেকে কে একজন বলে ওঠে, "বলুন অমলবাবু, আমরা আছি আপনার পেছনে—"

ছেলেটির কথাগুলো অমলের কাছে বড় আপনার বলে মনে হয়, যেন তারা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চাঙ্গা হয়ে উঠে অমল বলতে শুরু করে, "বন্দোবস্ত আমি কিছুই করি নি, করেছে কোম্পানির ছেলেরা। প্রত্যেক তাঁবু থেকে একজন প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি হয়েছে—সেই কমিটি আমার ওপর ভার দিয়েছে চাঁদার টাকা রাখার, ভ্যারাইটি শো-এর ভার দিয়েছে অনন্তর ওপর, আর খাওয়াদাওয়া ও অন্য সমস্ত কাজের ভার দিয়েছে জয়ন্তর ওপর।

জমাদার সাহেব খিল খিল ক'রে হেসে উঠলেন, "বাঃ, বেশ পাকাপোক্ত ব্যবস্থাটি হয়েছে তো—তিনটিই দেখছি একেবারে বাছাই করা চীজ—"

রুদ্ধ আক্রোশে সমস্ত রোলকল একবার যেন ফুঁসে উঠল।

নায়েক চাটুজ্যে বললে, "আসলে ওই তিনজন যা খুশি তাই করছে, আর ওই কমিটি হচ্ছে ওঁদের লেজুড়ের দল। আমি প্রস্তাব করছি, স্থবেদার সাহেবকে প্রেসিডেণ্ট করে আর তিনজন হাবিলদার, দুজন নায়েক, একজন ল্যান্স-নায়েক আর পাঁচজন স্যাপার নিয়ে এই রোলকলেই একটা কমিটি গঠন করা হোক—"

জমাদার সাহেব বললেন, "স্থবেদার সাহেবকে প্রেসিডেণ্ট করতে কারও আপত্তি আছে নাকি?"

রোলকল সমস্বরে ফেটে পড়ল, "আমরা যা করেছি, তার ওপর আর কোন রদবদল চলবে না—"

সঙ্গে সঙ্গে স্থবেদার সাহব হাঁকলেন, "রোলকল—ডিসমিস—"

বিজয়া-সম্মিলনীর পরদিনই অমলকে লাইনে বুক করা হলো। স্থবেদার সাহেব হঠাৎ বুঝতে পেরেছেন, অমলের ক্যাটেগরি যথন গার্ড, তখন সেকাজ তার শেখা উচিত। অনন্ত অমলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলে, "এইবার তাহলে স্থবেদার সাহেব আমাদের ভয় করতে শুরু করেছেন!"

স্টেশনে পৌঁছে অমল দেখে, তাদেরই কোম্পানির মন্থু সেই ট্রেনের ওয়ার্কিং

গার্ড। মন্থ বললে, "তাহলে আপনাকেও লাইনে পাঠালে!"

অমল বললে, তাই তো দেখছি। বোধহয় আমি একটু বেশী মাত্রায় ভয়াবহ হয়ে উঠেছি!"

"সে তো হয়েছেনই। ওরা এ'ত সেজেগুজে এলো প্রেসিডেণ্ট হবে বলে, আর কোম্পানিসুদ্ধ ছেলে কিনা ওদের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলে—" ব্রেকভ্যানের এক কোণে মালপত্তর নামিয়ে রেখে মন্থ আবার বললে, "কিন্তু যাই বলুন, ওদের মুখে বেশ ক'রে চুনকালি লেপে দিয়েছেন। বিজয়া-সম্মিলনী যা করেছেন, তাতে আপনারই সুবেদার হওয়া উচিত, আর ও শালাদের ধরে ধরে ঝাড়ুদার বানিয়ে দেওয়া উচিত।"

অমল বললে, "যাক ওসব কথা। এখন আমাকে কাজকর্ম শিখিয়ে দিন। শুধু ওই সুবেদার আর জমাদার সাহেবের আক্রোশে আজ পর্যন্ত ব্রেকভ্যানই চোখে দেখি নি—আর আপনারা সেই ইভ্যাকুয়েশনের সময় থেকে রীতিমত গার্ডগিরি করছেন! আমার কি কম আপশোস—"

মন্থ বললে, "সেদিন গার্ডগিরি না করায় বেঁচে গেছেন! ওঃ, সে কি অমানুষিক কষ্ট! এক একটা স্টেশনে দিনের পর দিন পড়ে থাকা, না খাওয়া-দাওয়া, না স্নান, না ঘুম, কেবল শুনুন গোঙানি আর কাতরানি—আর সে কি মড়া-পচার দুর্গন্ধ! সেদিন কি আর গার্ডগিরি করেছি! গার্ডগিরি করছি আজকাল—অনেক মজা আছে লাইনে—"

অমল জিজ্ঞেস করে, "কি রকম!"

"চলুন, সবই হাতেনাতে দেখতে পাবেন—" ব্রেকভ্যান থেকে নেমে কাপলিং পরখ করতে করতে ওরা এগিয়ে চলল ইঞ্জিনের দিকে—মন্থ বোঝাতে লাগল, "গার্ডের কাজের মধ্যে বরাৎটাই হলো সব। যতক্ষণ এ্যাকসিডেণ্ট না হয় ততক্ষণ সকলেই পাকা গার্ড। কিন্তু একটি এ্যাকসিডেণ্ট হলেই বোঝা যায় গার্ড সাহেবের দৌড়—"

ভ্যাকুয়াম ওয়াগন ক'খানা গুনে নিয়ে মন্থ বললে, "দেখুন না, সারা ভারতবর্ষের যত মিটার গেজের ওয়াগন এনে জড় করেছে এই আসামে। ভ্যাকুয়াম দিয়েছে মাত্র আটখানা! এই রকম পাহাড়ী দেশে ওই আটখানা ভ্যাকুয়াম দেওয়া আর না দেওয়া একই কথা। তা ব'লে ট্রেন নিতে আপত্তি করার উপায় নেই। যদি আপনি আইন দেখিয়ে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন, অমনি এদিক থেকে আসবে সিভিলিয়ান স্টেশন মাস্টার হাঁপাতে হাঁপাতে, আর ওদিক থেকে আসবে আর. টি. ও. চোখ রাঙাতে রাঙাতে। বুঝলেন না ব্যাপারটা, কোন দুঃখ-দরদ

নেই—যেখানে মানুষই মরছে হাজারে হাজারে, সেখানে খানকয়েক ওয়াগন নষ্ট হলে এদের ভারী বয়ে গেল !"

ইঞ্জিনের পাশে ওরা এসে পড়েছে। মনু হেঁকে ওঠে, "ওহে দাউদ, আমাদের অমলবাবুও আজ থেকে লাইনে বেরিয়েছেন—"

দাউদ খাঁ ইঞ্জিন থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে, "তাই নাকি !" অমলকে দেখতে পেয়ে বললে. "সে ভালোই করেছেন—একটু চা খাবেন নাকি অমলবাবু ?" উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললে, "ওরে চাঁদ মিয়া, অমলবাবুকে চা দে রে—মগটা গরম জলে ভালো ক'রে ধুয়ে নিস, বুঝলি।"

অমল বললে "আমার বরাৎ দেখছি ভালোই ! সবই তো কোম্পানির লোক—তা তুমি আমাকে কাজ-কমমো শিখিয়ে দিও দাউদ।"

দাউদ ইঞ্জিন থেকে নেমে এসে বললে, "সে আর আমাকে বলতে হবে না—এই জিজ্ঞেস করুন না মনুবাবুকে। আমি তো আর ওপেন মার্কেটের লোক নই—আমি হচ্ছি খাস রেলের লোক। শালা লোকো-ফোরম্যান লোভ দেখিয়ে, ফুসলে-ফাসলে মিলিটারীতে দিলে ঢুকিয়ে। এখানকার কারবার-সারবার যে এ রকম, এ যদি ঘুণাক্ষরেও জানতুম, তাহলে কোন শালা বৌ-ছেলেমেয়ে ছেড়ে এই শালাদের খপ্পরে এসে পড়ত !"

ক্ষণেকের জন্যে দাউদ চুপ ক'রে থাকে। বোধহয় তার অসামরিক জীবনের দৃশ্য, তার ছেলেমেয়ের মুখগুলো তার চোখের উপর ভেসে ওঠে। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে. আবিষ্টভাব থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে আবার বলতে থাকে, "ভালোই করেছেন অমলবাবু—শুনেছি, ক্যাম্পে আপনার ওপর খুব জুলুম করে। ভালো মানুষকে তো ও শালারা বরদাস্ত করবে না ! যত শালা চুকলিখোর দেখুন, ওদের খুব পেয়ারের লোক ! ভালোই করেছেন লাইনে বেরিয়ে, এখানে অনেক মজা পাবেন।"

চাঁদ মিয়া অমলকে চা দিলে। চায়ে চুমুক দিয়ে অমল বললে, "কতদিন লাগবে দাউদ, কাজ শিখতে ?"

দাউদ বলে উঠল, "কতদিন ! আপনার মতো লিখাপড়া জানা লোকের আবার দিন লাগে নাকি ! বলেন, কত মিনিট ? আর আমার সঙ্গে যদি যান তাহলে তো এখুনি চার্জ নিতে পারেন। এ কাজের আর শিখবেন কি ? ব্রেক-ভ্যানে বিস্তারা লাগিয়ে শুয়ে পড়বেন—লামডিঙে পৌঁছে আমি আপনাকে টাইমগুলো বাতলে দেব—জার্নালে সেইগুলো বসিয়ে দিয়ে মাস্টারের ঘরে ফেলে দিয়ে আসবেন। ব্যস, আপনার কাম খতম।"

অমল আশ্বস্ত হলো। ডিউটিতে আসার আগে তার কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। দাউদ মনুকে বললে, "তালিম-টালিম কিছু দিয়েছ নাকি?"

মনু বললে, "তুমি ওস্তাদ লোক থাকতে আমি আর কি তালিম দেব! আমার তো হাতেখড়ি তোমারই কাছে। তুমি না হয় ততক্ষণ তালিম দাও—আমি এর মধ্যে খবরাখবর করে আসি।"

দাউদ ফুটপ্লেটের ওপর একটা পা তুলে দিয়ে অমলকে বললে, "বুঝলেন না, দু'চার পয়সা রোজগার তো চাই—এই মাইনেতে কি আর পোষায়! সবই যদি আমি খেয়ে ফেলব, তাহলে আর ঘরে আমার ছেলে-বৌ খাবে কি! তার ওপর এমনি হয়েছে এ শালার দেশ, একবার লাইনে বেরোলে অন্তত দশটি টাকা খরচা—"

অমল বললে, "এত খরচা কিসের! র‍্যাশন তো দিয়েই দিয়েছে।"

"ও র‍্যাশন সোলজার হয়ে খাওয়া চলে, কিন্তু লাইনে বেরিয়ে ড্রাইভার বা গার্ড সাহেবের খাওয়া চলে না—লাইনে আমাদের একটা ইজ্জৎ আছে! ও র‍্যাশন তো আমরা ভিখারীকে দিয়ে দিই। তার ওপর এটা-সেটা খরচ তো আছেই।"

"এটা-সেটা আবার কি!"

"এই ধরুন না, আগুনতাপে ষোল ঘণ্টা আঠারো ঘণ্টা থাকতে হবে, এক-আধ পাঁট না টানলে কাজই করা যায় না। তা শালার জংলী দেশে বিলেতী তো পাওয়াই যায় না, আর দেশী যা বানায় তা আমাদের কলকাতার ধেনোর কাছে একেবারে ঘোড়ার মুত।"

"কিন্তু এত টাকা পাও কোথায়?"

"সব এই গাড়ীতেই আছে অমলবাবু। কষ্ট করে কেবল নোটগুলো গুনে নিতে হয়, তা না হলেই ওই সিভিলিয়ান মাস্টারগুলো ঠিক দু-একখানা কম দিয়ে দেবে।"

মনু ফিরে এলো। দাউদ জিজ্ঞেস করলে, "হলো নাকি কিছু?"

মনু বললে, "তেমন সুবিধে নয়। সবই খুচরোর খদ্দের। পানিখাটিতে দু'বস্তা চিনি, ভিগারুতে চারবস্তা চাল, আর জাগীরোডে আটবস্তা আটা," একটু থেমে অমলকে বললে, "রেট জানেন তো?"

দাউদ বললে, "রেট আর কি, যেদিন যেমন দাঁও জোটে। তবে চিনি এখন পঁচিশ, আটা—বারো, আর চাল—আট। ড্রাইভার আর গার্ডে আধাআধি বখরা। তবে আজ হবে তিনভাগ।

অমলের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়, আঁতকে উঠে বলে, "না না, দাউদ—আমার ভাগ চাই না।"

দাউদ আর মন্নু মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে মুচকে হাসে। মন্নু অমলের পিঠে একটা চাপড় মেরে বললে, "সে পরে যা হয় করা যাবে—এখন চলুন তো ব্রেকে, টাইম তো প্রায় হয়ে এলো।"

ব্রেকভ্যানের মধ্যে ঢুকে অমল অবশের মতো বসে পড়ে, তার হাত-পা থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে। ওয়াগন ভেঙে মাল বিক্রি করা—এরই নাম উপরি রোজগার! মন্নুর হিসেব মতো মোট যা মাল বিক্রি হবে, তা থেকে আসবে একশো আশি টাকা! তার মানে, তার ভাগে ষাট টাকা। ষাট টাকা! মিলিটারীতে ঢুকেছিল সে ছাপ্পান্ন টাকায়, জুন মাস থেকে বেড়েছে পাঁচ টাকা ফিল্ড সার্ভিস ভাতা, আর সেপ্টেম্বর থেকে দুটাকা বেসিক পে—মাসে মোট তেষট্টি টাকা। আর এই এক ট্রিপে ষাট টাকা!

মন্নু বললে, "আরে মশাই, আপনি যে দেখছি রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন!"

অমলের চোখের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে বিমলের একটার পর একটা চিঠি, 'মাত্র পঞ্চাশ টাকায় কোন থৈ পাওয়া যাচ্ছে না অমি। জিনিস-পত্তরের দাম যে ভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে কোন মতেই খরচে কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না—প্রতি মাসেই মোটা টাকা দেনা পড়ে যাচ্ছে। আর তো সংসার চলে না ভাই, যে কোন উপায়েই হোক আর কিছু বেশী পাঠাবার চেষ্টা ক'র।' অমল ভাবছে, এই ষাট টাকা যদি সে বাড়ীতে পাঠায় তাহলেই কি সংসার চলবে! মিলিটারীতে ভর্তি হওয়ার সময়েও সে ভেবেছিল, চাকরি পেলেই সংসারের অভাব মিটবে! কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছে তা সম্ভব হয় নি—তার মাইনের টাকায় সংসার চলছে না। আরও টাকা চাই। কিন্তু কোথায় পাবে সে টাকা? গাড়ী ভেঙে চাল, আটা, চিনির বস্তা বিক্রি ক'রে, অর্থাৎ চুরি ক'রে? চোখ ফেটে অমলের জল আসে। এই কি সে চেয়েছিল জীবনে—এই ভাবেই কি সে বাঁচতে চেয়েছিল—চুরির টাকা দিয়ে সে ভাই-বোনকে মানুষ করতে চেয়েছিল! বিয়ে-থা করে সুখে ঘরকন্না করার এই কি চেহারা! বিমর্ষ, ম্লান চোখ দুটো তুলে সে মন্নুর মুখের দিকে তাকায়।

মন্নু বললে, "উপায় কি বলুন, বাঁচতে তো হবেই। আর একাজ ক'রে চলেছে আর. টি. ও-র মেজর থেকে রেলের কুলি পর্যন্ত। আপনি একা দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হয়ে করবেন কি বলুন?"

তবু অমলের মনে হয়, এই টাকা নেওয়ার ব্যাপারেও তো আরও খানিকটা

সৎ হওয়া যায়। মনুকে বললে, "না, সে কথা আমি ভাবছি না। বলছিলাম কি, তিন ভাগ কেন? হওয়া তো উচিত পাঁচ ভাগ—ফায়ারম্যান দুজনেরও তো ভাগ থাকা উচিত—"

মনু হেসে উঠল, "আপনি যে মশাই দেখছি রীতিমত সাম্যবাদী হয়ে উঠলেন মশাই। টাকাগুলো যদি সব বিলিয়েই দেব, তাহলে আমিই-বা এত মাথা ঘামাতে যাব কেন? আর ঝুঁকিই-বা নেব কেন? আপনি কি ভাবছেন, দাউদকেও ঠিক হিসেব দিয়েছি? দাউদও তেমনি দুটো-একটা ক'রে টাকা দিয়ে ফায়ারম্যান-গুলোর মুখ বন্ধ ক'রে রাখবে। হ্যাঁ, তবে সমান সমান ভাগ হবে আপনাতে আমাতে। বুঝলেন না, কাকে কাকের মাংস খায় না—"

এগারো

উত্তর আফ্রিকায় আমেরিকান সৈন্য অবতরণের খবর ছেলেদের মনে আবার যেন নতুন ক'রে ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। জাপান সেই একইভাবে ইম্ফলের দরজায় বসে আছে। আর ব্রিটিশও যেন তার জন্যে কোন উদ্বেগই বোধ করে না! ছেলেদের বার বার মনে হয়েছে, জাপান যদি আসামে একটা ঠেলা দেয়, তাহলে আসামের অবস্থাও হবে বর্মার শামিল। কিন্তু প্রথম মহা-যুদ্ধের হীরো আমেরিকা যখন যুদ্ধে নেমেছে তখন হেস্তনেস্ত একটা হবেই।

অনন্ত বললে, "এইবার যেন মনে হচ্ছে, যুদ্ধটা তাহলে শেষ হবে!"

পাঁচকড়ি বললে, "আমেরিকা নর্থ আফ্রিকায় নেমে কচু করবে—ব্রিটিশ বাছাধনরা তো রোমেলের হাতে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে—"

"কিন্তু জার্মানিরও জারিজুরি ফুরিয়ে এসেছে—বাহাদুরী আছে বলতে হবে রাশিয়ার, ঘায়েল তো প্রায় ক'রে এনেছে! আর এই শালা ব্রিটিশ এমন হারামি, চুপ ক'রে বসে মজা দেখছে। কেন, ওরা কি একটা সেকেণ্ড ফ্রন্ট খুলতে পারে না? তা না, আসলে হচ্ছে শয়তানি। রাশিয়াও ঘায়েল হোক আর জার্মানিও ঘায়েল হোক, আর উনি মারবেন ওস্তাদের মার শেষ রাত্তিরে! কিন্তু এ সব ফন্দি-ফিকির আর ধোপে টেঁকবে না। সৈন্য, সে যে দেশেরই হোক না কেন, আমাদের মতোই তাদের অবস্থা। এই রকম একটা অমানুষিক অবস্থার মধ্যে মানুষ কতদিন জীবন কাটাতে পারে। এবার তারাই দেবে লড়াই বন্ধ করে।"

খগেন বললে, "তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক অনন্ত,এ শালার যুদ্ধ থামুক,

আর যেন পারছি না !"

পাঁচকড়ি বললে, "কিন্তু জার্মানি যদি রাশিয়ার হাতে ঘায়েল হয়, তাহলে এ শালা ব্রিটিশরা তো বহাল তবিয়তেই থেকে যাবে। তবে আর এত বড় যুদ্ধটা হয়ে লাভ কি হলো !"

অনন্ত বললে, "লাভটা হলো এই যে, ভারতবর্ষের কুড়ি লক্ষ লোক যুদ্ধের সমস্ত কায়দা শিখে নিলে। এই যুদ্ধ থামার সঙ্গে সঙ্গে তারাই পারবে এ শালাদের পিটিয়ে পগার পার করতে।"

সত্যিই যেন নতুন একটা কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। দিন দিন বদলে যাচ্ছে পাণ্ডুঘাটের চেহারা। দিকে দিকে এ্যান্টি-এয়ার-ক্র্যাফট পোস্ট তৈরী হচ্ছে, দুটো নতুন ফেরিঘাটের কাজ শুরু হয়েছে ; পাণ্ডু থেকে পলাশবাড়ীর রাস্তা অনেকখানি এগিয়ে গেছে ; পদ্মা-মেঘনা স্টিমার সার্ভিসের বড় বড় স্টিমারগুলো এসে জড় হচ্ছে পাণ্ডুঘাটে। রেল চলাচল বেড়েই চলেছে, ফেরিঘাটে পারাপার সারাদিনই লেগে আছে। রেলপথে আসছে সৈন্য—নতুন নতুন তাজা সৈনিকের দল ; আর আসছে ঘোড়া খচ্চর ওয়াগনে বোঝাই হয়ে। জলপথেও আসছে সৈন্য, দেশী, বিলেতী সব রকমই ; আর আসছে স্টিমার বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র, সে-যে কত রকমের আর কত ধরনের, তার যেন লেখাজোখা নেই। এই আসার যেন বিরাম-বিশ্রাম নেই—ঠিক যেন ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের মতো !

ছেলেরা সরলভাবেই বুঝে নিয়েছে, এইবার একটা কিছু ঘটবেই। লড়াই শুরু হবে নতুন করে। কিন্তু তারা করবে কি ! নতুন পরিস্থিতিতে তারাও নতুন ক'রে ভাবছে—এই দুনিয়াজোড়া অঘটনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা কি ? দিনে রাতে, কাজে অবসরে, চলতে থাকে এই একই চিন্তার রোমন্থন। তারই ফাঁকে ফাঁকে ঝলক দিয়ে ওঠে সৈনিক জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার ছোট্ট একটি আশা।

কোম্পানিতেও দেখা দিয়েছে কর্মচাঞ্চল্য। মেজর ব্রাউন কোম্পানি উজাড় ক'রে প্রতিটি ছেলেকে পাঠাচ্ছেন রেলের কাজে। পাণ্ডু থেকে চাপারমুখ, প্রতিটি স্টেশনে ট্রাফিক স্টাফ পোস্টেড হয়ে গেছে। লোকোর প্রতিটি লোক—ড্রাইভার থেকে টিনস্মিথ পর্যন্ত সবাই কাজে বহাল হয়ে গেছে। ক্যাম্প খাঁ খাঁ করছে; প্যারেড গ্রাউণ্ডে ঘাস বড় হয়ে উঠেছে ; তাঁবুর আশেপাশে আগাছা স্বাধীনভাবে বেড়ে চলেছে। নিরুৎসাহ সুবেদার সাহেব লঙ্গরখানা তদারক করেন আর জমাদার সাহেব সুইপারদের সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্প সাফাই করিয়ে বেড়ান।

সুনীল খবর আনে, "জাপান শীগগিরই ইম্ফল আক্রমণ করবে—"

পাঁচকড়ি ক্ষেপে ওঠে, "তা আমরা কি ঘণ্টাটা করব—গার্ড সাহেবের লাল

ঝাণ্ডা দেখিয়ে কি তাদের থামিয়ে দেব ?"

"আহা-হা, শোন না বলি, জাপান ইম্ফল আক্রমণ করলেই সিভিলিয়ান স্টাফরা কেটে পড়বে। তখন আমাদেরই সমস্ত ঝঁ্যাও ধরতে হবে।"

"ঝঁ্যাও আর আমাদের ধরতে হবে না—তার আগেই এ শালারা মিঁউ মিঁউ করতে করতে আসাম থেকে কেটে পড়বে। আর আমরা তখন বীরত্বের সঙ্গেই ব্রহ্মপুত্রে ঝাঁপ দেব।"

খগেন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, "শুনেছ ?"

পাঁচকড়ি বললে, "কি রে, কি শুনব ?"

"ভেবেছিলে বুঝি মনের আনন্দে রেলের কাজ করবে ? তুমি ঝাণ্ডা নাড়বে আর সুনীল 'টরে টক্কা' করবে ! ওসব হচ্ছে না যাদু ! জাপানীদের হাতে মরতে হবে ঝাঁকে ঝাঁকে, তাই আমাদের থাকতে হবে সামনে, তা না হলে ওঁরা 'হিরোয়িক রিট্রিট' করবেন কেমন ক'রে ! খবর রাখ কিছু ? কাল থেকে চাঁদমারী শুরু হচ্ছে—"

কয়েকজনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে অস্ফুট আর্তনাদ, "চাঁদমারী" !

জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের কোলে, চারিদিকে লাল নিশান পুঁতে শুরু হলো চাঁদমারী ! সকাল আটটায় যারা ডিউটিতে যাবে, তারা চাঁদমারী সেরে যাবে। আর আটটায় যারা নাইট ডিউটি থেকে ফিরবে, তারা চাঁদমারী সেরে ক্যাম্পে ফিরবে। নাইট ডিউটি ফেরৎ ক্লান্ত, নিদ্রাতুর ছেলেরা টলতে টলতে চাঁদমারীতে আসে। মোট কথা, কোম্পানির প্রত্যেকটি লোককে স্বহস্তে পাঁচ রাউণ্ড ক'রে গুলি ছুঁড়তেই হবে।

চাঁদমারী শুরু হলো। ষাট গজ দূরে টারগেট। ছেলেরা উপুড় হয়ে শুয়ে বাঁহাতের কনুইটা মাটির ওপর রাখে। বাঁহাতের পাতার ওপর পয়েণ্ট-অফ-ব্যালান্স রেখে, ডান হাতের মুঠোয় রাইফেলের গ্রিপ মজবুত ক'রে চেপে ধরে। দু'হাতের জোরে কাঁধের ওপর বাট ঠেসে ধ'রে তার ওপর ডান গাল রাখে। বাঁচোখ বুজে ব্যাক সাইট-এর ইউ-এর মধ্যে দিয়ে ফোর সাইট-এর নক আর টারগেটের বুল্ সমান্তরাল ক'রে নেয়। টারগেটের ওপর মন কেন্দ্রীভূত ক'রে নিঃশ্বাস বন্ধ করে। ট্রিগারের ওপর তর্জনী রেখে অপেক্ষা করতে থাকে ফায়ার-অর্ডারের। জমাদার সাহেব পাশে বসে হাঁক পাড়েন, "সামনে তুমহারা জাপানী দুশমন—ঠিকসে নিশানা লেও—"

লেফটেনাণ্ট প্যাঙ্কি হুকুম দেন, "এনিমি এ্যাট ইওর ফ্রণ্ট—ফাইভ রাউণ্ডস —রিপিট—ফায়ার—"

মুহূর্তের জন্যে ছেলেদের মনের কোণে ঝলক দিয়ে ওঠে, যারা আজ তাদের এই যুদ্ধের মধ্যে টেনে এনেছে,যারা আজ জুলুমে আর জবরদস্তিতেতাদের জীবন দুর্বিষহ ক'রে তুলেছে—তাদের ওপর যদি ছেড়ে দেওয়া যেত এই গুলির ঝাক !

চাঁদমারী শেষ ক'রে অনন্ত স্টেশনে যায় ডিউটিতে। সিভিলিয়ান এ.এস.এম জিজ্ঞেস করে, "অনন্তবাবু, আপনার বাড়ী কোথায় ?"

"কোলকাতায়। কেন ?"

"একটা বড় দুসংবাদ আছে, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"দুঃসংবাদ ! আমার ?"

"ঠিক আপনার কি না বলতে পারি না। কিন্তু কোলকাতায় যাদেরই বাড়ী তাদের সকলের।"

"আহা মশাই, ভণিতা ছেড়ে ব্যাপার কি তাই বলুন না !"

"জানেন, কাল দুপুরে জাপানীরা কোলকাতায় বোমা ফেলেছে—"

অনন্ত আচমকা সিট থেকে লাফিয়ে ওঠে, "এঁ্যা—বোমা ! কোলকাতায় ?"

এ. এস. এম. বললে, "হুঁ্যা।"

ক্ষণেকের জন্যে অনন্তর হাত-পা অবশ হয়ে যায়, ধপ করে আবার সে টুলটার ওপর বসে পড়ে। ধীরে ধীরে তার মাথাটা ভারী হয়ে আসে—ঝুঁকে পড়ে বুকের ওপর।

একটু পরে চোখ তুলে সে তাকায় এ. এস. এম.-এর মুখের দিকে। সে বেচারী ফ্যাল ফ্যাল ক'রে অনন্তর মুখের দিকে চেয়ে আছে—নিজেকে যেন সে মস্ত অপরাধী মনে করছে এমন একটা খবর দেওয়ার জন্যে। আর অনন্তর দৃষ্টি চলেছে রকেটের মতো ছুটে, ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে, আসাম ছাড়িয়ে বাঙলায়—বাঙলার সোনার মাটি মাড়িয়ে, সবুজ গাছের তলা দিয়ে গিয়ে পৌঁছেছে কোলকাতার পিচঢালা ঝকঝকে তকতকে রাস্তায়—রাস্তার পর রাস্তা পার হয়ে তার এঁদো ঘুণধরা বাড়ীর সামনে। হঠাৎ তার দৃষ্টি থমকে যায়—ঘাড়-মাথা গুঁজে এঁদো ঘুণধরা বাড়ীটা যেন মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। তার মা, দাদা, বৌদিদিরা ? এরা কি কেউ বেঁচে নেই—বাঁচার মতো অবসর কি এরা কেউই পায় নি ? তাদের জীবনের কোন আভাস তো সে পাচ্ছে না—একটা গোঙানির শব্দও তো ওই ধ্বংসস্তূপ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে না ! তাহলে কি সব শেষ—এই মানুষগুলো, যারা আর কিছুক্ষণ আগেও বেঁচে ছিল—কয়েকদিন আগেও যারা তাকে চিঠি লিখেছে পুনর্বার বিয়ে করতে,বুক ভরে চেয়েছে সুখে শান্তিতে

ঘর করতে—তারা আজ কেউ কি নেই ? জাপানীরা বোমা ফেলে সব শেষ করে দিলে—মুছে দিলে তাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা এই পৃথিবী থেকে ?

ঝট ক'রে অনন্ত উঠে পড়ে, হনহন ক'রে হাঁটতে থাকে ক্যাম্পের দিকে। হ্যাঁ, ছুটি তার চাই-ই। আর ছুটি যদি না দেয়, তাহলে সে আজই ফোর-ডাউন আসাম মেলে পালিয়ে যাবে—বাড়ী সে যাবেই। যাদের নিয়ে তার জীবন—যাদের জন্যে সে বেঁচে আছে, তাদের মরা-বাঁচা সে নিজের চোখে দেখবে।

স্টেশন পার হয়ে ইয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে অনন্ত চলেছে। হঠাৎ সে থেমে যায়। কিন্তু লীলা ! লীলাও কি বাঁচবে না এই বোমার হাত থেকে ? সারা কোলকাতা শহরই কি জাপানীরা বোমায় বোমায় গুঁড়িয়ে দেবে ! কিন্তু লীলা তো আর ও বাড়ীতে থাকে না। তার সঙ্গে তো লীলার আর কোন সম্পর্ক নেই—কোর্টে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক সে শেষ করে দিয়েছে। তবুও লীলা বাঁচুক—হয়তো কোনদিন সে লীলার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে পারবে—হয়তো আবার লীলাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে—হয়তো আবার তার জীবন শুরু হবে শান্তির একটি নীড়ের মধ্যে। করুণভাবে সে মিনতি জানায়, আহা লীলা বাঁচুক —লীলা বেঁচে থাক।

ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে দেখে, সমস্ত ছেলে ফল্‌ইন করেছে মাঠের মধ্যে। প্যারেড ফল্‌ইন নয়—যে যেমন অবস্থায় ছিল, ঠিক সেই অবস্থায়—কেউ লুঙ্গি পরে খালি গায়ে, কেউ হাফ-প্যাণ্ট পরে খালি পায়ে, কেউ ফুল ইউনিফর্মে খালি মাথায়। তাকে দেখতে পেয়ে সুবেদার সাহেব করুণস্বরে ডাকলেন, "অনন্ত, এখানে এস—"

ছেলেদের সামনে দাঁড়িয়ে মেজর ব্রাউন বলছেন, "কোলকাতায় বোমা পড়েছে—এখবর তোমরাও শুনেছ আর আমিও শুনেছি। বাড়ী যাওয়ার ছুটি তোমরাও চাইছ আর আমিও চাইছি। কিন্তু কে আজ কাকে ছুটি দেবে—আমি কার কাছে ছুটি চাইব ? কোলকাতায় আমারও বাড়ী। পার্ক স্ট্রীটের এক ফ্ল্যাটে থাকে আমার স্ত্রী, মাই বিউটিফুল এ্যাণ্ড ডিয়ার ওয়াইফ—আর দুটি ছোট ছেলেমেয়ে—আমি এখনই তাদের কাছে ছুটে যেতে চাই। আমি শুধু একজন মিলিটারী অফিসার নই—আমিও একজন মানুষ, একজন স্বামী, একজন পিতা। কিন্তু কেমন করে আমি যাব ! আমরা যদি আমাদের পোস্ট ছেড়ে চলে যাই—তাহলে জাপানীরা সমস্ত ভারতবর্ষটাকে বর্মা বানিয়ে ফেলবে। সেই জন্যেই আমরা আজ ছুটি পেতে পারি না। আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে যদি মরে গিয়ে থাকে, তাহলে আমার যাওয়া নিরর্থক হবে। আর

যদি তারা বেঁচে থাকে, ত্যাটস ওয়েল এ্যাণ্ড গুড—লেট আস হোপ সো।"

ক্যাম্পের ছেলেরা ধীরে ধীরে যে যার তাঁবুতে ফিরে গেল। আর অনন্ত যান্ত্রিক গতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার স্টেশনের দিকে চলতে লাগল।

ক্যাম্পের ছেলেদের চাঁদমারী শেষ হলে আসতে থাকে ডিট্যাচমেণ্টের ছেলেরা, একেবারে পাততাড়ি গুটিয়ে। এইভাবে চলে আসার পেছনে যে সংকেত রয়েছে, ছেলেরা তা বুঝতে পারে। জল্পনা-কল্পনায় তেমন উৎসাহ আর জাগে না—এ্যাডভেঞ্চার আর রোমাঞ্চকতার বুলিও কেউ কপচায় না। তারা জানে, তারা চলেছে আরও এগিয়ে। কোলকাতায় বোমা পড়া থেকে ছেলেরা আন্দাজ করতে পারে যুদ্ধ পরিস্থিতি। কেবল বার বার ভেসে ওঠে তাদের চোখের ওপর ইভ্যাকুয়েশনের ছবি—যুদ্ধদানবের যাঁতাকলে দলে-পিষে, গুঁড়িয়ে যাওয়া মানবতার রক্তাক্ত ছবি।

মেজর ব্রাউন রোলকলে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলেন, কোম্পানি মুভ করছে মণিপুর রোডে—আসাম-বর্মা সীমান্তের স্নায়ুকেন্দ্র—বিরাট রেলহেড। সেইখানে কোম্পানিকে পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে।

মণিপুর নামটাই কেমন যেন ভয়াবহ! মণিপুরে জাপানীরা বম্বিং করেছে, মণিপুর থেকে অসংখ্য ইভ্যাকুয়ী সমস্ত আসামে ছড়িয়ে রয়েছে—আজও তারাও তাদের গৃহে ফিরে যেতে পারে নি। মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্‌ফল থেকে বারো মাইল দূরে কাঙলা-টোঙবিতে জাপানীরা ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে।

খবর পাওয়া যায়, মণিপুর রোড থেকে ইম্‌ফল ১৩২ মাইল দূরে। ওই দূরত্বটুকুর মধ্যে থেকে ছেলেরা আশ্বাস সংগ্রহ ক'রে নেয়, তাহলে তারা একেবারে জাপানীদের মুখে গিয়ে পড়ছে না!

ক্যাম্পের ধারে সাইডিং লাইনে কোম্পানির জন্যে রেক প্লেস হলো। ছেলেরা স্বাভাবিক ভাবেই মালপত্র বোঝাই করলে। রোলকলের পর মাঠ থেকেই গাড়ীতে উঠল। ট্রেন ছাড়ল সতেরটা পঞ্চান্ন মিনিটে। চাপামুখ পৌছতে বাজল রাত প্রায় দশটা। খানা খাওয়ার জন্যে গাড়ী প্লেস হলো সাইডিঙে। সমস্ত কোম্পানির জন্যে পুরি-মাংস আর টিনের ফল। মেজর ব্রাউন অফিসারদের সঙ্গে ক'রে ছেলেদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ান, ঠাট্টা রসিকতা করেন, আরও মাংস আর পুরি নেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন।

খগেন বললে, "ব্যাপার কি! কেমন যেন নতুন নতুন ঠেকছে!"

পাঁচকড়ি বললে, "তাই বটে। আমরা হচ্ছি লাথির ঢেঁকি, লাথির বদলে চড় মারলে মনে হয় বুঝিবা হাত বুলোচ্ছে।"

অনন্ত বললে, "আসল কথা কি জান ? এখন ওদের গলায় পা পড়েছে, তাই সকলেই দয়ার অবতার। কাজ উদ্ধার হলেই নিজমূর্তি ধরবে।"

লামডিঙে ভোর হলো। ট্রেন পিকেটরা হেঁকে উঠল, "ফল্ইন ফর ফ্রেশ এয়ার—"

পাঁচকড়ি বলে ওঠে, "ও বাবা, মরে যাইরে—এ আবার কি হলো রে !"

ট্রেন পিকেটরা বললে, প্ল্যাটফরমে নেমে যে যার ইচ্ছামতো ঘুরেফিরে বেড়াও—কিছুক্ষণের মধ্যেই চা দেওয়া হবে।

চায়ের সঙ্গে বিস্কুট আর জ্যাম দেওয়া হয়েছে। ছেলেরা দল বেঁধে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ যেন তাদের ওপর মাতব্বরী করার নেই ! পাঁচকড়ি আবার বলে ওঠে, "এ যে একেবারে রামরাজত্ব বনে গেল রে !"

অফিসাররাও ছেলেদের সঙ্গে লাইন দিয়ে চা নিয়েছেন, ঘুরে ঘুরে ছেলেদের সঙ্গে গল্পগুজব করছেন। অমলদের দলটার সামনে এসে লেফটেনান্ট প্যান্সি হেসে জিজ্ঞেস করেন, "মিলিটারীতে ঢুকে নিশ্চয়ই তোমরা দুঃখিত হও নি ?"

সুনীল বললে, "নেভার স্যার।"

প্যান্সি সাহেব আরও কাছ ঘেঁষে এসে বললেন, "বাড়ীতে নিশ্চয়ই তোমরা এমন ব্রেকফাস্ট খেতে না ?"

খগেন চাপা গলায় জনান্তিকে বলে ওঠে, "ওরে শালা, মনে করেছে কি ! আমরা কাঙালী নাকি ?"

জয়ন্ত বললে, "না স্যার, সেই জন্যেই তো আর্মিতে ভর্তি হয়েছি—"

প্যান্সি সাহেব বললেন, "কেবল এই জন্যে ! আর কোন কারণ নেই ?"

"না, বাড়ীতে খেতে পাই নি, কোন চাকরি যোগাড় করতে পারি নি, তাই স্যার আমরা মিলিটারীতে ভর্তি হতে বাধ্য হয়েছি।"

প্যান্সি সাহেবের মুখের হাল্কাভাব সরে যায়—চোখ কুঁচকে জয়ন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, "দেন ইউ ওন্ট ফাইট দি জ্যাপস ?"

জয়ন্ত হেসে বললে, "কারও বিরুদ্ধে লড়ে জীবন দেওয়ার জন্যে আমরা মিলিটারীতে ভর্তি হই নি। আমরা মিলিটারীতে এসেছি নিজে বেঁচে বাড়ীর লোককে বাঁচাতে—"

প্যান্সি সাহেব তেড়ে ওঠেন, "দেন ইউ আর এ ফিফথ কলামনিস্ট—"

জয়ন্ত বললে, "এ্যাজ ইউ প্লিজ টু থিংক স্যার—"

প্যাঙ্গি সাহেবের হাত নিশপিশ করতে থাকে, উত্তেজিত ভাবে এদিক-ওদিক চাইতে থাকেন। অনেক ছেলে এসে জড় হয়েছে। জমাদার দাশগুপ্তকে দেখতে পেয়ে প্যাঙ্গি সাহেব ডাক দেন, "জমাদার সাব, কাম হিয়ার—" জমাদার সাহেব কাছে আসতেই জয়ন্তকে দেখিয়ে ফেটে পড়েন, "এ্যারেস্ট হিম—হি ইজ এ ফিফথ্ কলামনিস্ট—"

জমাদার সাহেব খুশিতে দাঁত বের করে বললেন, "দিস ইজ দি রিবেল গ্রুপ স্যার"—জয়ন্তকে দেখিয়ে, "এ্যাণ্ড দিস ইজ দি রিং লিডার—"জয়ন্তর কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, "চল তাহলে—"

হঠাৎ অমল ঠেলেঠুলে সবার সামনে এসে বলে উঠল, "এই কারণে যদি জয়ন্তকে এ্যারেস্ট করতে হয়, তাহলে আমাদেরও এ্যারেস্ট করা উচিত—"

জমাদার সাহেব থতমত খেয়ে যান, প্যাঙ্গি সাহেবও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। এদিক-ওদিক থেকে আরও ছেলে এসে জড় হয়েছে। পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, ব্যাপারটা কি! জমাদার সাহেবের পাশের ছেলেটি খেঁকিয়ে ওঠে, "মামার বাড়ী আর কি! এ্যারেস্ট করলেই হলো! কে ওকে বলেছিল প্রেমালাপ করতে?" কুণ্ডলীটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে। প্যাঙ্গি সাহেবের মুখ ক্রমেই লাল হয়ে উঠছে, আর জমাদার সাহেবের মুখটা ফাকাশে মেরে যাচ্ছে। মেজর ব্রাউন কোথা থেকে এসে ঠেলেঠুলে কুণ্ডলীটার মাঝখানে ঢুকে বললেন, "হোয়াটস দি ম্যাটার প্যাঙ্গি?"

প্যাঙ্গি সাহেব সংক্ষেপে ব্যাপারটা বললেন। সমস্ত শুনে মেজর ব্রাউন হো হো ক'রে হেসে উঠলেন, "হি ইজ রাইট প্যাঙ্গি—ছাটস দি রিয়্যাল ইণ্ডিয়ান সেন্টিমেণ্ট—জয়ন্তর পিঠ চাপড়ে বললেন, "সাব্বাস—ছাটস লাইক এ ব্রেভ বয়।" প্যাঙ্গি সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

হতভম্ব ছেলের দল কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মেজর ব্রাউন আর লেফটেনাণ্ট প্যাঙ্গির চলে যাওয়ার দিকে। তাঁদের পেছন পেছন চলেছে জমাদার দাশগুপ্ত ভয় পাওয়া একটা কুকুরের মতো পেছন দিকে চাইতে চাইতে।

পাঁচকড়ি আপন মনে বলে ওঠে, "নাঃ, ব্যাপার তেমন সুবিধের নয়! এ যেন কেমন কেমন ঠেকছে!"

মণিপুর রোড স্টেশনটা যে জায়গায়, সে জায়গাটার নাম ডিমাপুর। মণিপুর রাজ্যে যেতে হলে, মণিপুর রোড স্টেশনে নেমে পাহাড়ী রাস্তায় মোটরে যেতে

হয় ১৩২ মাইল। সমস্ত ডিমাপুর জায়গাটার মধ্যে বসতি বলে কোন বালাই নেই, আছে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু মিকির আর মিরি উপজাতীয়দের বস্তি। তাদের কাছে সভ্যতর জীবনের কোন সংবাদ আজও পৌছায় নি।

ডিমাপুর শহর গড়ে উঠেছে রেল স্টেশনটিকে কেন্দ্র করে। বৃহৎ স্টেশন, লোকো শেড, গুডস শেড, কয়েকটা সাইডিং লাইন, এই ছিল যুদ্ধপূর্ব স্টেশন। তারই গা ঘেঁষে বাজার—যুদ্ধপূর্ব যুগে এই বাজারটি ছিল ইম্ফলের ব্যবসায়ীদের যাত্রীনিবাস। এখানে ছিল কয়েকটি খাবারের দোকান, গোটা কয়েক দেশী হোটেল, আর রাত্রিবাসের জন্যে মাঠকোঠার ওপর ঘর। তখনকার দিনে ব্যবসায় ছিল চাল, চিঁড়ে, সুপারি, আর তাঁতের রকমারি কাপড়ের চালানী কারবার। জলের দরে জিনিস কিনে আনত ইম্ফল থেকে, আর এখানে বসে চালান দিত কোলকাতায়। যুদ্ধের দাপটে সে কারবারে ঘুণ ধরে গেছে। তাই তারাই এখন মনোহারি দোকান খুলে, সৌখিন রেস্তোরাঁ চালু করে সৈনিকদের পকেট-কাটার ফলাও কারবার ফেঁদে বসেছে। দোকানগুলো চলে মিমিটারী আইনের আওতায়, অর্থাৎ ডিমাপুর বেস-এর এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমাণ্ডাণ্টকে উপযুক্ত সেলামী দিতে পারলেই একটি লাইসেন্স, আর ডিমাপুর বাজারে একটি লাইসেন্স মানে রাতা-রাতি বড়লোক!

ডিমাপুর এখন মিলিটারী এলেকা। কাজেই নাগরিক জনসংখ্যা যাও-বা কিছু ছিল, তারা পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেছে। সমস্ত ডিমাপুরটাই মিলিটারীতে ঠাসা। রোজই নতুন নতুন কোম্পানি আসছে, তারাই বনবাদাড় কেটে সাফ ক'রে ক্যাম্প ফেলছে। এর ফলে অসংখ্য নতুন রাস্তা হয়েছে, জায়গায় জায়গায় তাঁবুর বদলে কাঁচায়-পাকায় ব্যারাক তৈরি হয়েছে। ডিমাপুর একটি ক্যান্টন-মেণ্টে পরিণত হয়েছে।

ডিমাপুরে পৌছে কোম্পানি স্টেশনের ছেঁচা বেড়ার রেলওয়ে কোয়র্টারে গিয়ে উঠল। স্টেশনের পেছনে পাকা কোয়ার্টারগুলোয় উঠল বি. ও. আর-রা। অফিসাররা উঠলেন পি. ডব্লিউ. ডি. বাঙ্গলোয়। কোম্পানির অফিস হলো স্টেশনের আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমে।

দ্বিতীয় দিনেই সিভিলিয়ানদের কাছ থেকে কাজ বুঝে নেওয়া শুরু হলো। বিরাট স্টেশন—তার তিনটে ভাগ, মেইন ইয়ার্ড, ইস্ট ইয়ার্ড আর ওয়েস্ট ইয়ার্ড। মেইন ইয়ার্ডে চলে যাতায়াতী ট্রেন; ইস্ট ইয়ার্ডে র‍্যাশন, ক্লোদিং, ক্যানটিন গুডস, এ্যামুনিশন ইত্যাদি খালাস করা হয়। ওয়েস্ট ইয়ার্ডের আবার চারটে ভাগ—ওয়েস্ট ইয়ার্ড, ওয়েস্ট ট্রুপস সাইডিং, মার্শালিং ইয়ার্ড আর সাইডিং লাইন।

সাইডিং লাইনে প্রথমে পড়ে তিনটে পেট্রল সাইডিং, তারপর জিরো সাইডিং, তারপর ডেড বডি সাইডিং, তারপর রেস্ট ক্যাম্প সাইডিং, আর লাইন শেষ হয়েছে হসপিটাল সাইডিঙে।

কোম্পানির ছেলেরা খুব খুশি। তাঁবু ছেড়ে ঘরে থাকা, এটা তো একটা অভাবনীয় ব্যাপার! তার ওপর সকলেই করে স্বাধীনভাবে রেলের কাজ, দায়িত্ব সমস্তটাই তাদের—এমন কাজে উৎসাহ আসে। কাজ জানা না-জানার জন্যে কিছু আটকায় না। একেবারে দায়িত্ব দিয়ে তাদের কাজে বহাল ক'রে দেওয়া হয়। যে কাজ জানে না সে প্রাণের দায়ে কাজ শিখে নেয়—নইলে ট্রেড-পে কাটা যাবে।

মোটামুটি কাজ যখন চালু হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ একদিন জয়ন্তর ডাক পড়ল কোম্পানি অফিসে। সোহরাব এসে হাঁক দেয়, "জয়ন্তবাবু, মেজর সাহেব আপনাকে ডাকছেন—"

অনন্ত যেন চমকে ওঠে, "মেজর সাহব ডাকছেন ? জয়ন্তকে !"

পাচকড়ি সোহরাবকে জিজ্ঞেস করলে, "কেন রে, জানিস নাকি কিছু ?"

"আমি তো ঠিক বলতে পারছি না—"

সুনীল বললে, "মেজর সাহেবের মেজাজটা কেমন দেখলি রে ?"

সোহরাব বললে, "এ শালার মেজাজ তো দেখি সব সময়েই ভালো।"

জয়ন্ত অফিস ঘরে পৌছতেই মেজর সাহেব হেসে তাকে কাছে ডাকেন, সামনের চেয়ারে বসতে বলে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তার ডিউটি আছে কি না। তারপর শুরু করলেন খোস গল্প, এটা—সেটা। নিজেই জানতে চাইলেন তার মিলিটারীপূর্ব জীবনের খুঁটিনাটি—তার বাড়ীতে কে কে আছেন, তাঁদের মধ্যে কে কি করেন, সংসার কেমন ভাবে চলে।

তারপর আলোচনার ধারাটা মোড় ঘোরে। ক্রীপস প্রস্তাব যে কংগ্রেসের গ্রহণ করা উচিত ছিল, সে কথা মেজর ব্রাউন বেশ জোর দিয়ে বললেন। আগস্ট আন্দোলনের ফলে এই বিরাট লণ্ডভণ্ডের জন্যে কংগ্রেসই দায়ী। সাধারণ ভারতীয়ের মনোভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, লামডিঙে জয়ন্ত যা বলেছিল, সে কথা আরও একবার তিনি সমর্থন করলেন। এতক্ষণে যেন জয়ন্তর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

সিগারেট অফার ক'রে মেজর ব্রাউন জয়ন্তর নির্ভীকতার প্রশংসা ক'রে বললেন, "আই লাইক ব্রেভ মেন—আই ওয়াণ্ট টু নো দেম।"

এতক্ষণে জয়ন্ত মেজর সাহেবের সামনে টাইপ করা কাগজটার দিকে লক্ষ্য

করে। মুভমেণ্ট অর্ডার! তার সমস্ত শরীরটায় কাঁটা দিয়ে ওঠে—ওঃ, এরই নাম ব্রিটিশ শাসন! মুখ তুলে জয়ন্ত মেজর ব্রাউনের মুখের দিকে চাইলে। সহাস্য মুখে তিনি কাগজটা জয়ন্তর দিকে এগিয়ে ধরলেন। তাঁর মুখের ওপর চোখ দুটো মেলে রেখে, জয়ন্ত কাগজটা ভাঁজ করতে লাগল।

মেজর সাহেব বললেন, "ডু ইউ নো, হোয়াট ইজ ইন ইট?

"ইয়েস স্যার, আই এ্যান্টিসিপেটেড ইট লং এগো—" খট ক'রে পা দুটো জোড়া ক'রে জয়ন্ত স্যালিউট করলে।

হেসে মেজর সাহেব প্রত্যাভিবাদন জানালেন।

বারো

নাইট ডিউটির পর বত্রিশ ঘণ্টা রেস্ট। অমল আর পাঁচকড়ি ডিউটি থেকে ফিরে কোনরকমে একখানা ক'রে পুরি আর এক মগ চা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুনীল হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকে অমলকে ঠেলাঠেলি শুরু ক'রে দিলে। ধড়মড় ক'রে উঠে প'ড়ে অমল বললে, "কি হয়েছে! এঁ্যা!"

সুনীল বললে, "ভয় নেই, জাপানীরা বোমা ফেলে নি—স্লিট ট্রেঞ্চে যেতে হবে না। একটা সুখবর দিতে এসেছি।"

পাঁচকড়িও উঠে পড়েছে, বিরক্তিভরে বললে, "চটপট বল মাইরি, আর জ্বালাস নি—একটু ঘুমোতে দে।"

সুনীল বললে, "অমল আজই ছুটিতে যাচ্ছে। যাতায়াতের সময় ছাড়া বাড়ীতে থাকবার একুশ দিন ওয়ার লিভ—"

পাঁচকড়ির ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে, "এ ছুটি কি শুধু অমলের জন্যে?"

সুনীল বললে, "না। আজ যাচ্ছে কুড়ি জন, আবার আসছে হপ্তায় যাবে আরও কুড়িজন—এইভাবে প্রতি সপ্তাহে যাবে কুড়িজন ক'রে।"

পাঁচকড়ি বলে ওঠে, "বলিস কি রে! এযে দেখছি ফাঁসির খাওয়া—এর পরই কি শূলে চড়াবে নাকি?"

সুনীল চলে গেলে অমল আর পাঁচকড়ি আবার শুয়ে পড়ল। নরম একটা খুশিতে অমলের মনটা সিরসির করছে। পাশ ফিরতে ফিরতে পাঁচকড়ি বললে, "তুমি আর ছুটি থেকে ফিরো না অমল—"

অমল হেসে বললে, "এমন কথা আর কোনদিন মুখেও এনো না।"

বিকেল সাড়ে ছ'টায় থি্র-থার্টি ডাউনে অমল উঠে বসল। ড্রাইভার লাইন ক্লিয়ার পেয়ে হুইসিল দিয়েছে। অমল ঘাড়টা বাড়িয়ে দেখতে থাকে গার্ড সিগন্যাল দিচ্ছে কি না। পাঁচকড়ি অমলের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস ক'রে বলে, "সকালে যা বলেছিলুম, মনে রেখো।"

গাড়ী ছাড়ল। জুন মাসের গরম, সমস্ত শরীরটা যেন ভেপসে উঠেছে। অমল জামার বোতাম ক'টা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে বসে। গায়ে ফুরফুর করে হাওয়া লাগছে, খুশিতে মনটাও যেন ভেসে চলেছে। গাড়ীতে অসম্ভব ভিড়, যাত্রীর অধিকাংশ সৈনিক। ছু-চারজন যে সিভিলিয়ান রয়েছে, তারা যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে। অমল প্রতিটি সৈনিকের মুখের দিকে চেয়ে ভাবে, তারাও বোধহয় তারই মতো ছুটিতে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ে পাঁচকড়ির কথা। পাঁচকড়ির সহানুভূতি আর মমতা যেন তার মনটার ওপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে!

ট্রেন চলেছে—গাড়ীতে মৃদু দোলানি লাগছে—অমলের শ্রান্ত অবসন্ন মনটাও ঝিমিয়ে আসছে। মৃদু খুশির হাসিতে ঠোঁটটা কুঁচকে উঠছে—তাহলে সে সত্যিই বাড়ী যাচ্ছে! ওঃ কতদিন পরে! হিসেব করে দেখে, পনেরোটি মাস তার কেটে গেছে সৈনিক জীবনে।

ভোর বেলায় পৌঁছল পাণ্ডুতে। ফেরি পার হয়ে উঠে বসে পার্বতীপুরের গাড়ীতে। আমিনগাঁও স্টেশন—ছবির মতো তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে সেই ইভ্যাকুয়ীদের ভিড়। সেই ওয়েটিং রুমের চালা, সেই বাজার। আর তাদের ক্যাম্পের সেই মাঠটার অবস্থা কি! ব্রহ্মপুত্র আজও সেই বিস্তীর্ণ—সেই একই গতিতে হু হু ক'রে নেমে চলেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার জীবনও বয়ে চলেছে। মনে পড়ে তার ভাবপ্রবণ মনের সেই যুগের কথা—ভেবেছিল, তার সদিচ্ছা আর সেবা দিয়ে দুর্গত মানুষের দুঃখ মোচন করবে! হাসি পায় তার নিজের কথা ভেবে। মনে পড়ে সেই মানুষগুলোর কথা, যারা এত দুঃখ কষ্টেও মরতে চায় নি। আচ্ছা, তারা গেল কোথায়?

লালমণিরহাট থেকে যেন দৃশ্য পরিবর্তন হতে থাকে। অগণন লোক লাইনের দুধারে জমা হয়েছে—চলন্ত ট্রেনের পাশে পাশে তারা দৌড়াদৌড়ি করছে। ট্রেন থেকে ছুঁড়ে দেওয়া এক প্যাকেট বিস্কিট বা একটা পয়সার জন্যে তারা মারামারি কাড়াকাড়ি করছে! অমল যেন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, এই তাহলে দুর্ভিক্ষের চেহারা! ক্যাম্পে বসে তারা শুনেছে দুর্ভিক্ষের কথা, আলোচনাও

সাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থাও করেছে, কিন্তু মনে তো তাদের কোন দাগ কাটে নি!

ঈশ্বরদী স্টেশনে গাড়ী থামে আট মিনিট। অমল আর গাড়ী থেকে নামতে সাহস পায় না—মিলিটারী দেখলেই বুভুক্ষিতের দল ছেঁকে ধরে! দেয়ালে হেলান দিয়ে কোণ-ঠেসে সে বসেই থাকে। জানলার ওপর দিয়ে এগিয়ে আসে একখানি নিরাভরণ বিশীর্ণ হাত। মুখ বাড়িয়ে অমল দেখতে পায় লম্বা একটি অবগুণ্ঠন। নীরব নিথর সে হাতখানা নড়ে না, কোন ইঙ্গিতও জানায় না—থেকে থেকে কেবল কেঁপে কেঁপে ওঠে।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে, চারিদিক থেকে আঁধার নেমে আসছে। অন্ধকারের খাঁজে খাঁজে কঙ্কালসার মানুষগুলো যেন তাদের শীর্ণ হাতখানি বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অমল কেমন যেন শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এতগুলো মানুষ ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে! নির্লজ্জের মতো হাত পেতে ভিক্ষা চাইছে! ওঃ, বুভুক্ষিত মানুষের কি কদর্য চেহারা!

অমলের পাশের ভদ্রলোকটি এক ঠোঙা খাবার নিয়ে খেতে শুরু করেছিলেন। প্রসারিত হাতখানা দেখে ঠোঙাটা সামনে রেখে বলে ওঠেন, "আঃ, একটু শান্তিতে দুটো দানা পেটে দেওয়ারও যো নেই। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, যেখানেই আপনি একদানা খাওয়ার জিনিস বার করবেন, সেইখানেই এদের কঙ্কালসার হাত ঠিক হাজির হয়েছে।"

ব্যাগ থেকে একটি টাকা বার ক'রে অমল সেই হাতটির ওপর ফেলে দিলে। হাতটা আচমকা কুঁচকে উঠে ধীরে ধীরে সরে গেল। ভদ্রলোক অমলের দিকে কটমট করে চেয়ে থাকেন। সে দৃষ্টির সামনে অমল কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠলেন, "ভাবলেন বুঝি একটা টাকা দিয়ে বিরাট দেশের কাজ ক'রে ফেললেন?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে অমল ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। ভদ্রলোক বলে চলেছেন, "আপনাদের আর কি! আছেন মজায় গভমেণ্টের হোটেলে—খাচ্ছেন দাচ্ছেন, নষ্ট করছেন, পচাচ্ছেন—তবুও একটি দানা চাল এদিকে আসতে দেবেন না! মনে করছেন কি আপনারা? আপনাদের মতো শত্তুরদের খাওয়ানোর জন্যে দেশসুদ্ধ লোক উজাড় হয়ে যাবে?"

অমল কেমন যেন নিজেকে অপরাধী মনে করে। তার মনে পড়ে, প্রতিদিন তাদের কোম্পানিতে অন্তত পঞ্চাশ জনের ভাত-ডাল নষ্ট হয়।

ভদ্রলোক তখনও আপন মনে গর্জাতে থাকেন, "ওঃ, ভারী মিলিটারী মেজাজ দেখাচ্ছেন—যেন ওই একটা টাকাতেই ওই মানুষটা বেঁচে যাবে!"

অমল ভদ্রলোকের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। মুহূর্তের জন্তে সে চোখ বুজোয়। চকিতে তার মনে পড়ে, বিমল তো বার বার তাকে টাকা বাড়াতে লিখেছে। তাহলে বাড়ীর অবস্থাটা কি ?

শিয়ালদায় পৌছতে রাত হয়ে যায়। প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়তেই অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। নিজের পোশাকের দিকে বারেক চেয়ে আপন মনেই বলে ওঠে, নাঃ, এ পোশাকে ট্রামে বাসে যাওয়া চলতে পারে না—যদি চেনাজানা কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায় !

সোজা অমল একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল। বাড়ীর কাছে পৌছে গলির মুখে নেমে ত্রস্ত দৃষ্টিতে আশেপাশে নজর করে দেখে। গলির মধ্যে কয়েক পা ঢুকে সে চমকে ওঠে। কি যেন একটা তালগোল পাকিয়ে পাঁচিলের ধারে নড়াচড়া করছে। অমল সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে, “কে ?”

দুটো ছোট ছেলে পাঁচিলের পাশ থেকে উঠে দাঁড়ায়—একটি বোধ হয় বছর আষ্টেক আর অপরটি বোধহয় তার চেয়েও ছোট। ছোটটা বড়টাকে দুহাতে আঁকড়ে রয়েছে। অমল বললে, “কিরে কি চাস ?”

“বাবু একটু ফ্যান—কাল রাত্তির হতে কিছু খাইনি বাবু—”

“তোদের বাড়ী কোথায় ?”

“বাড়ী বাবু জয়নগর। বাপ-মা আমাদের হারিয়ে গেছে—”

অমলের সঙ্গে ছেলেদুটি চলতে থাকে। বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়তে বিমল দরজা খুলে একটু ফাঁক করে উঁকি মারে, “কে ?” অমলকে দেখেই বলে, “চটপট ভেতরে চলে আয়—” একটা পাল্লা খানিকটা খুলে ধরে।

অমল পেছন দিকে চেয়ে বলে, “আমার সঙ্গে দুটো বাচ্চা—”

বিমল এক হেঁচকায় অমলকে ভেতরে টেনে নিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলে—খেঁকিয়ে উঠল অমলের ওপর, “এটা তোমার মিলিটারী ক্যাম্প নয়—ওসব নবাবী এখানে চলবে না।”

অমল ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। রিণি দৌড়ে তার কাছে এলো বটে, কিন্তু তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল না তো ! বিমল আর একটি কথাও বলছে না। মিনি সামনে এসে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে আবার রান্না ঘরে চলে যায়। ননীগোপালবাবু আর কমল বাড়ীতে নেই।

অমল কেমন যেন বিব্রত বোধ করছে—তার মনে হচ্ছে, সে যেন এখানে অবাঞ্ছিত। জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে অমল চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে—রিণি অনেক রোগা হয়ে গেছে, মিনিও তাই। বিমলের কপালের ওপর রেখাগুলো

যেন কেটে কেটে বসেছে। মিনি চাপা গলায় বিমলকে ডাকলে, "বড়দা এদিকে শোন—" ফিসফিস ক'রে কি যেন সব বলতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বিমল হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, "আমাকে কি তোরা পাগল না করে ছাড়বি না—"

ঠাকুমাকে কেউ অমলের আসার খবর দেয় নি। অমল গিয়ে তাঁর সামনে বসতেই ঠাকুমা বললেন, "কে র‍্যা,—" একটু নজর করে দেখে বললেন, "ওমা, অমি যে! কখন এলি, কতক্ষণ এসেছিস? ছুঁড়িগুলো আমাকে খবর দেওয়াটাও দরকার মনে করে না। বুঝলি দাদা, আমাকে তো এরা গেরাহ্যিই করে না— মনে করে দাসীবাঁদী কি একটা। আমারও যেমন কপাল—পোড়া দুর্ভিক্ষে এত লোক মরছে, আর আমি যেন হয়েছি যমের অরুচি—" হঠাৎ চুপ করে আবার হেঁকে ওঠেন, "অরে অ মিনি—"

কিছুক্ষণ মিনির জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকেন, তারপর আবার শুরু করেন, "দেখলি তো দাদা, ডাকলে একটা সাড়া পর্যন্ত দেয় না। ডেকে ডেকে মরে গেলেও সাড়া দেবে না, ওদের গেরাহ্যিই নেই—"

মিনি এসে বললে, "বলো কি বলছিলে—"

"বলি শোন না ইদিকে, আমার কাছে আয়—"

মিনি ঠাকুরমার পাশে এসে বসে। ঠাকুমা চাপা গলায় বলেন, "আজ তোদের কি হচ্ছে? ভাত চড়েছে, না সেই পিণ্ডি? ছেলেটাকে কি ক'রে সেই পিণ্ডি বেড়ে দিবি? এ্যাদ্দিন বাদে ছেলেটা বাড়ী ফিরল, তাকে তো তা বলে ওই পিণ্ডি বেড়ে দেওয়া যায় না! দেখ না, অমির কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিমলকে পাঠা না, কিছু চাল যদি জোগাড় করতে পারে—"

বাড়ীর আবহাওয়ার মধ্যে অমলের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। তাকে বাদ দিয়ে এরা সমস্ত জল্পনাকল্পনা করে, তার অজান্তেই বিলিব্যবস্থা হয়ে যায়, তাকে এড়িয়ে আড়ালে আবডালে ফিসফাস করে। বাড়ীর আর তার মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যবধান খাড়া হয়ে গেছে। অমল মিনিকে বলেছে, 'আমাকেও তো কিছু বলতে পারিস।' মিনি উত্তর দিয়েছে, 'তুমি বুঝতে পার না কেন মেজদা! তোমায় বলে লাভ কি। আর দুদিন বাদে তো তুমি আবার চলে যাবে।'

অমল আরও কুণ্ঠিত হয়েছে, আরও বিব্রত বোধ করেছে, তার জন্যে সব ব্যাপারেই একটা বিশেষ বন্দোবস্ত করার চেষ্টা দেখে। প্রতিবাদ করার ইচ্ছে হয়েছে; কিন্তু খাওয়ার সময় যখন ননীগোপালবাবু তার পাতের সামনে বসে খাওয়া দেখেন, তখন তার চোখ জ্বালা ক'রে ওঠে। পিতার সেই সস্নেহ চাহনি যেন তার সমস্ত দেহটাকে লেহন ক'রে বেড়ায়।

বাড়ীতে অমল একটু কমই থাকবার চেষ্টা করে। ঘুরে বেড়ায় রাস্তায় রাস্তায়। দেখে কনট্রোলের লাইন—মনে পড়ে তার ইভ্যাকুয়ীদের ট্রেনে ওঠার দৃশ্য। কি অদ্ভুত সাদৃশ্য এই দুই দৃশ্যের মধ্যে। সেই একই সংগ্রাম! কোনমতে প্রাণটাকে দেহের মধ্যে ধরে রাখার জান্তব প্রয়াস!

অমল দেখে, চল্লিশ টাকা দাম দিলে যত খুশি চাল পাওয়া যায়। অথচ ন্যায্য দামে চাল পাওয়ার জন্যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের লোক ছুটে এসেছে শহরে। কনট্রোলের দোকানের পাশে ফুটপাতের উপর দিনের পর দিন হাজারে হাজারে লোক শুয়ে থাকে, রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে, অকস্মাৎ একদিন মরে যায়। এও তো সেই ইভ্যাকুয়ী সৈনিকদের মতো বাঁচবার জন্যে পালিয়ে আসতে গিয়ে মরার মতো। তাহলে এই দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধ একই ব্যাপার! দুয়েরই সেই একটিমাত্র পরিণতি—হাজারে হাজারে মানুষ মরা!

আরও দেখে অমল, পাড়ায় পাড়ায় বসেছে লঙ্গরখানা। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা প্রাণ দিয়ে খাটছে। তারাই রান্না করছে, তারাই পরিবেশন করছে। গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে আসা মানুষগুলোকে তারা চাইছে বাঁচিয়ে রাখতে। কিন্তু লঙ্গরখানার খিচুড়ি খেয়ে কেউ বমি করতে শুরু করে, কারও কলেরা হয়। এই লঙ্গরখানাগুলোও কি বিনা পয়সায় চা বিতরণকারী ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্স-প্যানশান বোর্ডের মতো একই জাতের মহানুভব প্রতিষ্ঠান!

হঠাৎ অমলের মনে প্রশ্ন জাগে, এই লঙ্গরখানায় চাল আসে কোথা থেকে? লঙ্গর বসিয়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের খিচুড়ি খাওয়ানোর মতো চাল যদি দেশে থাকে, তবে দুর্ভিক্ষ হয় কেমন ক'রে?

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে অমল একটা লঙ্গরখানার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফুটপাথের ওপর শালপাতা পেতে বসে গেছে বুভুক্ষু মানুষের দল। চিৎকার করছে তারা ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে। বালতিতে খিচুড়ি নিয়ে পরিবেশন করছে কর্মী ছেলেমেয়েদের দল। একটি মেয়ে খিচুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে। এক বৃদ্ধার পাতে খিচুড়ি দিতেই, সে খপ ক'রে মেয়েটির কাপড় চেপে ধরে বললে, "আরও একটু দাও মা।"

মেয়েটি বললে, "আর নিও না বুড়ি মা—বেশি খেলে অসুখ করবে।"

বৃদ্ধা রেগে চিৎকার ক'রে ওঠে, "কি অসুখ করবে? না খেয়ে খেয়ে জোয়ান-মদ্দ মানুষগুলো ধড়ফড়িয়ে ম'রে যাচ্ছে, আর তুমি বলছ কি না, বেশি খেলে অসুখ করবে!"

পাশের লোকেরা অস্থির হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে থেকে একজন চিৎকার

ক'রে ওঠে, "এই বুড়ি হারামজাদি, ছেড়ে দে না মা ঠাকরুণকে—তুই তো মরবিই, তোর সঙ্গে আমরাও মরব নাকি ?"

বৃদ্ধা কিছুতেই মেয়েটির কাপড় ছাড়তে চায় না, একটানা বলে চলে, "আর একটু দাও—"

মেয়েটি আরও খানিকটা খিচুড়ি বৃদ্ধার পাতে দেয়। তবুও বৃদ্ধা তাকে ছাড়ে না, আবার বলে, "আরও একটু দাও—"

ওদিকে লাইনে হৈচৈ পড়ে গেছে, একজন তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে বৃদ্ধাকে মারতে। অপর একটি কর্মী মেয়েটির হাত থেকে বালতিটা নিয়ে বললে, "আমি বাকিটা দিয়ে দিচ্ছি, আপনি এই বুড়িকে বোঝান—"

মেয়েটি বৃদ্ধার সামনে বসে বলে, "আজকে একটু কম ক'রে খাও, কাল বেশি ক'রে খেও। অনেকদিন বাদে প্রথমেই বেশি খেলে যে অসুখ করবে।"

"আজ তিন দিন কিছু খাইনি মা—আমার দু দুটো জোয়ান-মদ্দ ছেলে মরে গেল—বড় ছেলের বৌটা যে কোথায় গেল, কে জানে! আর ওই ড্যাকরা মিনসে মধু ঘোষ তার ঘরে দু'শো মন চাল তালা বন্ধ ক'রে রেখেছে—বলে টাকা-টাকা সের—টাকা কোথায় পাব মা—"

বৃদ্ধা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মেয়েটি তাকে ঠেলা দিয়ে বলে, "তুমি খেয়ে নাও বুড়ি মা—"

বৃদ্ধা আবদারের সুরে বলে, "আর একটু দেবে তো ?"

"দেব বৈকি, তোমাদের খাওয়ানোর জন্যেই তো এই ব্যবস্থা। কত বড় বড় লোক রয়েছেন এর পেছনে, যত চাল লাগবে, সবই তাঁরা দেবেন—"

বৃদ্ধা কুতূহলী হয়ে ওঠে, "হ্যাঁগো মা, শহরে বুঝি অনেক চাল আছে ?"

মেয়েটি বলে, "তা আছে বৈকি! কিন্তু ভীষণ দাম—"

কিছুক্ষণ বৃদ্ধা মেয়েটির দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারপর এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে তার নিজের পাতের দিকে নজর পড়ে যায়। হঠাৎ সে থাবা থাবা খিচুড়ি মুখে পুরতে থাকে।

অমল ধীরে ধীরে সরে যায়। কিছু দূরে গিয়ে আবার সে থমকে পড়ে। শহরে অনেক চাল আছে! কিন্তু কোথায় ? পয়সার অভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ মিলিটারীতে ঢুকে যুদ্ধের মাঠে মরছে—আর চালের অভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে এসে শহরের রাস্তায় মরছে। অথচ প্রচুর পয়সা আছে মিলিটারী বিভাগ চালাবার মতো, আর চালও আছে লঙ্গরখানা চালাবার মতো। কিন্তু কোথায় আছে এই পয়সা আর চাল ?

ট্রেন থেকে নামতেই অমলের সঙ্গে দেখা হলো পাঁচকড়ির। পাঁচকড়ি দৌড়ে এসে অমলকে জড়িয়ে ধরে বললে, "তাহলে সত্যিই ফিরে এলে।"

অমল হেসে বললে, "ফিরব না তো কি কেটে পড়ব মনে করেছিলে ?"

"ভেবেছিলাম, এই নরকপুরীতে আর বুঝি ফিরবে না।"

"তাও আজ আর সম্ভব নয় পাঁচকড়ি, সে রাস্তাও এরা মেরে দিয়েছে।"

"কি রকম ?"

"একুশ দিনের মধ্যে বাড়ীতে প্রায় দশ দিন ভাত খেতে পাই নি। কচুর ডাঁটা থেকে শুরু ক'রে ছাতু, বেশম, খুদ, যা জুটেছে তাই দিয়ে পেট বোঝাই করেছি। বাড়ীতে ভাত যেদিন হয়, সেদিন সকলে খায় বেলা তিনটের সময় —এক খাওয়ায় দু'বেলার কাজ হয়ে যায়।"

পাঁচকড়ি বললে, "তাহলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ লেগেছে বলো। তাই আজকাল বাড়ী থেকে যে সমস্ত চিঠি পাই, তার আধখানাই এরা সেন্সর করে কেটে দেয় —পাছে আমরা সেখানকার সঠিক খবর জানতে পারি ! তোমাদের বাড়ীতেই যখন এমন অবস্থা, তখন না জানি আমাদের চেয়েও যারা গরীব, তাদের অবস্থা কি !"

অমল ধীরে ধীরে বলতে থাকে কোলকাতার অবস্থা—যা সে দেখেছে, যা সে বুঝেছে, সবই একে একে। শুনতে শুনতে পাঁচকড়ি ক্ষেপে ওঠে, "আর এ শালারা আমাদের কিছু জানতে দিচ্ছে না।"

"এইটাই তো এদের কায়দা। ওঃ, সিভিলিয়ানরা যে আমাদের কী সাংঘাতিক ঘৃণা করে, সে তুমি নিজের চোখে না দেখলে বুঝতে পারবে না পাঁচকড়ি।" পাঁচকড়ি গুম হয়ে খানিকটা চুপ ক'রে থাকে। অমল বললে, "তারপর, এখানকার হালচাল কি, তাই বলো ?"

"হালচাল ! চমৎকার ! একেবারে নিঃসাড়ে জবাই হচ্ছি—"

অমল বললে, "তার মানে ?"

পাচকড়ি বললে, "জয়ন্তর কথা বর্ণে বর্ণে ফলতে শুরু করেছে।"

"আর একটু খুলে বলো পাঁচকড়ি—"

পাঁচকড়ি বললে, "তাহলে চলো ওয়াই. এম. সি. এ. ক্যানটিনে—বসে কথা কওয়া যাবে। স্টেশনের চেহারা দেখেই বোধহয় বুঝতে পারছ, আমরা এখন স্টেশনের কোয়ার্টারে থাকি না। ক্যাম্প হয়েছে ওয়েস্ট ইয়ার্ডের পেছনে— উপস্থিত তাঁবু, পরে নাকি ছেঁচাবেড়ায় বাসা হবে।"

দু'মগ চা নিয়ে একটা টেবিলে ওরা বসল। "তাহলে শোন এবার—" চায়ের

মগে একটা চুমুক দিয়ে পাঁচকড়ি বললে, "এই শালা মেজর ব্রাউন হচ্ছে পাক্কা একটি মিছরির ছুরি! মেজর রায় মারতেন হাতে, আর ইনি মারছেন ভাতে। ধ্বড়াধ্বড় মাইরি ট্রেড-পে কেটে নিচ্ছে। একটা কিছু খুঁত পেলেই হয়! সেদিন তো শিবেনের আঠাশ দিনের ট্রেড-পে কেটেছে। আসল ব্যাপারটা কি জানো, কোয়ার্টার গার্ড দিলে যে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, তাই আর- আই- না দিয়ে কাটে ট্রেড-পে। ড্রাইভার দাউদ খাঁর এক মাসে ছাব্বিশ দিনের ট্রেড-পে কেটেছে। মাইনের দিন পাঁচ-দশ টাকার বেশি আর কোন মিঁয়াকে নিতে হচ্ছে না।"

অমল বললে, "তারপর—"

"তারপর আর কি, চলেছে ত্যানা-না-না ক'রে। ওঃ—হ্যাঁ হ্যাঁ, আর একটা খবর আছে। শালা কেলে মাণিক ঘাড় থেকে নেমেছে—"

অমল বললে, "তার মানে!"

"তার মানে, ও-শালা আর এ কোম্পানিতে ফিরছে না। কি একটা ব্যামো ধরেছিল, তার জন্যে গিয়েছিল হাসপাতালে। সেখান থেকে দিয়েছে ইণ্ডিয়ায় পাঠিয়ে। কাজেই আমাদের স্কন্ধ থেকে উনি নামলেন।"

"কি অসুখ করেছিল?"

"সে অত খোঁজ রাখে কে? শালার অসুখ করেছিল বলেই তো আমাদের ঘাড় থেকে নামল। আমরা তাতেই খুশি।"

অমল বললে, "যাঃ পাঁচকড়ি, মনকে অত সংকীর্ণ করো না।"

পাঁচকড়ি টেবিলের ওপর চাপড় মেরে বললে; "তুমি বলছ কি অমল! ওই শালা কেলে মাণিকের যখন অসুখ করেছে, তখন ক্যাম্পসুদ্ধ ছেলে ওর মৃত্যুর জন্যে মানত করেছে। ওর মতো একটা নরকের কীট বাঁচল কি মরল, তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না।"

"যাক, তারপর আর কি খবর বলো?"

"জমাদার দাশগুপ্তর জায়গায় এখন কাজ করছে হাবিলদার মেজর রামকিষণ, আর হাবিলদার মেজরের কাজ করছে হাবিলদার মুখার্জি। এই আর এক শালা হারামি! ওঃ, সুবেদার সাহেবকে কি খোশামোদটাই না করছে—জুতো পালিশ থেকে মাথার উকুন পর্যন্ত বেছে দিচ্ছে—"

অমল খিলখিল করে হেসে ওঠে, "যাঃ, তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ!"

"মোটেই না—সে তুমি না দেখলে বুঝতে পারবে না। নেড়ি কুত্তাগুলোকে পুষলে সেগুলো যেমন করে, এ-শালা সুবেদার সাহেবের সঙ্গে ঠিক সেই রকম করছে। তুমি বলো কি, ও-শালা সুবেদার সাহেবকে এমন বাগিয়ে নিয়েছে যে,

জমাদার রামকিষণের কোন পাত্তাই নেই—সে বেচারা আমাদের কাছে এসে দুঃখ করে।”

অমল বললে, “তাহলে কোম্পানির অবস্থা বেশ কাহিল বলো?”

“সে আর বলতে! জয়ন্তকে তো ভাগালে, তোমাকেও দিলে ছুটি। সেই মৌকায় ওই শালা হাবিলদার মুখার্জি উঠে পড়ে লেগে গেল আমাদের পেছনে। আজ একে ডাকে, কাল ওকে ডাকে, আর সকলকেই খোঁটা দেয় তোমাদের চেলা বলে, কখনও ল্যান্স-নায়েক ক'রে দেওয়ার লোভ দেখায়, আবার কখনও শাসায়—'কেউ টঁ্যা-ফু করেছ তো কোম্পানি থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেব'। আমার তো মনে হচ্ছে, তোমাকেও বেশিদিন আর এ কোম্পানিতে রাখছে না।

ক্যাম্পে ফিরে অমলের প্রথম কাজ হলো হাবিলদার মেজরের কাছে রিপোর্ট করা। হাবিলদার মেজরের একটা আলাদা তাঁবু। সেই তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই হাবিলদার মেজর মুখার্জি অভ্যর্থনা করলেন, “আরে অমলবাবু যে, আসুন—আসুন।”

অমল তার রাহ্‌ধারিটা এগিয়ে দিয়ে বললে, “আমি ফিরেছি থ্রি টোয়েন্টি-নাইন আপ-এ।”

“আরে বস একটু! কোলকাতা থেকে আসছ—খবর-টবর শুনি। আমার কি ছাই আর ছুটিতে যাওয়া হবে!”

তার দিকে এগিয়ে দেওয়া ক্যাম্প-টুলটার পাশে অমল দাঁড়িয়ে রইল। হাবিলদার মেজর মুখার্জি বললেন, “ঠিক এই জন্যেই আমি হাবিলদার মেজর হতে চাই নি। ছেলেরা আগে তবুও আমার সঙ্গে গল্পগুজব করত, কিন্তু আজকাল আমাকে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। কিন্তু আমি কি করব বলো তো ভাই। আমার সঙ্গে গল্প করার হুকুম তো আর দিতে পারি না। আমি কোলকাতার খবর জানতে চেয়েছিলাম এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড—”

অমল টুলটার ওপর বসে পড়ল। হাবিলদার বললেন, “আমারও বাড়ী কোলকাতায়—ভাবনা-চিন্তা আমাদেরও তো হয়।”

অমল বললে, “খবর আর তেমন বিশেষ কি! চাল বাজার থেকে একেবারে উবে গেছে, চল্লিশ টাকার কমে একদানাও পাওয়া যায় না। গ্রাম থেকে আসা হাজার হাজার লোক রোজই মরছে।”

হাবিলদার মেজর বললেন, “তা ব'লে ওই ভিখিরীগুলোকে শহরে ঢুকতে দেওয়া উচিত হয় নি—যদি লুটপাট শুরু করে!”

“কিন্তু ওরা তো দেখলুম না খেয়ে ধড়ফড়িয়ে মরে যাচ্ছে, তবু একটা দোকান

থেকে একদানা চালও লুট করছে না।”

“কেন বলো তো ?”

লুট করবার মতো ক্ষমতা যে আর ওদের নেই। ওরা তো জানে না, ওদেরই গোলার ধান লুঠে নিয়ে শহরের কালোবাজার তৈরি হয়েছে। ওরা শহরে এসেছে বাঁচবার আশায় ; ভেবেছে যেখানে এত বড় বড় লোক বাস করে, সেখানে পৌছতে পারলে বাঁচার একটা বন্দোবস্ত হবেই।”

হাবিলদার মেজর মাঝখান থেকে বলে উঠলেন, “যাক, এসব লেকচার যেন আবার ছেলেদের কাছে ঝেড়ো না—”

অমলের মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে। বললে, “তার মানে !”

“মানে বুঝে আর দরকার নেই। একটা কথা বলে রাখি, তোমারই ভালোর জন্যে—তুমি একজন শিক্ষিত ভদ্রঘরের ছেলে, বুঝেসুঝে যদি চলো, তাহলে এই কোম্পানিতেই তোমার অনেক উন্নতি হতে পারে—” রাহধারিটার ওপর খসখস ক'রে সই দিয়ে বললেন, “রাহধারিটা জমা দিয়ে ট্রাফিক অফিসে রিপোর্ট করবে।”

ঝট ক'রে উঠে পড়ে অমল বাইরে এলো। তার সমস্ত শরীরটা থরথর ক'রে কাঁপছে, মাথার মধ্যে যেন দপদপ করছে। তাঁবুতে ফিরতেই খগেন বললে, “কি অমল, তোমার পুরনো বন্ধু কি বললে ?”

অমল বললে, “আমার পুরনো বন্ধু !”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে মুখার্জি সাহেব। তোমার বন্ধু নয় ! তোমাকে প্রথম কোয়ার্টার গার্ড দেখিয়েছিলেন ! যাক, কি বললেন, তাই বলো।”

“বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা আজও তিনি দেখালেন। দেখলাম, আমার ভালোর জন্যে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বললেন, বুঝেসুঝে চললে এই কোম্পানিতেই নাকি আমার অনেক উন্নতি হতে পারে।”

স্বরাজ বললে, “আরে যেতে দাও ও শালার কথা—ও তো সকলকেই উন্নতির পথ দেখাচ্ছে। যাক, রিপোর্টিংটা সেরে এস, আর অকাদাকে চেপে ধরবে, ডিউটি তোমাকে দেওয়া চাই-ই—”

অমল বললে, “তা অকাদাকে বলে কি হবে ?”

স্বরাজ বললে, “বলো কি হে, অকাদাই তো এখন আমাদের ফাদার-মাদার —টেকনিক্যাল ডিউটির ইন-চার্জ হাবিলদার—”

অমল আবার প্রশ্ন করলে, “অকাদা আবার হাবিলদার হলো কবে ?”

খগেন বললে, “সবই হয়, যদি এলেম থাকে। অকাদা যে এখন অফিসারদের কল্পতরু—হাঁস, মুরগি, ডিম, মদ থেকে শুরু ক'রে দেশী মেয়ে পর্যন্ত তিনি

সাপ্লাই করছেন।”

কোম্পানি অফিসে রাহধারি জমা দিয়ে অমল ট্রাফিক অফিসে ঢুকল। অকাদা একটা কাগজ সামনে রেখে বিরিঞ্চি-বাবার মতো বসে আছেন। ছেলেরা এই ডিউটি-ডায়াগ্রামটিকে বলে, অকাদার গোলকধাঁধা।

অফিসারদের সামনে ছেলেরা তাঁকে বলে হাবিলদার চ্যাটার্জি; সামনাসামনি বলে ‘দাদা’, আর নিজেদের মধ্যে বলে ‘অকাদা’—অকা কথাটি তাঁর নাম অক্ষয়ের অপভ্রংশ। অমল টেবিলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে, “দাদা আমি এসেছি—”

অকাদা তদবস্থ থেকেই, বাঁ হাতটা তুলে চুপ করতে বললেন। কিছুক্ষণ সেইভাবে থাকার পর গোলকধাঁধার কয়েকটি জায়গায় গোটাকয়েক বিন্দু বসিয়ে বললেন, “তুই এসেছিস ভাই, বড় ভালো সময়ে এসেছিস। আর একটা দিন যদি দেরি করতিস ভাই, তাহলে কিন্তু কিচ্ছু করতে পারতুম না।”

অমল বললে. “কেন দাদা!”

“দাঁড়া ভাই, একটু চুপ কর—” বলেই খসখস ক’রে একটা খাতার ওপর খানিকটা লিখে চললেন। লেখা শেষ ক’রে খাতাটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, “নে ভাই একটা সই করে দে—”

অমল বললে, “কিসে সই করব দাদা ?”

“এই দেখ না, ঈস্ট ইয়ার্ডে তোকে লার্নিং ডিউটিতে লাগিয়ে দিলুম।”

“এই তো সকালে ফিরলুম দাদা, একটু রেস্টও দেবেন না ?”

“ওই তো তোদের দোষ ভাই! ভালো করতে গেলেই তোরা উল্টো বুঝবি। ওদিকে কি হচ্ছে, তা জানিস ?”

“কোন দিকে!”

“সুবেদার সাহেব চেষ্টা করছে তোকে স্পেয়ার রাখবার—তাহলেই মনের সাধে তোকে দিয়ে ফেটিগ খাটিয়ে নেবে। এদিকে কোম্পানিসুদ্ধ ছেলে আমাকে শাসিয়ে রেখেছে, ‘দাদা, অমল ফিরলেই, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডিউটি দেওয়া চাই।’ নে ভাই, তুই সইটা একবার করে দে—আমি এক্ষুণি গিয়ে বড় সাহেবকে দেখিয়ে রাখব। তাহলে আর কোন মিয়াঁর ট্যা-ফু করতে হবে না।”

তেরো

দ্বিতীয় শিফটে অমলের ডিউটি—বেলা একটা থেকে রাত ন'টা। ডিউটি-ওয়ালারা হাবিলদার মেজরের তাঁবুর সামনে পনেরো মিনিট আগে ফল্‌ইন করে। হাবিলদার মেজর দেখেন, তাদের ইউনিফর্ম ঠিকভাবে পরা হয়েছে কি না, সঙ্গে ফার্স্ট-ফিল্ড-ড্রেসিং, এ্যান্টি-ইন্‌সেক্ট-ক্রীম আর স্টীল-হেলমেট নিয়েছে কি না। পরিদর্শন শেষ ক'রে তিনি মার্চ অফ্ করিয়ে দেন, "টু ইওর ডিউটিজ—কুইক মার্চ—"

ওয়েস্ট ইয়ার্ডে পৌঁছে ডিউটিওয়ালারা ভাগ ভাগ হয়ে যায়। অনন্ত বললে, "চলো অমল, আমরা লোকো শেডের পাশ দিয়ে যাই।" আর সকলের কাছ থেকে একটু তফাত হয়ে গিয়ে অনন্ত বললে, "জানো অমল, লীলা আমার চিঠির উত্তর দিয়েছে।"

অমল বললে, "তুমি কি চিঠি লিখেছিলে না কি ?"

"এক-আধখানা নয়, অন্তত দশ-বারোখানা। দিন তিনেক হলো, তার কাছ থেকে উত্তর পেয়েছি। এখনও সে আমাকে আমলই দিতে চায় না।"

হঠাৎ অমলের মনে পড়ে যায় আমিনগাঁও ক্যাম্পের পাশে সেই মেয়েটির কথা—তার জীবনের প্রথম নারী। তার অমন আকুল চাওয়াকেও সেই মেয়েটি আমল দেয় নি। যেন আপন মনেই অমল বলে ওঠে, "জানো অনন্ত, মেয়েরা পুরুষদের মোটেই বিশ্বাস করে না—"

অনন্ত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, "তাহলে কি লীলাও আমাকে বিশ্বাস করবে না ?"

অমল অনন্ত-র পিঠে হাত রেখে চলতে চলতে বললে, "তুমি যে বিশ্বাসযোগ্য, সেটা প্রমাণ করতে হবে অনন্ত—তার জন্যে সময় লাগবে।"

মেইন ইয়ার্ডে ওরা এসে পড়েছে। অমল দেখলে একজন আমেরিকান সৈনিক রীতিমত দৌড়ঝাঁপ করছে। নিজেই সে কাপলিং খুলছে, সিগ্‌ন্যাল দিচ্ছে, পয়েণ্ট বানাচ্ছে। অমল অবাক হয়ে বলে, "ওই আমেরিকানটা আবার এখানে কি করছে ?"

অনন্ত বললে, "ও যে আমাদের ড্যান, আমেরিকান ইয়ার্ড মাস্টার !"

"আমাদের কোম্পানিতে আমেরিকানরাও পোস্টেড হয়েছে না কি ?"

"তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি ? যেখানে দেখছ, আমেরিকার দেওয়া প্রতিটি জিনিসের ওপর নির্ভর ক'রে ব্রিটিশ আজ কোন রকমের যুদ্ধ চালাচ্ছে, সেই

আমেরিকানরা কি আসবে না আমাদের কোম্পানিতে !"

"তবে ?"

"তবে আর কি ! ওরা আছে জনবারো এই মণিপুর রোড স্টেশনে, আর ওদের ওপর আছে একজন লেফটেন্যাণ্ট। এই ক'জনের কাছে আমাদের কোম্পানির টিকিটি বাঁধা। ওদের সামনে আমাদের প্রভুরা তো গড়ুর পক্ষীটি হয়ে আছেন—আমরা তো কোন দাসস্য দাস।"

"এ আবার কবে থেকে হলো ?"

"এই তো এই মাসের গোড়া থেকে। বাঙলা আর আসামের সমস্ত রেলওয়ে এখন ওদেরই তাঁবে। আমেরিকান ডব্লিউ. ডি. ইঞ্জিন কিছু কিছু এসে পড়েছে, ওয়াগনও নাকি শীগগিরই আসছে। এক কথায়, আসাম ফ্রণ্টে লড়াই ওরাই চালাবে।"

অমল বললে, "তার মানে, গোদের ওপর বিষফোঁড়া !"

অনন্ত স্বর নামিয়ে বললে, "সেদিন শুনছিলুম, ব্রিটিশ নাকি আমেরিকার কাছে বাঙলা আর আসাম লীজ দিয়ে দিয়েছে।"

স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে অনন্ত বললে, "তোমার তো লার্নিং ডিউটি অমল, এক ফাঁকে স্টেশনে এস, আমেরিকানদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব—ভারী মিশুকে আর সরল এরা।"

ঈস্ট ইয়ার্ডে পৌছে অমল দেখে, ইয়ার্ড ফোরম্যান স্বরাজ কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে। একটা লাইনের সমস্ত ওয়াগনগুলোকে সর্টিং করছে—খালি ওয়াগন আর রকমারি লোড বাছাই ক'রে পাশাপাশি তিন চারটে লাইনে ছড়িয়ে ফেলেছে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সর্টিং লক্ষ্য করতে করতে অমলের নজর পড়ল একটি ব্রিটিশ সৈনিকের ওপর। কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে একটা ওয়াগনের পাশাপাশি দৌড়োদৌড়ি করছে। অমল তার ভাবগতিক দেখে বলে ওঠে, "ব্যাটা যেন ক্যাসাবিয়াংকা !"

স্বরাজ বললে, "দাওয়াই পড়লে আর ক্যাসাবিয়াংকা হবে না !"

অমল বললে, "কি রকম !"

"ব্যাটা এসে আমার ওপর তম্বিগম্বি করছিল, ওর ওয়াগন আগে প্ল্যাটফরমে প্লেস করতে হবে। আমি অমনি মোক্ষম দাওয়াই ছেড়ে দিলুম, 'যাও, আমেরিকান ইয়ার্ড মাস্টারের কাছ থেকে সান্টিং অর্ডার করিয়ে আনো'—আর কি ! সাপের মাথায় বিষবড়ি—সুড়সুড় ক'রে গিয়ে এখন ওয়াগন সামলাচ্ছে।"

"তা সামলাবার কি আছে !"

"আছে বৈকি। আমরা যে ব্লাডি ইণ্ডিয়ান—যদি চুরি করি! খাস বিলিতী সোলজারদের জন্যে এদের একখানা বই আছে, তার নাম 'আওয়ার এম্পায়ার' —তোমায় বলব কি অমল, সে বইখানা যদি পড় তো তোমার মাথায় খুন চেপে যাবে! ইণ্ডিয়ান মাত্রেই চোর, জোচ্চোর, গাঁটকাটা, এই সব আর কি! সেইসব পড়ে ওর দিব্যজ্ঞান হয়েছে, কাজেই উনি ওর বাবার সম্পত্তি সামলাচ্ছেন।"

অমল বললে, তার জন্যে তো আর ওই লোকটি দায়ী নয়—ওদের গভর্নমেণ্ট যেমনটি ওকে বুঝিয়েছে, ও ঠিক তেমনটি বুঝেছে। আচ্ছা, আমি ওকে বুঝিয়ে বলে আসছি—"

স্বরাজ বললে, "তোমার যে দেখি ওর জন্যে দরদ উথলে উঠল! মরুকগে না শালা লালমুখো—"

অমল যেতে যেতে বললে, "দেখিই না, কি বলে—"

কিছুক্ষণ বাদে অমল ফিরে এলো। স্বরাজ জিজ্ঞেস করলে, "কি বলে শালা—এখনো তো দৌড়োদৌড়ি করছে।"

"আর করবেও"—অমল সঙ্গে সঙ্গে বললে, "ওর অফিসার নাকি ধারে-কাছে কোথায় আছে। সে যদি দেখে, ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে আর ওর রক্ষে থাকবে না।"

স্বরাজ বলে ওঠে, "তবে যে শুনি ওরা স্বাধীন জাত!"

"তার নমুনা তো চোখের ওপরই দেখতে পাচ্ছি। স্বাধীন যদি হতো, তাহলে কি আর ঘরবাড়ী ছেড়ে মরতে আসত এই সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে!"

ঘণ্টাখানেক পরে এক ফাঁকে অমল স্টেশনে গিয়ে হাজির হয়। এ. এস. এম-এর ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে সেই ড্যান হাত-পা ছুড়ে প্রচুর হাঁকডাক করছে। অমল অনন্তকে জিজ্ঞেস করলে, "ব্যাপার কি?"

অনন্ত বললে, "ব্যাপার গুরুতর। ওদের রেড-ক্রস ভ্যান আসবে বেলা চারটেয়। বেলা দুটোর মধ্যে ওর ঈস্ট ইয়ার্ডের পাঁচ নম্বর লাইন ক্লিয়ার চাই। ক্যাম্প থেকে মদ গিলে ফেরার সময়ে দেখেছে, লাইনটা ক্লিয়ার হয় নি—আর যাবি কোথায়!"

অমল বললে, "রেড-ক্রস ভ্যান! কেন, কারও অসুখ করেছে নাকি?"

"কারও মানে! ওদের সকলের। আর অসুখ! মারাত্মক অসুখ। এক সপ্তাহ হয়ে গেল, আর কি 'মোরেল' ঠিক থাকে! তাই মেজাজ খারাপ।"

অমল বললে, "ব্যাপারটা ঠিক বুঝলুম না। রেড-ক্রস ভ্যানের সঙ্গে মোরেল-এর সম্পর্কটা কোথায়?"

"এ রেড-ক্রস হলো আমেরিকান রেড-ক্রস! এই গাড়ীতে আছে একটি বগী—তার মাঝখানে একটা হল্ আর তার দু'পাশে দুটো বেডরুম। এর মধ্যে থাকেন দুটি আমেরিকান মেয়ে, তারা সপ্তাহে একবার ক'রে এইসব আমেরিকান ডিট্যাচমেন্টগুলোয় আসেন, এদের মোরেল তাজা রাখতে। প্রথমে ওই হলটায় হবে সিনেমা, তার মানে রাজ্যের যত ন্যাঙটা মেয়ের ছবি দেখাবে, তারপর সারারাত ধরে ওই মেয়ে দুটোকে নিয়ে সে যা কাণ্ড চলবে—সে না দেখলে তুমি ধারণাই করতে পারবে না। শালারা আছে বেশ—মদ, মেয়েমানুষ, চকোলেট আর চিউইং-গাম, এই নিয়ে যেন নেশার ঘোরে আছে!"

অমল বললে, "তা না হলে আর খামখা মরতেই বা আসবে কেন?"

ব্লক-ইনস্ট্রুমেন্টের ঘণ্টা বেজে উঠল। অনন্ত হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে চলে গেল। অমল ড্যানকে লক্ষ্য করতে থাকে। ড্যান তখন প্রচুর হাত-পা নেড়ে সান্টিং জমাদারকে বোঝাচ্ছে, "হম আমেরিকান—ইওর ফ্রেণ্ড—নট এ ফাকিং ব্রিটিশার—"

অমলের ভ্রূ কুঁচকে ওঠে—আমেরিকাও ভারতের বন্ধু?

সান্টিং জমাদার কাজ বুঝে চলে যায়। ড্যান হিপস পকেট থেকে মদের বোতল বার ক'রে ঢকঢক ক'রে খানিকটা গলায় ঢেলে দেয়—চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে একটা চকোলেট স্লাব চিবোতে শুরু করে। বাইরে থেকে আর একজন আমেরিকান এসে ড্যানের সঙ্গে কথা বলতে থাকে।

লাইন ক্লিয়ার দিয়ে অনন্ত বাইরে বেরিয়ে আসে, একটা ঠেলা দিয়ে অমলকে দেখায়, "ওই হলো লিউটিনান্ট মূর—ওই যে ড্যানের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।"—অমল দেখলে, ড্যান সেই একই ভাবে টেবিলের ওপর পা তুলে, চেয়ারে মাথাটা এলিয়ে, লেফটেন্যান্ট মূরের সঙ্গে কথা কইছে। অমল জিজ্ঞেস করলে, "ড্যানের র‍্যাংক কি?"

প্ল্যাটফরমে এসে অনন্ত বললে, "মামুলি একজন প্রাইভেট। ওরা অফিসারদের সঙ্গে এইরকম সহজভাবে কথা বলে, তা সে যত বড় অফিসারই হোক না কেন! তুমি জানো না অমল, কথায় কথায় আমরা অফিসারদের স্যালিউট করি বলে ওরা আমাদের কি ভীষণ ঠাট্টা করে।"

থ্রি থার্টি ডাউন ইন্ করতে আর মিনিট দশেক বাকী—লেফটেন্যান্ট প্যাস্কির ব্যাটম্যান একটা সুটকেশ এনে অনন্তকে বললে, "সাহেব এই গাড়ীতে লামডিং যাবে, সুটকেশটা গাড়ীতে তুলে দেবেন—"

অনন্ত খাঁখিয়ে উঠল, "আমার বয়ে গেছে—কেন সাহেব নিজের ছোট

সুটকেশটাও বইতে পারেন না নাকি? ভারী আমার নবাব-পুত্তুর রে!" অমলকে বললে, "জানো অমল, কিন্তু আমেরিকান অফিসারদের দেখবে, তারা তাদের নিজের মাল নিজেরাই বয়—"

গাড়ী ইন করলে, পয়েন্টসম্যানের হাতে লাইন-ক্লিয়ার দিয়ে অনন্ত ব'লে দিলে, "ড্রাইভারকে বলে দাও রাইট-টাইমে স্টার্ট করতে—" অমলকে বললে, "যাও না ভাই, গার্ডকেও একটু বলে দাও—না হলে শুধু শুধু লেট করবে, আর আমাকে দিতে হবে কৈফিয়ৎ। জানোই তো, মেজর ব্রাউনের সামনে একবার দাঁড়ালেই নিদেন পক্ষে তিন দিনের ট্রেড-পে—"

অমল ফিরে এসে দেখলে, লেফটেন্যাণ্ট প্যান্সি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, মুখখানা তার লাল টকটক করছে। অনন্ত লেফটেন্যাণ্ট প্যান্সির সেই সুটকেশটা হাতে ক'রে ফ্যাকাশে মুখে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে—সমস্ত ঘরটা যেন থমথম করছে। হঠাৎ ড্যান চিৎকার ক'রে উঠল, "হেই, লিভ দ্যাট ফাকিং লাগেজ দেয়ার—"

লেফটেন্যাণ্ট প্যান্সি বাজখাঁই গলায় হুকুম দিলেন, "লে আও—"

অনন্ত এক পা এগিয়েছে। ড্যান আবার চেঁচিয়ে উঠল, "হি ওণ্ট ক্যারি ইওর লাগেজ—ইউ ব্লাডি ব্রিটিশার্স, ইউ ওয়াণ্ট টু উইন দি ওয়ার এ্যাট দেয়ার কসট—এহ্।"

লেফটেন্যাণ্ট প্যান্সি হাতদুটো বারবার মুঠো করেছেন আর খুলছেন। অনন্ত ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে, তার হাতে সুটকেশটা দুলছে। ড্যান সামনে গজ গজ করছে আর মুচকে হাসছে। লেফটেন্যাণ্ট প্যান্সি নিজের শরীরের ওপর একটা ঝাঁকানি দিয়ে হাঁকলেন, "কাম অন এ. এস. এম—কুইক" ঝড়ের বেগে তিনি স্টেশন রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনন্তও টলতে টলতে সুটকেশটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ড্যান হিপস পকেট থেকে মদের বোতলটা টেবলের ওপর ঠুকে বসিয়ে হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠল।

খগেন লাইন থেকে ফিরেছে, কাঁচা পয়সা কিছু রোজগারও হয়েছে। পাঁচকড়ি আর অমলকে বললে, "চলো অমল, একটু ঘুরে আসা যাক—"

কোম্পানির ছেলেদের কাছে একমাত্র আকর্ষণের বস্তু ওই বাজারটি, অর্থাৎ খাবারের দোকানগুলো। ডিসিপ্লিনড খানা খেয়ে খেয়ে যখন ছেলেরা প্রায়

ক্ষেপে ওঠে, তখন চলে যায় ওই বাজারটিতে। কোন একটি শুভদিনে সারা মাসের হাত খরচের টাকাটি ওই খাবারের দোকানগুলোতে উজাড় ক'রে দিয়ে, আফশোষ করতে করতে ফিরে আসে।

পাঁচকড়ি বললে, "চলো তবে স্টেশনটা একটু ঘুরে যাই—থ্রি-থার্টি ডাউন আসবার সময় হয়েছে—"

অমলের বুকের মধ্যেটা ছ্যাৎ ক'রে ওঠে। অনন্তর সেই অপমানের দৃশ্য তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে। বললে, "স্টেশনে আবার কি হবে?"

"তেমন কিছু নয়। একটু ঘুরেফিরে বেড়ানো আর কি। তবুও দু-দশটা অচেনা মুখ দেখতে পাওয়া যাবে।"

ক্যাম্প ছেড়ে পথে বেরিয়ে খগেন বললে, "আচ্ছা অমল, এই আমেরিকানদের তোমার কেমন লাগে?"

অমল বললে, "কেন, মন্দ কি!"

খগেন বলে উঠল, "ওরা কি বলে জানো? ইণ্ডিয়ানস আর বেগারস! দুর্ভিক্ষের সময় এসে হাজির হয়েছে কিনা, তাই দেশসুদ্ধ মানুষকে ভিক্ষে করতেই দেখেছে। ওরা যেন আমাদের বড্ড বেশী করুণার চোখে দেখে।"

পাঁচকড়ি বললে, "কিন্তু ব্রিটিশদের যা ঘৃণা করে কি বলব! একটা ব্রিটিশ দেখলেই যেন ক্ষেপে ওঠে।"

অমল বললে, "তাতে আর আমাদের লাভটা কি?"

স্টেশন-রুমে এসে ঢুকতেই আমেরিকান ইয়ার্ড মাস্টার হেস্টিংস অভ্যর্থনা জানালে, "হেই জো, কাম অন্, লেটস হ্যাভ সাম বীয়ার—" হেস্টিংসের টেবিলের ওপর ডজনখানেক বীয়ার-ক্যান সাজানো। তার থেকে একটা তুলে নিয়ে খগেনকে বললে, "দিস—ফ্রম আওয়ার স্টেটস—"

খগেন বললে, "আই ডোণ্ট ড্রিঙ্ক—"

হেস্টিংস তো হেসে লুটোপুটি খাওয়ার দাখিল! কিছুক্ষণ পরে চোখ কপালে তুলে বললে, "ওঃ যীশাস ক্রাইস্ট অলমাইটি! দিস ইজ নো ব্লাডি ওয়াইন—দিস ইজ বীয়ার জো!"

খগেন আবার জানালে, সে বীয়ারও খায় না! হেস্টিংস খগেনের হাতটা ধরে টেনে টেবিলের ধারে নিয়ে গিয়ে, তার চোখের সামনে একটা বীয়ার-ক্যান ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, "দিস ইজ নো ফাকিং ইংলিশ বীয়ার মাই বয়, দিস ইজ আমেরিকান বীয়ার—ফ্রম আওয়ার স্টেটস!"

পাঁচকড়ি বলে উঠল, "তবে আর কি, ওর তুল্য জিনিস আর ভূ-ভারতে

নেই। শালারা আমেরিকান আমেরিকান ক'রেই মলো।"

সুনীল ছিল ডিউটিতে, বললে, "আরে খেয়ে ফেল, নাহলে আমাদের অসভ্য মনে করবে। আর ওই একটা ক্যানে নেশা হবে না।"

হেস্টিংস পকেট থেকে একটা জ্যাক-নাইফ বার ক'রে, প্রতিটি টিনে দুটো ফুটো ক'রে এক একজনের হাতে দিতে লাগল। এদিক ওদিক চেয়ে, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওরা খানিকটা ক'রে খেয়ে টিনগুলো বাইরে ফেলে দিলে। হেস্টিংস একটার পর একটা গলায় ঢালতে লাগল। গোটা ছয়েক শেষ করার পর জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে বললে, "হাউ ডু ইউ লাইক ?"

ওরা ঘাড় নেড়ে কাষ্ঠ-তারিফ জানালে। হেস্টিংস মহাখুশি, সে বার তিনেক আমেরিকান বীয়ারের মহিমা কীর্তন ক'রে বললে, "হাউ ডু ইউ লাইক দি ইয়াংকস ?"

পাঁচকড়ি বলে ওঠে, "কি বাবা, এখন থেকেই পটাতে শুরু করেছ—ব্রিটিশকে সরিয়ে মসনদে বসবার তালে আছ নাকি !"

হেস্টিংস বললে "সিওরলি—উই ওয়াণ্ট টু বি ফ্রেণ্ডস—"

অমল খগেনের হাতে একটা টান দিয়ে বললে, "চলো, আর কেন ?" খগেন পাঁচকড়িকে ডাকে। পাঁচকড়ি আপন মনে গজ গজ করতে থাকে, "ফ্রেণ্ড তো সব শালাই !"

হেস্টিংস খগেনকে ধরে ফেলে বললে, "হোয়ার আর ইউ গোয়িং জো ?"

খগেন বললে, "বাজার—উই কেম ফর মার্কেটিং—"

হেস্টিংস হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ওদের তিনজনকে জড়িয়ে ধরে চলতে চলতে বললে, "লেটস গো এ্যাণ্ড ইট সামথিং—"

খগেন বলে ওঠে, "মাতালের পাল্লায় পড়ে ভ্যালা বিপদ হলো দেখছি !"

স্টেশন থেকে বেরিয়ে, মেইন ইয়ার্ড পার হয়ে ওরা চারজনে বাজারে ঢুকল। চলতে চলতে হেস্টিংস বললে, "আই ডোণ্ট লাইক দিস প্লেস—উই কাণ্ট গেট গ্যালস হিয়ার—"

খগেন চাপা গলায় বললে, "তা তো লাইক করবে না, আর কোলকাতায় শালারা কি কাণ্ডটাই না ক'রে বেড়াচ্ছে ! দুর্ভিক্ষের ঠেলায় মানুষ মরছে না খেয়ে, আর এ শালারা মেয়েদের নিয়ে মজা লুটছে !"

পাঁচকড়ি হেস্টিংসকে বললে, "হোয়াট এ্যাবাউট ইওর স্টেটস ?"

"ইয়াঃ, এনাফ ইন আওয়ার স্টেটস। ইনভাইট এ গ্যাল ফর ড্রিংক, টেক হার টু সিনেমা অর ডান্স—সি ওণ্ট মাইণ্ড—"

খগেন আঁতকে ওঠে, "আরেঃ বাপস, বলে কি হে! এ শালারা কি এখনও বর্বরযুগে বাস করে নাকি?"

পাঁচকড়ি বললে, "আমার তো তাই মনে হয়। সেদিন হ্যারি তার বৌয়ের ফটো দেখাচ্ছিল। আমার তো মাইরি আক্কেল গুড়ুম!"

খগেন বললে, "কেন, কি রকম ফটো?"

"একেবারে উলঙ্গ হয়ে নানান ভঙ্গিতে প্রায় দশ বারোখানা ফটো—প্যারিস পিকচারও তার কাছে হার মেনে যাবে—"

অমল হেস্টিংসকে জিজ্ঞেস করলে, "দেন হোয়াই হ্যাভ ইউ কাম হিয়ার লিভিং সাচ এ হ্যাপ্পি লাইফ?"

হেস্টিংস অসহায়ের ভঙ্গিতে কাঁধ কুঁচকে বললে, "হোয়াট ক্যান উই ডু—উই আর টু সেভ ইণ্ডিয়া ফ্রম দি জ্যাপস—"

পাঁচকড়ি বলে ওঠে, "ওঃ, মার চেয়ে দেখছি মাসির দরদ বেশি!"

চীনা রেস্তোরাঁটার সামনে এসে হেস্টিংস বললে, "লেট হ্যাভ চাইনীজ ডিশেস—" কয়েক ধাপ সে এগিয়ে গেল। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল—ওদের চোখ রেস্তোরাঁর দেয়ালে একটি বোর্ডের ওপর আটকে গেছে। হেস্টিংস রেস্তোরাঁর রোয়াকে উঠে পেছন ফিরে ডাকলে, "হেই জো, কাম অন"—

খগেন বললে, "নো হেস্টিংস, উই ওন্ট—"

দৌড়ে রাস্তায় নেমে এসে খগেনের একটা হাত ধরে হেঁচকা মেরে হেস্টিংস বললে, "হোয়াই! হোয়াটস দি ম্যাট্টার—?"

খগেনের কান পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠেছে, লজ্জায় আর অপমানে তার চোখে জল এসে গেছে, মুখখানা থমথম করছে। নীরবে সে বোর্ডখানার দিকে আঙুল তুলে ধরল। হেস্টিংস জোরে জোরে পড়তে থাকে, "ফর ব্রিটিশ ট্রুপস ওনলি—আউট অফ বাউণ্ডস ফর ইণ্ডিয়ান ট্রুপস।"

হেস্টিংসের বিশাল দেহখানা মুহূর্তে কুঁকড়ে ওঠে। হাত দুটোকে মুঠো ক'রে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে ওঠে, "ফর ব্রিটিশ ট্রুপস ওনলি! হোয়াট এ্যাবাউট দি এ্যামেরিকানস, আই উইল কিক দি ব্লাডি ব্রিটিশারস আউট অফ ইণ্ডিয়া—" হিংস্র একটা পশুর মতো সিঁড়ি দিয়ে উঠে বোর্ডখানা এক হেঁচকায় খুলে নিয়ে, পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

খগেন বললে, "চলো হে দেখি, হেস্টিংসটা না জানি কি ক'রে বসে!"

অমল গমনোদ্যত খগেনের হাতটা খপ ক'রে চেপে ধরে বললে, "ওদের লড়াইয়ের মাঝখানে তোমার আমার কোন স্থান নেই খগেন। এ লড়াই হলো

দুই বীরপুরুষের লড়াই—আমরা হলাম তাদের বাজি—”

খগেন আর পাঁচকড়ি অমলের থমথমে মুখখানার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। অমল আবার বললে, “চলো আমরা ফিরে যাই—”

ঝনঝন ক'রে একটা শব্দ ভেসে আসে রেস্তোরাঁর মধ্যে থেকে। পাঁচকড়ি বললে, “কিন্তু এক সঙ্গে এসে হেস্টিংসকে এ রকম একটা বিপদের মুখে ফেলে রেখে, আমরা পালিয়ে যাব ?”

রেস্তোরাঁর মধ্যে তখন চলেছে হুড়োহুড়ি, খটাখট, দুমদাম শব্দ। অমল বললে, “পালিয়ে তো আমরা যাচ্ছি না—আমরা যাচ্ছি আমাদের রাস্তায়। আমেরিকানরা ব্রিটিশদের ঘৃণা করে বলেই আমাদের বন্ধু হতে পারে না।”

রেস্তোরাঁর ভেতর থেকে ভেসে আসে কয়েকটা টুকরো আর্তনাদ—খানিকটা ধ্বস্তাধ্বস্তি আর টেবল চেয়ার ভাঙার মড়মড় শব্দ। অমল বললে, “এখনও কি হেস্টিংসকে সাহায্য করার কথা ভাবছ নাকি খগেন ?”

খগেন পাঁচকড়ির দিকে চেয়ে অসহায়ভাবে কাঁধ কোঁচকায়।

রাত তখন বোধহয় এগারোটা, মেইন স্টেশন থেকে সাদেক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে অমলকে ঘুম ভাঙিয়ে ঠেলে তুললে। ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ে অমল বললে, “কি হয়েছে সাদেক ?”

সাদেক বললে, “এক্ষুণি আপনি স্টেশনে চলুন—অনন্তবাবু ডাকছেন।”

“কেন ?”

“সমস্ত ব্যাপার আমি জানি না। তবে আমেরিকানদের সঙ্গে কি একটা গোলমাল হয়েছে। অনন্তবাবু ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন—”

আমেরিকানদের সঙ্গে গোলমাল! অমল ভেবেই ঠিক করতে পারে না, ব্যাপারটা কি। কিন্তু ব্যাপারটা যে সাধারণ নয়, সেটা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। রাত এগারোটার সময় কোন অফ-ডিউটি লোকের ক্যাম্পের বাইরে যাওয়া যে কতখানি বিপজ্জনক, একথা নিশ্চয়ই অনন্তর মনে আছে। তবুও অনন্ত ডেকে পাঠিয়েছে! সাদেককে বললে, “এক কাজ কর সাদেক—খগেন, পাঁচকড়ি, স্বরাজ, সন্তোষ আর সুনীলকেও ডাক। তাদের বলো, কোন হৈ চৈ না ক'রে একজন একজন ক'রে যেন ওরা এক্ষুণি স্টেশনে যায়। আমি এখনি চলে যাচ্ছি—”

তাঁবু থেকে বেরিয়ে কয়েক পা যেতেই নাইট-পিকেটের সঙ্গে মুখোমুখি।

অমলের মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে দেখে, মুচকে হেসে বললে, "আপনি !"

"হ্যাঁ ভাই ! ভয় নেই, কোন খারাপ মতলবে যাচ্ছি না। আমেরিকানদের সঙ্গে কি একটা গোলমাল হয়েছে—অনন্ত ডেকে পাঠিয়েছে—"

"কিন্তু অমলবাবু—"

"উপায় নেই ভাই—ধরা যদি পড়ি, শাস্তি পাব। এসব জেনেশুনেও যখন অনন্ত ডেকে পাঠিয়েছে, তখন যাওয়াই উচিত। তুমি কি বলো ?"

নাইট পিকেট বললে, "নিশ্চয়ই—বিশেষ ক'রে যখন আমেরিকানদের সঙ্গে গোলমাল। ফিরে এসে কিন্তু আমায় সমস্ত ব্যাপারটা বলবেন।"

স্টেশন রুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই, অনন্ত ধড়মড় ক'রে উঠে এলো। অমলের একটা হাত ধরে টানতে টানতে প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়াল। হাত-পা তার থরথর ক'রে কাঁপছে। অমল তার একটা কাঁধ চেপে ধরে বললে, "কি হয়েছে অনন্ত ?"

কথা বলতে গিয়ে অনন্ত-র গলা কেমন যেন বুজে যায়—বারকয়েক ঢোক গিলে বললে, "আমেরিকানরা মতলব করেছে, আসাম মেল থেকে মেয়ে নামিয়ে নেবে—"

অমল আঁতকে ওঠে, "কি !"

"হ্যাঁ অমল, ট্রেন যেই ছাড়বে, অমনি ওদের মধ্যে থেকে একজন লেডিজ কম্পার্টমেণ্ট থেকে একটি মেয়ে জোর করে নামিয়ে নেবে।"

অনন্ত-র একটা হাত অমল প্রাণপণে চেপে ধরে—শরীরটা তার থরথর ক'রে কাঁপছে। হঠাৎ সে চিৎকার ক'রে ওঠে, "তোমার সামনে যখন ওরা এইসব মতলব করছিল, তখন ওদের গলা টিপে ধরতে পারলে না ?" অস্বস্তিতে সে ছটফট করতে থাকে, বারবার পেছন দিকে ফিরে ফিরে চায়, "আঃ, এখনো ওরা আসছে না কেন !" আবার অনন্তকে জিজ্ঞেস করলে, "ট্রেনটা আসতে আর কত দেরী ?"

"তা এখনও আধঘণ্টা—"

অমল যেন বিরক্ত হয়ে ওঠে, "তা তুমি কেবল আমাকে ডেকে পাঠালে কেন ? আর ব্যাপারটাই বা সাদেকের কাছে বলে দাও নি কেন ? তাহলে ক্যাম্পসুদ্ধ ছেলেকে জাগিয়ে তুলে আনতুম—"

অনন্ত আমতা আমতা ক'রে বললে, "ওরা যখন আমারই সামনে বসে এই সমস্ত মতলব করছিল, তখন আমি এত ঘাবড়ে গিয়েছিলুম যে, কি যে করব কিছুই ঠিক করতে না পেরে, শেষ তোমায় ডেকে পাঠালুম।"

"লাইন ক্লিয়ার দিয়েছ নাকি ?"

"না, এখনো দিই নি—"

"বেশ, আমরা তৈরি হয়ে খবর না দেওয়া পর্যন্ত কিছুতেই লাইন ক্লিয়ার দিয়ো না—" দূরে তিন চারজনকে দেখা গেল কথা কইতে কইতে আসছে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে অমল বললে, "যাক, ওরা এসে পড়েছে—এবার তুমি লাইন ক্লিয়ার দিতে পার !"

অনন্ত চলে গেল স্টেশন রুমে। খগেন, পাঁচকড়ি, স্বরাজ, সাদেক, সুনীল সকলেই ওরা এসে পড়েছে। পাঁচকড়ি ছুটে এসে অমলকে জিজ্ঞেস করলে, "কি হয়েছে অমল ?"

অমল বললে, "চলো, আমরা ওয়াটার-কলামের আড়ালে গিয়ে কথা কই।" সকলে নীরবে অমলের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। সোয়ান-নেক-এর তলায় সিণ্ডারের গাদার ওপর বসে অমল বললে, "খুব মাথা ঠাণ্ডা ক'রে শুনবে, আর এখনি একটা ব্যবস্থা করতে হবে।"

একে একে অমল আমেরিকানদের মতলবের কথা বললে, যা সে অনন্ত-র কাছ থেকে শুনেছে। শুনতে শুনতে পাঁচকড়ি ছিটকে লাফিয়ে উঠল, "শালাদের আজ জানে মেরে দেব—মনে করেছে কি শালারা—এটা কি ওদের স্টেটস নাকি !"

সুনীল বললে, "এই শুনেই এত লাফালাফি করছিস ! আর সেদিন এই আমেরিকানরা ফারকাটিঙে কি করেছে জানিস ? ভর-দুপুরে গোটাতিনেক আমেরিকান একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে—বাড়ীর মেয়েদের ধরে টানাটানি করতে শুরু করে—ভয় পেয়ে মেয়েরা চেঁচিয়ে ওঠে। মেয়েদের চিৎকার শুনে আশপাশের লোক যখন জমা হয়ে যায়, তখন ওরা র‍্যাণ্ডাম ফায়ার করতে করতে পালিয়ে যায়। সেই গুলিতে তিনটি লোক মারা গেছে।"

স্বরাজ বললে, "এ রকম তো ওরা হামেশাই ক'রে বেড়াচ্ছে। কে যেন বলছিল, ওদের জ্বালায় কোলকাতায় মেয়েরা রাস্তায় বেরুতে পারে না।"

খগেন বললে, "অথচ, শালাদের মুখে তো সব সময়ে ফ্রেণ্ডশিপের বুলি !"

সাদেক বলে উঠল, "এর একটা বিহিত করতেই হবে অমলবাবু। আমাদের নাকের ডগায় মেয়েদের এমনভাবে বেইজ্জৎ করবে, এ কিছুতেই বরদাস্ত করব না।"

সুনীল বললে, "বরদাস্ত তো তুমি করবে না ! কিন্তু ওরা তো রিভলভারের ডগায় যা খুশি তাই করছে। তুমি বাধা দিতে গেলে, তোমার কপালে হয় মৃত্যু, না হয় কোয়ার্টার গার্ড।"

পাঁচকড়ি তেড়ে ওঠে, "আর ভয় দেখাস নি সুনীল—ভয়ে ভয়ে তো আধমরা

হয়েই আছি। তা বলে এমন একটা কাণ্ড হাত-পা গুটিয়ে চোখের ওপর দেখব কেমন করে! আমরা মানুষ, না জানোয়ার?" অব্যক্ত যন্ত্রণায় যেন সে ছটফট ক'রে ওঠে, "না না অমল, এ আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না। মরতে যদি হয়, ওদের একটাকে নিয়ে মরব—"

সাদেক বললে, "আলবাৎ—মরতে যদি হয় মরদের মতো মরব।"

অমল বললে, তাহলে ঈস্ট ইয়ার্ড আর ওয়েস্ট ইয়ার্ডের স্টাফদের খবর দিয়ে এখনি জড় করতে হবে। আর লাঠি, ডাণ্ডা, রড, যা পাওয়া যায়, সবই হাতের কাছে মজুত রাখতে হবে।"

পাঁচকড়ি লাফিয়ে ওঠে, "আজ যা থাকে কপালে—ওই শালা আমেরিকানদের একদিন, কি আমাদের একদিন।"

সুনীল অমলকে বললে, "তাহলে তোমরা মারপিট করবে? ভালো ক'রে একটু ভেবে দেখ অমল।"

পাঁচকড়ি সুনীলকে খেঁকিয়ে উঠল, "মারপিট করব না তো কি ওদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে ল্যাজ নাড়ব?"

অমল সাদেককে বললে, "তুমি অনন্তকে ডেকে নিয়ে এস তো সাদেক—"

সাদেক চলে গেল স্টেশনরুমে। খগেন আর পাঁচকড়ি গেল ঈস্ট ইয়ার্ড আর ওয়েস্ট ইয়ার্ডে। সুনীল অমলকে আবার বললে, "ভালো ক'রে একটু ভেবে দেখ অমল, ব্যাপারটা কিন্তু খুব সিরিয়াস হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

স্বরাজ সুনীলকে বললে, "আর আমেরিকানরা যে কাণ্ডটা করতে চলেছে—সেটা কি খুব মামুলি মনে হচ্ছে?"

সুনীল বললে, "আহা আমি কি তাই বলছি নাকি! আমি বলছি, একটু সাবধান হয়ে নিজেদের সামলিয়ে কাজটা হাসিল করা যায় না?"

অমল বললে, "এইভাবে সাবধান হয়ে হয়ে আর নিজেদের সামলিয়ে চলে চলে—আজ আমাদের এই হাল হয়েছে সুনীল। আজ আমরা মিলিটারীতে ঢুকতে বাধ্য হয়েছি। আর কি কাজটা করছি? একেবারে ভাড়াটে গুণ্ডার কাজ! দু'মুঠো ভাত ছড়িয়ে দিয়ে এরা আমাদের দিয়ে শহরে চালের চোরাকারবারীদের পাহারা দিয়েছে—আর লাখে লাখে মানুষ না খেতে পেয়ে মরে গেছে। এর পরও কি মনে কর, ধরি মাছ না ছুঁই পানি ক'রে তুমি শান্তিতে জীবন কাটিয়ে যেতে পারবে?"

অনন্ত এসে দাঁড়াতেই অমল ঝট ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, "লাইন ক্লিয়ার দিয়েছ?"

"হ্যাঁ—আউট রিপোর্টও পেয়েছি।"

ঈস্ট ইয়ার্ড, ওয়েস্ট ইয়ার্ড থেকে প্রায় সকলেই এসে পড়েছে। অমল বললে, "দেখ, ওদের শাস্তি দেওয়ার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই—আমরা পরাধীন জাত। আমরা কেবল বাধা দেব—আমাদের চোখের ওপর একটি মেয়েকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে কিছুতেই দেব না।"

থ্রি আপ আসাম মেলের হেড লাইট দেখা দিয়েছে—ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে ছুটে আসছে। পাঁচকড়ি অমলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে, "ঘাবড়াবার কিছু নেই অমল, আমরা প্রায় কুড়ি জন আছি।" হেড লাইটের ধ্বকধ্বকে আলোটার ওপর চোখ রেখে অমল পাঁচকড়ির একটা হাত শক্ত ক'রে চেপে ধরল।

দেখতে দেখতে ট্রেনটা এসে পড়ল—ঢুকে পড়ল স্টেশনে—থেমে পড়ল প্ল্যাটফরমে। ওরা ছোট ছোট দলে লাঠি ডাণ্ডা নিয়ে লেডিজ কম্পার্টমেণ্টের দরজায় দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল। অমল সবকটা দলের কানে কানে ফিসফিস ক'রে বলে গেল, "খবরদার, মাথা গরম করো না।"

আর. এম. এস. থেকে মেল-ব্যাগ নামিয়ে প্ল্যাটফরমের ওপর স্তূপাকার ক'রে ফেললে, ডাইনিং কার কেটে সাইডিং লাইনে প্রেস করলে প্যাসেঞ্জার কিছু নামল, কয়েকজন উঠলও—তাদের প্রায় সকলেই মিলিটারী অফিসার আর জন কয়েক বোধহয় সিভিলিয়ান কনট্রাক্টর। ট্রেন আসার গোলমাল ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে—লোক চলাচল থেমে গেছে—স্টেশনটা আবার খাঁ খাঁ করছে। ঢাকনি ঢাকা আলোর তলায় টুকরো টুকরো অন্ধকারগুলো যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। কেবল জেগে আছে পাঁচকড়ি—লেডিজ কম্পার্টমেণ্টের দরজায় সজাগ প্রহরী—আর জেগে আছে সাদেক, লোহার রডটা ঠুকে ঠুকে পায়চারি করছে—আর জেগে আছে ছোট ছোট দলে বাকী ছেলেরা, উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে মোকাবিলা করার জন্যে।

সময় যেন আর কাটে না! আধো-আলো আধো-অন্ধকারে ট্রেনের যাত্রীরা ঝিমিয়ে পড়ছে। অস্থির ভাবে অমল সমস্ত প্ল্যাটফরমটা পায়চারি করছে। বারকয়েক স্টেশন-রুমের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে এসেছে। দেখেছে, জন-তিনেক আমেরিকান চেয়ারে, টেবিলে বসে হৈ-হল্লা করছে—মদ গিলছে—চিউয়িং গাম চিবোচ্ছে! অমল ভেবে থৈ পায় নি, এমন একটা বর্বর অভিসন্ধি ক'রে মানুষগুলো এমন নির্বিকার আছে কেমন করে? তবে কি এমন কাজ করা তাদের কাছে নিতান্ত মামুলি একটা ব্যাপার!

আর বোধহয় মিনিট তিনেক বাকী। হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে অনন্ত বললে, "ওরা ঠিক করেছে, ট্রেন স্টার্ট করলেই হ্যারি ঢুকে পড়বে কম্পার্টমেন্টের মধ্যে, ড্যান আর ওয়াকার থাকবে ফুটবোর্ডের ওপর। স্টার্টার পার হলেই হ্যারি একজনকে নামিয়ে দেবে—তারপর তিনজনেই লেভেল ক্রসিঙের কাছে নেমে পড়বে। কালও নাকি গাড়ীতে উঠেছিল, কিন্তু তেমন সুবিধে করতে পারে নি—"

হন্তদন্ত হয়ে অনন্ত আবার স্টেশন-রুমে চলে গেল। অমল সবকটা দলের কাছে সমস্ত কথা ঘুরে ঘুরে বলে এলো। স্টেশন-রুমের সামনা সামনি এসেই দেখে, স্টার্টার ডাউন হয়েছে—সবুজ আলো মিটমিট করছে। আর যেন অমলের পা চলে না!

ড্রাইভার হুইসিল দিয়েছে—ব্রেকভ্যান থেকে গার্ড সবুজ বাতি নাড়ছে। হোঃ হোঃ ক'রে হাসতে হাসতে ড্যান, হ্যারি আর ওয়াকার বেরিয়ে এলো।

পাঁচকড়ি দাঁতে দাঁত চেপে ডাকলে, "সাদেক—"

"ঠিক আছি পাঁচকড়িবাবু—"

হ্যারি আসছে সকলের আগে আগে, প্রত্যেকটা কামরায় টর্চ ফেলে দেখতে দেখতে। একটার পর একটা কামরা ছেড়ে ওরা এগিয়ে চলেছে। ড্রাইভার হুইসিল দিয়ে স্টিম খুলে দিয়েছে, ভস—ভস—ভস—গাড়ীটা যেন নড়ে উঠল—একটুখানি যেন গড়িয়েও গেল—ব্রেক চেপে ধরা কোন একটা চাকা থেকে ক্যাঁ—ক্যাঁ ক'রে শব্দ হতেই থাকল।

পাঁচকড়ির চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠছে, ভেসে উঠছে আগস্ট আন্দোলনের দিনে, সেদিনকার সেই নিশুতি রাতে জ্বলন্ত মশালের সেই আলো! সেদিনও সে-ই ছিল সেন্ট্রি—আর আজ? পাঁচকড়ি নড়ে উঠল, টলে উঠল, সমস্ত শরীরটা তার থরথর ক'রে কেঁপে উঠল—সেদিনকারই মতো তার বুকের মধ্যে থেকে আর্ত এক আর্তনাদ ঠেলে বেরিয়ে এলো, "হল্ট—"

থতমত খেশে হ্যারি একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাদেক, স্বরাজ, খগেন, ওরা সকলে গিয়ে ড্যান আর ওয়াকারকে ঘেরাও ক'রে ফেললে। এ্যাডভান্স স্টার্টার পার হয়ে ইঞ্জিন থেকে আবার হুইসিল দিয়েছে। ব্রেকভ্যান থেকে গার্ড শাদা আলো দেখিয়ে 'অল রাইট' সিগন্যাল দিচ্ছে—হুস হুস ক'রে গাড়ীটা বেরিয়ে যাচ্ছে। গভীর স্বস্তির এক নিঃশ্বাস অমলের বুকখানা খালি ক'রে বেরিয়ে এলো।

ধীরে ধীরে অমল ভিড়টার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওরা সকলে মিলে ড্যান, হ্যারি আর ওয়াকারকে ঘিরে ধরেছে। পাঁচকড়ি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, "দিস ইজ নট ইওর স্টেটস—দিস ইজ আওয়ার ইণ্ডিয়া—" ভিড়ের বাইরেই

অমল দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখছে, সাড়ে ছ'ফুট লম্বা দৈত্যের মতো তিনটে আমিরিকান ফ্যাকাশে মুখে রোগা-শুঁটকো পাঁচকড়ির তম্বিগম্বি নীরবে হজম করছে !

হঠাৎ সাদেক হ্যারির একটা হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল, "বোলো ফিন কভি এইসা করেগা ?"

বিস্মিত অমল দেখলে, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সুসভ্য আমেরিকার ডেমোক্রাট সৈনিক হ্যারি অপরাধীর মতো মাথা নেড়ে জানাচ্ছে, "না।"

অমল পাঁচকড়ির কাঁধে হাত রেখে বললে, "চলো পাঁচকড়ি, এবার আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাই—"

চোদ্দ

স্টালিনগ্রাদের 'গেল-গেল' অবস্থা।

কোম্পানির ছেলেদের মধ্যে নতুন ক'রে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে—তাদের ভাগ্যে আবার না জানি কী ঘটতে চলেছে ! খবরের জন্যে উৎসুক হয়ে মেজর ব্রাউনের উদারতায় পাওয়া স্টেটসম্যানের আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলে—রেডিও-র খবরের প্রতিটি কথা তারা যেন গিলতে থাকে। কিন্তু স্টেটসম্যান বা রেডিও-র খবর তাদের মনে কোন আশা জাগায় না।

তবুও আশা মরে না ! রাশিয়ার ওপর তাদের বড় ভরসা—মস্কো, লেনিনগ্রাদ যারা অমনভাবে রক্ষে করতে পারে, স্টালিনগ্রাদ কি আর তারা সামলাতে পারবে না ! স্টেশনে-বাজারে যে কোন সিভিলিয়ানকে দেখতে পেলে, তারই কাছে খবর জিজ্ঞেস করে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শোনে স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধের খবর। সে যেন এক রূপকথা—তার ইটকাঠ, পথঘাট, ধুলো-কাঁকরটাও বুঝি রুখে দাঁড়িয়েছে জার্মানদের বিরুদ্ধে ! রাস্তায় রাস্তায় অলি-গলিতে চলেছে হাতাতাতি লড়াই ! যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে শহরের প্রতিটি বাড়ীতে বাড়ীতে, প্রত্যেকটি বাড়ীর তলায় তলায়।

এদিকে আবার জাপানও যেন আসাম-বর্মা সীমান্তে নড়ে-চড়ে উঠছে—প্যালেল দখল ক'রে ধীরে ধীরে চীনদুইন নদীর ধারে এগিয়ে আসছে। এতদিন যুদ্ধ ছিল দূরে দূরে, তাই মনে ছিল ভয়। আর এখন যুদ্ধ এসে পড়ছে একেবারে

ঘাড়ের ওপর, তাই মনে জাগে আতঙ্ক। স্টালিনগ্রাদের যদি পতন হয় আর জাপান যদি এগিয়ে আসে—তাহলে ভারতবর্ষের বুকের ওপর দুদিক থেকে এসে পড়বে যুদ্ধ!

সন্ধ্যে বেলায় ক্যানটিনে গিয়ে ভিড় ক'রে ছেলেরা রেডিও-র খবর শোনে। তারপর গুটিগুটি বেরিয়ে যায় প্যারেড গ্রাউণ্ডের দিকে—অন্ধকার জায়গা দেখে গোল হয়ে বসে। অন্ধকারে বসে থাকতেই যেন তাদের ভালো লাগে!

গভীর উদ্বেগে দিনের পর দিন কেটে যায়। সন্ধ্যে উতরোলেই রাতের খানা খেয়ে ব্যারাকে ফিরে আসে। জীবন যেন তাদের নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে! ধীরে ধীরে একজন একজন ক'রে অমলের সিটটায় এসে বসে—নীরবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে গুম হয়ে থাকে—ভাবনার তাদের অন্ত নেই! নীরব স্তব্ধ ছেলেদের মধ্যে থেকে অনন্ত হঠাৎ ফুঁসে ওঠে, "আমাদের ওপর এত জুলুম কেন? আমাদের কি দায় পড়েছিল, রাজায় রাজায় এই যুদ্ধের মধ্যে উলুখড়ের মতো প্রাণ দেওয়ার?"

শিবেন বললে, "আর কেন, পেটের দায়ে।"

খগেন তেড়ে উঠল, "তাহলে যুদ্ধ না লাগিয়ে লঙ্গরখানা খুললেই তো পারত!"

সুনীল বললে, "শুধু তাই নয়। এ যুদ্ধ না বাঁধলে কি আর স্বাধীনতার কথা ভাবতে পারতাম!"

পাচকড়ি বললে, "না ভাই সুনীল, ও স্বপ্ন ভেঙে গেছে। জাপান আর জার্মানি এসে যে আমাদের স্বাধীন ক'রে দেবে, এ কথা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

সুনীল বললে, "কেন?"

"কেন? সেদিনকার রাতের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলে। ওই আমেরিকানরা ওরাও তো বলে আমাদের রক্ষে করার জন্যে ভারতবর্ষে এসেছে। ভারতবাসীকে ওরাও বন্ধু মনে করে। কিন্তু তার নমুনা তো সেদিন স্বচক্ষে দেখলে?"

শিবেন বললে, "কিন্তু এরা যে ব্রিটিশেরই দলে—ও-রকম তো হবেই।"

অমল এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। টপ ক'রে মাঝখান থেকে বললে, "কিন্তু এই আমেরিকানরাও ব্রিটিশদের ঘৃণা করে—"

পাচকড়ি বলে উঠল, "সব শালাই সমান—কেবল ফুসলোবার তাল।"

অমল বললে, "না পাঁচকড়ি, সকলেই সমান নয়। রাশিয়া তো নিজের দেশ ছেড়ে পরের দেশে মাতব্বরী করতে যায় নি! কোন দেশকে রক্ষে করতে

গিয়ে সে দেশের মেয়েদের ধরে টানাটানি করে নি !"

অনন্ত অমলের কথার জের টেনে বললে, "আর নিজের দেশের জন্যে কি লড়াইটাই না তারা লড়ছে !"

সুনীল বললে, "তাতে আর চিঁড়ে ভিজবে না—এবার দেশ আর রক্ষে করতে হবে না—"

অমল বললে, "কিন্তু আমার মন চাইছে—রাশিয়ার জয় হোক—"

সুনীল মোচড় দিয়ে বললে, "বল কি হে ! তুমিও যে দেখছি রাশিয়ার ভক্ত হয়ে গেলে ?"

অমল বললে, "তা আমি হয়েছি সুনীল, সত্যিই আমি রাশিয়ার ভক্ত হয়ে উঠেছি। কেন, তাও আমি বলছি। প্রথমত দেখ, হিটলারের অনুচর ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ থেকে বেরিয়েছে, কিন্তু রাশিয়া থেকে বেরোয় নি। সমস্ত ইউরোপের শক্তি নিয়ে হিটলার রাশিয়াকে আক্রমণ করেছে—রাশিয়া একা সেই আক্রমণ ঠেকিয়েছে। আমি অবাক হয়ে ভাবি, রাশিয়ার মানুষ এত শক্তি পেলে কোথা থেকে ? যুদ্ধের গোড়ায় গোড়ায় লোকে বলেছে, রাশিয়া তো চাষার দেশ, দশ দিনেই হিটলার সমস্ত রাশিয়া দখল করে নেবে। আমিও তখন ভাবতুম, যে-হিটলারের সামনে ফ্রান্সই দাঁড়াতে পারল না, রাশিয়া তো সেখানে এক ফুঁয়ের খদ্দের। সত্যি বলছি, আমার কেমন যেন অবাক লাগে, রাশিয়ানরা স্টালিনগ্রাদে এমন যুদ্ধ করছে কি ক'রে ! দেশকে তারা এত ভালোবাসতে শিখল কেমন ক'রে !"

অনন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "আর আমরা মনের সুখে খুশি হয়ে বসে আছি, জাপান এসে আমাদের স্বাধীন ক'রে দেবে।"

সকলেই কেমন যেন গুম মেরে গেছে, চুপ ক'রে মাথা ঝুঁকিয়ে আছে। স্বরাজ ডিউটি থেকে ফিরে ব্যারাকে ঢুকে বলে উঠল, 'কি রে, তোরা যে সব নিরাকার ভোজে বসে গেছিস—ব্যাপার কি ?"

কয়েকজন কেমন যেন ক্লান্ত দৃষ্টিতে স্বরাজের দিকে ফিরে চায়। স্বরাজ অনন্ত-র কাছ ঘেঁষে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে, "কি হয়েছে রে ? কোন খারাপ খবর আছে নাকি ?"

অনন্ত বললে, "না, এই যুদ্ধের কথা হচ্ছিল।"

স্বরাজ বললে, "তাই বলো, আমি তো রেগুলার ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এ তো সুখবর। স্টেশনে একজন সিভিলিয়ান ভদ্রলোক বলছিলেন, স্টালিনগ্রাদে আড়াই লক্ষ জার্মান সৈন্য ঘেরাও হয়ে গেছে—এইবার জার্মানি কুপোকাৎ—৪৫

সালের মধ্যেই আমরা বাড়ী ফিরতে পারব।”

অকস্মাৎ একসঙ্গে একটা উল্লাস ফেটে পড়ল “হিপ-হিপ-হুর-রে—”

খগেন লাফিয়ে উঠে বললে, “বলিস কিরে! এই শালা নরক থেকে তাহলে আমরা মুক্তি পাব?”

সকলের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, মুক্তি! সত্যিই তো মুক্তি!

স্বরাজ বললে, “যাক, এইবার আমার খবরটা শোন—শুনলে আর এক দফা ভমকে যাবি।”

পাচকড়ি বলে ওঠে, “বাড়ী ফেরার আশা যখন দেখা দিয়েছে, তখন আর কিছুতেই ঘাবড়াই না—”

স্বরাজ বললে, “মেজর ব্রাউন বদলি হয়ে চলে যাচ্ছে—”

পাচকড়ি বললে, “যেতে দাও শালাকে জাহান্নামে—”

স্বরাজ বলতে লাগল, “আর ওর জায়গায় যেটি আসছেন, সেটি নাকি মেজর রায়ের রাজসংস্করণ—” পাচকড়ি আবার তেড়ে ফুঁড়ে ওঠে, “তাতে আর খুব সুবিধে হবে না, বলে দিও যাদুদের—আমরা আর সেই ভেড়াটি নেই। এখন থেকে ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হবে।”

অনন্ত বললে, “তা ইনি যে এমন হঠাৎ আমাদের অকূল পাথারে ভাসিয়ে চললেন! ইনিও কি মেজর রায়ের মতো বিদ্রোহ করছিলেন নাকি?”

স্বরাজ বললে, “ইনি চলেছেন প্রমোশন নিয়ে। তা আজ প্রায় দেড়বছর তো হয়ে গেল আমাদের কোম্পানিতে এসেছেন।

অমল বলে ওঠে, “প্রমোশন এঁর না হলে আর হবে কার! এমন সুন্দর ভাবে কচুকাটা করলে এই দেড়টা বছর ধরে—সমস্ত কোম্পানিটার বোধহয় কমসে কম ছ'মাসের মাইনে কেটেছে।”

স্বরাজ বললে, “তার ওপর আবার এ্যাডিশন্যাল কোয়ালিফিকেশন—”

খগেন বললে, “সেটা আবার কি! শুনি?”

“এঁর মেম সাহেবটি নাকি খুব সুন্দরী—তিনি আবার দিল্লী হেড কোয়াটারসে এ. জি-র পার্সোন্যাল স্টেনো। শাস্ত্রের বচন, স্ত্রীভাগ্যে ধন—আর সুন্দরী স্ত্রী কিনা, তাই ধন একেবারে ছপ্পর ফুঁড়ে পাচ্ছেন। কমিশন পাওয়ার চোদ্দ দিনের মধ্যে লেফটেন্যান্ট, আড়াই মাসে ক্যাপটেন, আর চতুর্থ মাসে মেজর হয়ে আমাদের কোম্পানিতে অবতীর্ণ হলেন।”

জনকয়েক একসঙ্গে বলে ওঠে, “সাব্‌বাস—”

স্বরাজ বললে, “কিন্তু আসল খবরটা তো এখনও শুনিস নি। তাহলে একটু

কাছে কাছে আয়—এ নিয়ে যেন হৈ চৈ করিস নি।"

সকলে গোল হয়ে স্বরাজকে ঘিরে ধরল। স্বরাজ চাপা গলায় বললে, "সুবেদার সাহেব ঠিক করেছেন, মেজর ব্রাউনকে ফেয়ারওয়েল দিতে হবে। আজ রোলকলে তিনি সেই কথা তুলবেন, আর সকলের কাছে চাঁদা চাইবেন। ফেয়ারওয়েলের দিন ঐ টাকায় কিছু একটা জিনিস কোম্পানির ছেলেদের তরফ থেকে মেজর সাহেবকে প্রেজেন্ট করা হবে, আর ক্যানটিনে একটা ছোটখাট জলসা করা হবে। ডাক পড়বে অমলের, বিজয়া-সম্মিলনীর মতো ভ্যারাইটি শো অর্গানাইজ করার জন্যে—"

অমল হঠাৎ যেন ফেটে পড়ল, "না, কিছুতেই হতে পারে না। আমাদের রক্ত যারা তিলে তিলে শুষে নিয়েছে—আমাদের সঙ্গে যারা প্রতিটি মুহূর্ত কুকুর-বেড়ালের শামিল ব্যবহার করেছে—তাদের কাকেও আমরা কোনভাবেই সম্মান দেখাব না।"

স্বরাজ বললে, "কিন্তু অমল, সেই দিনই মেজর ব্রাউন আপগ্রেডিং লিস্টে সই ক'রে যাবেন। অকাদা সে লিস্ট তৈরি ক'রে রেডি হয়ে আছে, মানপত্র দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই লিস্টটি মেজর সাহেবকে দেবে।"

মুহূর্তের মধ্যে সকলেই স্তব্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ পাঁচকড়ি ফেটে পড়ে, "তার মানে, লোভ দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকে সম্মান আদায় করবে!"

শিবেন বলে ওঠে, "ওসব আর হচ্ছে না। জাপান তো এসে পড়েছে—এইবার শালাদের গলায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দেব।"

সুনীল বললে, "কিন্তু নামকা ওয়াস্তে একটা ভ্যারাইটি শো করলে যদি আপগ্রেডিঙটা পাওয়া যায়, মন্দ কি!"

পাঁচকড়ি ক্ষিপ্তের মতো লাফিয়ে ওঠে, "চাই না শালা আপগ্রেডিং! ইস, গরু মেরে জুতো দান! এই চললুম আমি—কোম্পানির প্রত্যেকটি ছেলেকে বলব, ফেয়ারওয়েল বয়কট করতে।"

রিভেলির পর ছেলেরা চা আর পুরি নিয়ে যে যার ব্যারাকে ফিরেছে। যাদের খাওয়া হয়ে গেছে, তারা পি. টি-র পোশাক পরছে। যাদের বিছানা ড্রেসিং তখনও বাকী, তারা তাড়াহুড়ো ক'রে কাজ সেরে নিচ্ছে। হঠাৎ হুইসিল বেজে উঠল। যাদের কাজ শেষ হয় নি, তারা চিৎকার ক'রে ওঠে, "দেখ মাইরি, এখনো পাক্কা দশ মিনিট বাকী, আর শালা হাবিলদার মেজর কি না হুইসিল

বাজিয়ে দিলে !"

ব্যারাকের আর একপ্রান্ত থেকে একজন চিৎকার ক'রে উঠল, "এই কেউ ফল্‌ইন করিস নি—"

এন. সি. ও-এর দল ব্যারাকে ব্যারাকে ছুটেছে—চিৎকার করছে, "যে যে পোশাকে আছ, ওই ভাবেই আভ্‌ভি ক্যানটিনমে ফল্‌ইন—জলদি—"

জনকয়েক ছেলে একজন এন. সি. ও-কে ঘিরে ধরে, "কেন, ক্যানটিনে আবার এই সকাল বেলায় কি ?"

মহাব্যস্তভাবে অন্য ব্যারাকের দিকে ছুটতে ছুটতে এন. সি. ও. বললে, "অতশত জানি না বাপু, সুবেদার সাহেবের হুকুম—মেজর সাহেব এসেছেন।"

ছেলেরা ভাবনায় পড়ে যায়—এই সাত-সকালে মেজর নেলসন এসেছে ক্যাম্পে ! পি. টি-র বদলে ক্যানটিনে ! বেবাক বিস্ময়ে ছেলেরা মূক হয়ে গেছে—সন্ত্রস্ত গতিতে তারা ক্যানটিনে এসে জমা হতে থাকে। ক্যানটিনে শুধু মেজর নেলসন একা নয়, অন্য অফিসাররাও আছেন। সুবেদার, জমাদার, হাবিলদার মেজর, এমন কি অকাদাও গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

—ব্যাপারটা কি ? নতুন কোন হুকুম ! তার জন্যে সবকটি অফিসার এই ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে উঠে আসবে কেন ? পার্ট ওয়ান অর্ডারে একবার ছেপে দিলেই তো সুবেদার থেকে ক্ষুদে ল্যান্স-নায়েক পর্যন্ত হুকুম মানাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যেত ! কোম্পানি মুভ করবে ? তার জন্যে তো এত সকালে নরম বিছানা ছেড়ে, ব্রেকফাস্ট না ক'রে, এমন চিন্তিত মুখে অফিসারদের স্বয়ং এসে হাজির হওয়া দরকার পড়ে না। মুখের কথা খসালেই তো ওই সুবেদার আর হাবিলদার মেজর ধ'রে আনবার জায়গায় বেঁধে আনত !

সুবেদার সাহেব ক্যানটিনের প্ল্যাটফরমে উঠে মিহি গলায় বললেন, "তোমরা সকলে বসে পড়—" অফিসাররা আর তাঁদের পেছন পেছন হাবিলদার মেজর প্ল্যাটফরমে উঠলেন। অকাদা তাঁর গোলকধাঁধার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে প্ল্যাটফরমের সিঁড়িটায় বসে পড়লেন।

—নাঃ, আমাদের পক্ষে কষ্টকর কোন ব্যাপার নিশ্চয়ই নয় ! তা যদি হতো, তাহলে ওদের মুখগুলো এতক্ষণে খুশিতে ভরে উঠত। কিন্তু, ওদের মুখ যে শুকনো !

মেজর নেলসন প্ল্যাটফরমের সামনে এসে বলতে শুরু করলেন, "তোমরা সকলেই জানো, গত একমাস ধরে আসাম-বর্মা-সীমান্তে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কয়েকটা জায়গায় আমরা পশ্চাদপদ হয়েছি। টিডিডিম যে আমাদের দখলের বাইরে চলে

গেছে, সে খবর তোমরা কাল রাত্রে রেডিওতে শুনেছ।”

—টিডিডম তো গেছে, আর তোমরাও শালারা টিমটিম করছ। পশ্চাদপদ হওয়া ছাড়া তোমাদের আর গতি কি! কর শালারা বুট পালিশ আর বিস্তারা ড্রেসিং—জাপানীরা তোমাদের চকচকে বুট দেখেই পালিয়ে যাবে!

মেজর নেলসন বলে চলেছেন, “কিন্তু আজ সকালে আমি তোমাদের কাছে রেডিওর খবর শোনাতে আসি নি। এমন একটা খবর আমি পেয়েছি, যে খবর এখনি, আর এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে তোমাদের জানান দরকার। জাপানীরা আমাদের ফোর্থ কোর এলাকা আক্রমণ করেছে—”

—তবে আর কি! এইবার বীরত্বের সঙ্গে পশ্চাদপদ হতে শুরু কর। আর মরবার জন্যে আমরা তো ভেড়ার পাল আছিই!

মেজর সাহেব তখনও বলছেন, “এখন আমাদের সামনে বিরাট দায়িত্ব। এমনই একটা দিনের জন্যে আমরা আজ তিন বছর ধরে প্রস্তুত হচ্ছি। সেই পরীক্ষার দিন আমাদের সামনে এসে গেছে। আমি তোমাদের কোম্পানিতে নতুন—আমার চেয়ে তোমাদের, এই কোম্পানির ওপর দরদ ঢের বেশী। আজ আমাদের প্রাণ দিয়েও কোম্পানির সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। আমাদের কোম্পানি যুদ্ধের মাঠে লড়বার বাহিনী নয়—আমাদের কাজ হচ্ছে রেল চালানো। যদি প্রয়োজন হয়, আত্মরক্ষার জন্যে সব রকম অস্ত্রই তোমাদের ধরতে হবে।”

—তা তো হবেই। দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আমাদেরই নিতে হবে—শেষ লড়াই আমাদেরই লড়তে হবে। আর সেইজন্যে এই তিন বছর ধরে আমাদের আধমরা ক'রে ফেলেছ। অস্ত্র যদি হাতে পাই, তাহলে জাপানীদের আগে শালা তোমাদের কচুকাটা করব।

একটা সিগারেট ধরিয়ে মেজর নেলসন আবার বলতে শুরু করেন, “আজ আমাদের ওপর নির্ভর করছে সীমান্তের সৈনিকদের খাওয়াপরা, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, সব কিছুই। আমরা আজ যতবেশী কাজ করতে পারব, জাপানের পরাজয়ের দিন ততই এগিয়ে আসবে, ভারতবর্ষের নিরাপত্তা ততই মজবুত হবে, আর আমাদের ঘরে ফেরার দিন ততই নিকট হবে।

নীরব সৈনিকের দল স্তম্ভিত হয়ে গেছে। এত সরলতা, এত আবেদন, তাদের শক্তির প্রতি এতখানি মর্যাদা! সবই কেমন যেন ভেল্কির মতো মনে হয়। তাদের সামরিক জীবনের সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস ধীরে ধীরে চোখের ওপর দিয়ে ভেসে চলে। অফিসার আর তার পুচ্ছগ্রাহীদলের অত্যাচার দিনের

পর দিন জমা হয়ে উঠে আজ যে আক্রোশ জাগিয়ে তুলেছে, তারই প্রতিহিংসা সবার আগে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে, দাঁত কড়মড় ক'রে ওঠে—এদের ভাঁওতায় আর ভোলা হবে না—এমন সুযোগ আর ছাড়া হবে না। তাদের জীবনকে যারাই নষ্ট করতে আসবে, তাদের তারা কিছুতেই ক্ষমা করবে না। মনে পড়ে বর্মা-ইভ্যাকুয়ী সৈনিক আর নাগরিকদের চেহারাগুলো, আর তাদের প্রেতাত্মার মিছিল! শঙ্কিত সন্ত্রস্ত সৈনিকের দল আতঙ্কে চোখ বোজে, মানসপটে ভেসে ওঠে তাদের গৃহের ছবি। তাদের স্নেহাতুর বাপ-মা, অসীম সহানুভূতিশীল ভাই-বোন, সম্পূর্ণ নির্ভরশীল স্ত্রী-পুত্র! তাদের কি হবে? তাদের শান্তির নীড়ে আগুন ধরিয়ে, কে তাদের টেনে আনল এই মরণ যজ্ঞে! কেন?

অফিসারদের মধ্যে কিছুক্ষণ পরামর্শ চলে। তারপর মেজর সাহেব একটা শ্লিপ নিয়ে বলতে শুরু করেন, "এইবার আমাদের কাজের একটা খসড়া তৈরি করতে হবে। সমস্ত কোম্পানিটাকে আমরা তিনভাগে ভাগ করব। প্রথম দল থাকবে রেলওয়ে ডিউটিতে। দ্বিতীয় দল, রেকী স্কোয়াড, মণিপুর রেলহেড রক্ষা করবে। প্রতিদিন তারা লাইন পরীক্ষা করবে, দেখবে কোথাও কোন সাবোতাজ হচ্ছে কিনা। রেললাইনের ওপর কোথাও কোন হামলা হলে তারা এগিয়ে গিয়ে মহড়া নেবে। এই দলের কম্যাণ্ডার হবেন লেফটেন্যাণ্ট কনেলি আর সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড সুবেদার নন্দী। এই দলে থাকবে চারজন ব্রেন-গান ক্রু আর আঠারো জন রাইফেলম্যান। বাকী লোক নিয়ে হবে তৃতীয় দল—রিজার্ভ ব্যাচ।"

আবার কিছুক্ষণ জনান্তিকে আলোচনা চলে। এরই ফাঁকে সাদেক বলে ওঠে, "শালাদের শেয়ালের যুক্তি তো আর শেষ হবে না দেখছি! এদিকে বিড়ি না খেয়ে যে পেট ফেঁপে ওঠবার জোগাড়—"

পাশ থেকে রবীন বললে, "আরে নে না, তুই বিড়ি ধরা। এখন আর ও শালারা কোন কথাটি কইবে না—বেগতিক দেখলে পায়েও ধরবে।"

ফস্ ক'রে দেশলাই জ্বালার শব্দে ক্যানটিনসুদ্ধ ছেলে চমকে ওঠে। মেজর নেলসন ভ্রূ কুঁচকে দেখে বললেন, "ইয়েস, ইউ ক্যান স্মোক—"

শ'খানেক বিড়ি, সিগারেট জ্বলে উঠল। ধোঁয়ায় সমস্ত ক্যানটিনটা ভরে উঠেছে। মেজর সাহেব জানিয়ে দিলেন, "টেকনিক্যাল ডিউটি ওয়ালারা থাকবে স্টেশনের রানিং রুমে, রেকী স্কোয়াড থাকবে স্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে, আর রিজার্ভ ব্যাচ থাকবে ডিফেন্স বস্কে। অফিসাররাও সকলের কাছাকাছি থাকার

জন্যে থাকবেন আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমে। কোম্পানির প্রত্যেকে একান্ত প্রয়োজনীয় কীটস ছাড়া বাকী সমস্ত জমা ক'রে দেবে স্টোরে। প্রত্যেকের ইউনিফর্ম হবে ব্যাটল অর্ডারে।"

এইবার রেকী স্কোয়াড নির্বাচনের পালা। স্থবেদার নন্দী তাঁর পেয়ারের জনকয়েককে নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু ক'রে দিলেন। যাদের নাম ধরে তিনি ডাকেন, তারা ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার চেষ্টা করে। স্থবেদার সাহেবকে তারা খুশি করেছে খোশামোদ ক'রে ; অন্যের নামে চুকলি খেয়ে, মাঝেমাঝে এটা-সেটা ঘুষ দিয়ে—মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়ার মতো নৈতিক বল তারা পাবে কোথায় !

মেজর সাহেব স্থবেদার সাহেবকে নিরস্ত ক'রে বললেন, "আমি তেমন লোক চাই, যারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবে।"

কিন্তু কে যাবে স্বেচ্ছায় এগিয়ে ! মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়ার মতো প্রেরণা কোথায় ! তারা অনেকেই সংসারের একমাত্র অবলম্বন। তাঁদের জীবনে বিপর্যয় ঘটলে, তাদের শূন্য স্থানকে পূরণ করার যে কিছুই নেই ! গভর্নমেন্টের প্রতিশ্রুত আঠার টাকা মাস-মাহিনার অর্ধেক ন'টাকা মাস-পেন্সনের ভরসায় নিজের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করতে প্রবৃত্তি জাগে না।

সব কয়টি অফিসারের দৃষ্টি ছেলেদের ওপর নিবদ্ধ। ফ্যাকাশে মুখে আজ তাঁরা চেয়ে আছেন এই মানুষগুলোর দিকে। বেয়নেটের ডগায় আদায় করা আনুগত্য আজ তাঁদের প্রাণে আশার সঞ্চার করতে পারে না। তাই তাঁরা জানতে চান, যে মাটির ওপর তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, সে মাটি একেবারেই চোরাবালি কিনা !

অবশেষে জনকয়েক এন. সি. ও. আর কয়েকটি ছেলে বেরিয়ে এলো। বাকী ছেলেরা তাদের দিকে চেয়ে মুচকে হেসে বললে, "যা শালারা মরগে যা—মরে গেলে তোদের রাজা বানিয়ে দেবে—"

পনেরো

একদিনের মধ্যে স্টেশনের চেহারা গেল বদলে। কাঁটা তার দিয়ে মস্ত স্টেশন এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। সারাদিনই কড়া পাহারার বন্দোবস্ত, বিশেষ ক'রে সন্ধ্যের পর আট হাত অন্তর সান্ত্রী মোতায়েন হয়। প্রতিটি ইয়ার্ডের মুখে মুখে পিলবক্স তৈরি হচ্ছে। শ্লিট ট্রেঞ্চের ওপর করা হচ্ছে ক্যামোফ্লাজ। সমস্ত স্টেশন এলাকায় সম্পূর্ণ ব্ল্যাক-আউট। ইয়ার্ডগুলো অন্ধকার, ইঞ্জিনের হেড লাইট জ্বলে না—রাতের বেলায় একমাত্র পয়েণ্টসম্যানদের হাতবাতি ছাড়া কোন আলোও জ্বলে না। সান্ধ্য আইন জারি হয়েছে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। বিনা পাস-ওয়ার্ডে স্টেশন এলাকার মধ্যে ঢুকলে জীবন হয়ে উঠছে সংশয়াপন্ন। এ্যান্টি-এয়ারক্রাফটগুলো সব সময়ে উর্ধ্বমুখ হয়ে আছে। ইনফ্যান্ট্রির একটা পুরো কোম্পানি স্টেশন রক্ষার ভার নিয়েছে।

রেলের কাজ যারা করছে, তাদের কার্যকাল আট ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে বারো ঘণ্টা করা হয়েছে। সংখ্যানুপাতিক হিসাবে রিজার্ভের লোক নাকি অনেক কম হয়েছে। সুতরাং রেলের কাজ থেকে ছাঁটাই ক'রে রিজার্ভ ব্যাচের হিসাব পূরণ করা হয়েছে।

গাড়ী চলাচলের সংখ্যা গেছে বেড়ে। আমেরিকানরা নতুন কায়দায় গাড়ী চালানো শুরু করেছে। একসঙ্গে একশো খানা ওয়াগন জুড়ে, মাথায় ডবল ইঞ্জিন লাগিয়ে হু হু শব্দে টেনে নিয়ে যায় বড় ইয়ার্ডওয়ালা স্টেশনে; যেমন লামডিং, মণিপুর রোড, মারিয়ানি, তিনসুকিয়ায়। আসছে ট্রুপস স্পেশ্যাল একটার পেছনে আর একটা, তার পেছনে ট্যাংক স্পেশ্যাল, ব্রেন-গান-ক্যারিয়ার স্পেশ্যাল, আর তার ফাঁকে হাণ্ড্রেড কার স্পেশ্যাল। আসছে সৈনিক, অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য, কাপড়-চোপড়, জন্তু-জানোয়ার—মনে হয়, বুঝিবা পৃথিবীর সমস্ত জিনিস এসে জড় হচ্ছে এই ডিমাপুরে। গাড়ী এসে মেইন ইয়ার্ড বা ওয়েস্ট ইয়ার্ডে থামছে, সঙ্গে সঙ্গে ইয়ার্ড পাইলট লোড সর্ট ক'রে নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সাইডিঙে।

স্টেশনের আবহাওয়াটা হয়ে উঠেছে থমথমে। নিশ্বাস ফেলার সময় নেই, বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। যান্ত্রিক উন্মত্ততার বেড়াজালে পড়ে মানুষগুলোও পেয়েছে যান্ত্রিক গতিবেগ। চাকার ঘর্ ঘর্ শব্দে তাদের কানে বাজতে থাকে একটি মাত্র কথা, 'যত বেশি কাজ তারা করতে পারবে, জাপানের পরাজয়ের দিন ততই এগিয়ে আসবে আর ঘরে ফেরার দিনও ততই নিকট হবে।' সকালের প্রথম খবর তারা শোনে, রাশিয়ার লাল ফৌজ আরও এগিয়ে গেছে, স্ট্যালিন-

গ্রাড মুক্তি পেয়েছে, খারকভ পুনরুদ্ধার হয়েছে, লেনিনগ্রাডের অবরোধ ভেঙে পড়েছে। তবে কি মুক্তির দিন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

রেকী স্কোয়াড কাজ বুঝে নিয়েছে। উঁচু দেয়ালওয়ালা একটা খোলা ওয়াগনের ওপর স্যাণ্ডব্যাগ দিয়ে বুক সমান পাঁচিল তোলা হয়েছে। তারই অন্তরালে, দুই কোণে দুই ব্রেনগান আর তাদের পেছনে ন'জন করে রাইফেল-ম্যান। এর মধ্যে মহড়াও বারকয়েক হয়ে গেছে।

রিজার্ভ ব্যাচ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত সময়টুকুর জন্যে তাদের যাবতীয় মাল-পত্তর ঘাড়ে ক'রে ক্যাম্পে ফিরে আসে। দু-বেলার খাওয়া সেরে নেওয়া পর্যন্ত ক্যাম্প চৌহদ্দির মধ্যে ঘোরাফেরা করে—সন্ধ্যে হওয়ার আগেই আবার ফিরে যায়—ডিফেন্স-বক্সে। পাশেই তাদের ওয়েস্ট ইয়ার্ড, সেখান থেকে ভেসে আসে কর্মচাঞ্চল্যের কলরব! ক্যাম্পের গণ্ডি ছেড়ে যাওয়ার হুকুম নেই—তাই তারা কান পেতে শোনে ওয়াগন ঠোকাঠুকির শব্দ, পাইলট ইঞ্জিনের হুইসিল, আর ভাবে—কবে তাদেরও ডাক পড়বে।

ডিমাপুরের মধ্যে সবচেয়ে যেটি মারাত্মক জায়গা, সেই পেট্রোল সাইডিঙে হয়েছে রিজার্ভ ব্যাচের নিরাপদ আশ্রয়। কোটি কোটি গ্যালন পেট্রোল সেখানে মাটির তলায় আর ওপরে জমা করে রাখা হয়েছে। সে জায়গার নিরাপত্তা তো একটি ইনসেনডিয়ারি বম্বের অপেক্ষায়! তারই মধ্যে তারা থাকে চার ফিট গভীর, ক্যামোফ্লাজ করা বৃহৎ এক ট্রেঞ্চের মধ্যে। তাদের চারপাশে আছে অনেকগুলো এ্যাক-এ্যাক পোস্ট আর পিল-বক্স। সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, তারা নেমে যায় গহ্বরের নীচে—দিনের শেষ তাদের কাছে তখনই হয়ে যায়। শুয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না, তাই তারা শুয়ে পড়ে। চিৎ হয়ে শুয়ে নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে জোর ক'রে চেয়ে থাকে; ভাবে বাড়ীর কথা—আরও ভাবে, যদি সত্যই জাপানীরা আক্রমণ করে, তখন তারা কেমন ক'রে আত্মরক্ষা করবে। উপায় ভাবতে গিয়ে একমাত্র পালিয়ে যাওয়া এবং পায়ে হেঁটে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাড়ি দেওয়া ছাড়া আর কোন সমাধান খুঁজে পায় না। রুদ্ধ আক্রোশে হাত দুটো মুঠো হয়ে ওঠে আর চোখ দুটো যায় বন্ধ হয়ে—অন্ধকারের বুক চিরে তারা যেন দেখতে পায় বর্মার ইভ্যাকুয়ীরা মিছিল ক'রে, মৃত্যুর পরোয়ানা উঁচিয়ে, নরকঙ্কালের শোভাযাত্রা বানিয়ে চলেছে।

কোহিমাকে দুদিক দিয়ে জাপানীরা আক্রমণ করেছে। মাও-এর মাঝামাঝি আক্রমণ ক'রে ইম্ফলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে সোজা নেমে আসছে প্রধান সড়ক ধরে কোহিমার দিকে; অপর দিকে কোহিমার পেছন

থেকে বোকাজান রোড আর জেসিম রোডের মাঝামাঝি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে উঠছে কোহিমার আশপাশের গ্রামগুলোয়। অতর্কিত এই আক্রমণে কোহিমার প্রতিরোধ-ব্যূহ টলমল ক'রে উঠেছে। ডিমাপুর থেকে কোহিমার রাস্তাও বিপন্ন হয়ে উঠেছে, জাপানীরা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে রাস্তার ওপর গুলি চালাচ্ছে। কোহিমার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন—ডিমাপুর থেকে কোহিমা মাত্র ছেচল্লিশ মাইল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে। রিজার্ভ ব্যাচ খাওয়া-দাওয়া সেরে ডিফেন্স বক্সে ফিরে গেছে। রেকী স্কোয়াড ডিউটি বদল ক'রে তাজা উৎসাহে পজিশন নিয়েছে। টেকনিক্যাল ডিউটিতে বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। পাইলট ইঞ্জিন ভসভস শব্দে সমস্ত ইয়ার্ডটাকে চষে বেড়াচ্ছে। পয়েন্টসম্যানেরা হাতবাতি জ্বেলে নিয়েছে। অফিসাররা ওয়েটিং রুমের ইজিচেয়ারে বসে, মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে শুষ্ক মুখে কোহিমার কথা আলোচনা করছেন।

হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল।

দুঃসহ সেই আর্তনাদ বুক-ফাটা কান্নার মতো মানুষকে পাগল ক'রে তোলে। সেই অসহ্য অবস্থায় সবাই মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। উর্ধ্বে চোখ তুলে আকাশের দিকে চায়। চাঁদ! আকাশের কোলে চাঁদের আলো ঝলমল করছে! আতঙ্কে তাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই ছুটল এ্যান্টি-এয়ারক্রাফট থেকে গুলি। ডিমাপুর বেস-এর সব কটা এ্যাকএ্যাক পোস্ট থেকে একই ফায়ারিং চলতে থাকে। কখনও গুলি ছুটছে 'রিপিট' ফায়ারে—কখনও অটোম্যাটিক। সমস্ত আকাশটা ট্রেসার বুলেটের আগুনে সরল রেখার রূপালি জালে ছেয়ে গেছে।

সাইরেনের শব্দ অফিসাররা লক্ষ্য করছিলেন, ট্রেঞ্চে যাওয়ার আগে মদের গ্লাসে শেষ চুমুকটা দিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু ফায়ারিং-এর শব্দে হাত থেকে গ্লাস খসে পড়ে যায়—নেশা তাদের ছুটে যায়। মেজর নেলসন একদৌড়ে বাইরে ছুটলেন। সমস্ত স্টেশনটা কাঁটা-তার দিয়ে ঘেরা—কেবল দুহাত চওড়া জিগজ্যাগ একটা রাস্তা রাখা হয়েছে থার্ডক্লাস ওয়েটিং রুমের সামনে। সোজা দৌড়ে বাইরে যেতে গিয়ে মেজর নেলসন হোঁচট খেলেন সেই কাঁটা-তারের বেড়ায়, সামলে ওঠার আগেই তিনি আটকে পড়লেন কাঁটাতারের মধ্যে। "ওহ্ গড"—আর্তনাদ যারা শুনলে তারা সজাগ হয়ে সঠিক রাস্তা ধরলে।

রেকী স্কোয়াড ব্রেনগানগুলোকে এ্যাক-এ্যাক পজিশন ক'রে নিয়েছে। এক

ঝাঁক প্লেন উড়ে আসছে কোহিমার দিক থেকে, তার শব্দে হাওয়ার কাঁপন বেড়ে উঠেছে। ব্রেনগান ক্রু-র হাতের পাতা ঘেমে উঠেছে। রাইফেলম্যানরা 'নীল ডাউন' পজিশনে বসেও উরুর কাঁপন রোধ করতে পারছে না। প্লেনের ঝাঁকটা যেন ছড়িয়ে পড়ছে—জমাট শব্দ যেন পাতলা হয়ে যাচ্ছে। ক্রু নাম্বার ওয়ান চিৎকার করে উঠল, "কোথায় গেল সেই শুয়োরকা বাচ্চা কর্নেলি ?"

একজন রাইফেলম্যান বলে ওঠে, "তুই চালা গুলি—সে শালা এতক্ষণে কেঁচোর গর্তে ঢুকেছে—" চাপা একটা গোঙানির শব্দ খুব কাছে কোথাও গুমরে উঠছে। চমকে সে সেইদিকে ফিরে চায়। তাদেরই একজন রাইফেলম্যান মুখ থুবড়ে স্যাণ্ডব্যাগের ওপর পড়ে রয়েছে।

ইয়ার্ড ফোরম্যান সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে পাইলট ইঞ্জিনটাকে কেটে নিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে সান্টিং নেক-এ। পয়েণ্টসম্যানরা হাতবাতি নিভিয়ে শ্লিট ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিয়েছে। তারা চেয়ে আছে আকাশের দিকে, মৃত্যু যেন গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে তাদের কাছে—আরও কাছে !

রিজার্ভ ব্যাচ ততক্ষণে শুয়ে পড়েছিল। সাইরেনের শব্দে তারা উঠে বসেছে। এরপর আর তাদের কিছুই করবার নেই—তারা রয়েছে নিরাপত্তার সেরা বন্দোবস্তের মধ্যে। ইচ্ছে করলে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ভাবে শুয়ে থাকতে পারে—তবুও তারা উঠে বসেছে। এ্যাক-এ্যাক ফায়ার যখন শুরু হলো তখন জনকয়েক মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে—দু-তিনজন কাপড়ে পায়খানা ক'রে ফেলেছে। কতক উঠে দাঁড়িয়ে কাঠ হয়ে আছে, কেউ কেউ আপন মনে বিড়বিড় করছে। হঠাৎ একজন চিৎকার ক'রে উঠল, "আমি পালাব—আমি মরতে পারব না—" অন্ধকারের মধ্যে ছোটাছুটি ক'রে সে পথ খুঁজতে থাকে।

কোহিমার খবর ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে। লড়াই চলেছে সমস্ত কোহিমা এলাকা জুড়ে। প্রধান রাস্তা বা শহর এলাকাকে এড়িয়ে জাপানীরা দখল করতে শুরু করেছে গ্রামের পর গ্রাম, আর সেই গ্রামের মধ্যে থেকে ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে এসে কোহিমাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে, কোহিমার সঙ্গে ডিমাপুরের যোগাযোগ আরও কয়েক জায়গায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সর্বশেষ খবর, জাপানীরা জুব্জা পর্যন্ত নেমে এসে কনভয়গুলোকে আক্রমণ করছে। জুব্জা ডিমাপুর থেকে মাত্র তেইশ মাইল।

আগের দিন শোনা গিয়েছিল, নাগা পাহাড়ের ডিভিশন্যাল কমিশনার

জাপানীদের হাতে বন্দী হয়েছে। সেদিন সকালে তাকে দেখা গেল মণিপুর রোড স্টেশনে—মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পায়ে একজোড়া ছেঁড়া গামবুট, জামা-কাপড় ছিঁড়ে কুটিকুটি হয়ে গেছে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে পালিয়ে এসেছে। তাঁর ধারণা, কোহিমা জাপানীদের হাতে চলে গেছে।

অত্যন্ত সহজ আর স্বাভাবিক প্রশ্ন ছেলেদের মনে জেগে উঠেছে, কোহিমা যদি গিয়েই থাকে, তাহলে ডিমাপুর আর কতক্ষণ! ঈস্ট ইয়ার্ড, ওয়েস্ট ইয়ার্ড আর মেইন ইয়ার্ডের সংযোগস্থলে তিন ইয়ার্ডের স্টাফ এসে জমা হয়েছে। স্বরাজ বললে, "আর কেন, এইবার পাততাড়ি গুটোবার বন্দোবস্ত কর।"

শিবেন বললে, "সে বন্দোবস্ত তো আজ সকালেই হয়ে গেছে—জানিস না বুঝি?"

"কি রকম!"

"কুড়িখানা বগি দিয়ে একখানা স্পেশ্যাল ট্রেন তৈরি হয়েছে। তার জন্যে ভালো একটা ডব্লিউ. ডি. ইঞ্জিন চব্বিশ ঘণ্টাই রেডি থাকবে। গার্ড তো তার মালপত্তর নিয়ে ব্রেকভ্যানেই আস্তানা নিয়েছে—আর ড্রাইভার ফায়ারম্যান ইঞ্জিনেই আছে।"

খগেন বলে উঠল, "অর্থাৎ পালানোর পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত—"

শিবেন বললে, "শুধু কি তাই। লরি বোঝাই ক'রে মালপত্তর আসতে শুরু হয়েছে। এরিয়া হেডকোয়ার্টারের সব মাতব্বররাই আছেন। বগিগুলো সব ফার্স্ট আর সেকেণ্ড ক্লাস, তার ওপর আছে একখানা ডাইনিং কার। জিনিস-পত্তর যা এসে পৌঁচেছে, সবই শালাদের প্রাইভেট কীটস। সব শালার ট্যাকের নার্সগুলোরও মালপত্তর এসে হাজির হয়েছে, আর ডাইনিং কারটা বোঝাই হচ্ছে মদের পেটিতে।"

স্বরাজ বলে ওঠে, "যা থাকে কপালে—আমিও উঠে পড়ব ব্রেকে—"

"ওই আনন্দেই থাক। এ গাড়ীর গার্ড কে জানিস? সার্জেণ্ট মেজর স্মিথ। ড্রাইভার হচ্ছে লোকো-ফোরম্যান স্ক্যালান, আর ফায়ারম্যান, ম্যাসি আর বার্ণেন—"

খগেন বললে, "তাহলে আমাদের মরতেই হবে? অত সহজে মরছি না বাবা! বেঁটে মামারা এলেই হাত তুলে দাঁড়িয়ে যাব, বলব সুভাষ বোসের দেশের লোক। তারপর এ শালাদের দিয়ে রিক্সা টানাব—"

স্বরাজ বললে, "অগত্যা—তাছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না—"

মেইন স্টেশনের পয়েণ্টসম্যান মণিপুর সাউথের কেবিনম্যানকে জানায়,

জাপানীরা বোকাজানে ঢুকে পড়েছে। খবরটি গুটি গুটি এগিয়ে চলতে থাকে। পাচকড়ি ওয়েস্ট ট্রুপস সাইডিং থেকে দৌড়ে এসে খগেনকে বলে, "চল মাইরি, আমরা রওনা হয়ে পড়ি। বোকাজান মানে তো এখান থেকে দশমাইল। তবে আর কতক্ষণ!"

খগেন বললে, "কিন্তু পালাব কোন চুলোয়? রাস্তা তো চিনি না—"

সাউথ স্টেশন থেকে স্থনীল কণ্ট্রোল ফোনে পাচকড়িকে ডাকছে। পাচকড়ি খগেনকে বললে, "চলো, নিশ্চয়ই কোন খবর আছে—"

ফোন ধরে পাচকড়ি বললে, "কিরে স্থনীল, খবর কি?"

খগেন পাঁচকড়ির মুখের দিকে চেয়ে আছে। শুনতে শুনতে পাচকড়ি আঁতকে উঠল, "এঁ্যা—ধানশিরিতে ধরা পড়েছে? দু-জন?"

ফোন নামিয়ে পাঁচকড়ি বললে, "শুনলি তো, ধানশিরিতে দু-জন জাপানী ধরা পড়েছে! বল, এখন কি করা যায়?"

খগেন শুধু অসহায়ভাবে পাঁচকড়ির মুখের দিকে চায়। পাঁচকড়ির যেন ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। হঠাৎ সে ফেটে পড়ে, "এমন ফাঁদেই পড়েছি যে নড়বার ক্ষমতাটি নেই—ডাহা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে হবে?"

বেলা যত বাড়ছে, গুজব ততই জোরালো হয়ে উঠছে। কোহিমার পতন ঘটেছে, এরা কেবল কোহিমা থেকে নেমে আসার রাস্তাটা আটকে রেখেছে। ব্রিটিশের সমস্ত এ্যামুনিশন ফুরিয়ে গেছে। ইণ্ডিয়ান সোলজারদের জাপানীরা কিছুই বলছে না। আজকেই রাতের অন্ধকারে ডিমাপুর আক্রমণ করবে। ডিমাপুরকে দু'দিক দিয়ে ঘিরে ফেলবে, স্ট্যালিনগ্রাদের মতো সমস্ত ব্রিটিশ ফৌজকে করবে ঘেরাও। জাপানীরা এসে গেছে গোলাঘাটে, সেখানে বাজারের পথে রীতিমতো লড়াই হচ্ছে। জামগুড়িতে এসেছে চারজন, বোকাজানে ছ'জন, ধানশিরিতে যে কতজন, তা জানা যায় নি।

অকাদা তাঁর গোলকধাঁধার ওপর চোখ রেখে লাইন ডিঙোতে ডিঙোতে ওয়েস্ট ইয়ার্ডে চলেছেন। শিবেন বললে, "আমাদের কি হাল হবে দাদা?"

"কেন ভাই, কি হয়েছে রে?"

"আপনি থাকেন ও-সি'র পাশে পাশে, আর বলছেন কিনা কি হয়েছে!"

"আমার কি আর মাথার ঠিক আছে ভাই! এই দেখ না, বেলা দুটো থেকে সেকেণ্ড ব্রিটিশ ডিভিশন আসতে শুরু করবে। প্রতি আধঘণ্টা অন্তর অন্তর একখানা ক'রে ট্রুপস স্পেশ্যাল আসবে। বুঝতেই তো পারছিস ভাই, সে কি ভীষণ ব্যাপার—সমস্ত ইয়ার্ডটা তো ক্লিয়ার চাই?"

"কিন্তু তাঁরা এসে আর করবেন কি, এদিকে জাপানীরা তো ডিমাপুরের দু'দিকেই ঢুকে পড়েছে। আপ-এ ঢুকেছে বোকাজানে, আর ডাউনে ধানশিরিতে—আমরা তো ঘেরাও হয়ে গেছি—"

হঠাৎ যেন অকাদা ক্ষেপে উঠলেন, "কে তোকে এ-কথা বলেছে বল, তার নামটা একবার বল, এখনই তাকে ফাঁসিতে লটকিয়ে তবে ছাড়ব। সে পাক্কা ফিফ্থ কলামনিস্ট! এ সব কথায় কান দিস নি ভাই, কি দরকার ভাই আমাদের এসব কথায়! জানিস তো, আমরা বাঙালীরা হয়েছি শালাদের চক্ষুশূল। শালারা মনে করে, বাঙালী হলেই যেন সুভাষ বোসের আত্মীয়!"

"কিন্তু দাদা—"

"কিন্তু-টিন্তু নয় ভাই। শোনা যাচ্ছে জাপানীদের সঙ্গে কিছু কিছু ভারতীয় সৈন্য এসেছে—সেই-যে যারা হংকং-এ সারেণ্ডার করেছিল। তারা নাকি এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই তো কাল একজন পাঞ্জাবী লেফটেন্যাণ্ট পি. ও. এল. সাইডিঙে ধরা পড়েছে—সে নাকি পেট্রোল নিয়ে জাপানীদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিল! বুঝলি না ভাই, দিনকাল বড় খারাপ—একটি কথাও বলিস নি, চুপচাপ নিজের কাজ ক'রে যা।"

হতাশা আর আতঙ্কের একটা ছায়া ঘনিয়ে ওঠে ছেলেদের মনে। কাজের চাপে যারা এতক্ষণ অসুরের মতো খেটে চলেছিল তারা ঝিমিয়ে পড়েছে। সব কিছুর আগে তাদের কাছে বাঁচার প্রশ্নটাই একমাত্র সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঁচতে যে তাদের হবেই, কিন্তু তার উপায় কি! দেখেছে তারা বর্মা ইভ্যাকুয়ীদেরও জীবন-সংগ্রাম—শুধু বাঁচবার জন্যে, কোন মতে প্রাণটাকে দেহের মধ্যে ধরে রাখবার জন্যে স্বামী তার স্ত্রীকে ফেলে চলে গেছে, মা তার শিশুকে ফেলে রেখে গাড়ীতে উঠেছে, এক টুকরো পাঁউরুটির জন্যে একজন যুবতী তার দেহ বিকিয়ে দিয়েছে। তবে কি তারাও জাপানীদের সামনে হাত তুলে দাঁড়াবে! এছাড়া বাঁচার কি আর কোন পথ নেই?

কোহিমার অবস্থা চরমে উঠেছে—জাপানীরা ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলেছে কোহিমা-ক্যাণ্টনমেণ্ট। যুদ্ধ দানা বেঁধে উঠেছে ক্যাণ্টনমেণ্টের প্রবেশ-পথে। যে সৈন্য ওখানে আছে, তারা সামাল দিতে পারছে না। ব্রিটিশ যদি কোহিমা রক্ষা করতে না পারে, তাহলে প্রায় সমস্তটা আসাম চলে যাবে জাপানের হাতে —ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তট ছাড়া আর কোথাও বোধহয় তারা একটা আত্মরক্ষা

ব্যূহ পর্যন্ত খাড়া করতে পারবে না।

তাই আসছে সেকেণ্ড ব্রিটিশ ডিভিশন। বিশ্ববিশ্রুত দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ সেকেণ্ড ডিভিশন—উত্তর আফ্রিকায় যারা জার্মানীকে ঘায়েল করেছে—সেই ক্র্যাক ডিভিশন। আসছে ডারহামস, ডি. সি. এল. আই., কে. আর. আর., কিংস ওন রেজিমেণ্ট, কুইনস ওন রেজিমেণ্ট, আরও কত কি! মনে হয় ব্রিটিশ যেন তার সমস্ত জাতিটাকে উজাড় ক'রে দিয়েছে কোহিমাকে রক্ষা করার জন্যে। কোহিমা যদি রক্ষা হয়, তবেই ভারতবর্ষ রক্ষা পাবে।

ট্রুপস স্পেশ্যাল এসে দাঁড়াচ্ছে প্ল্যাটফরমে—আর. টি. ও ট্রাকে স্টার্ট দিয়ে একেবারে তৈরি। তাদের কীট ব্যাগে প্ল্যাটফরম ভরে ওঠে। স্টেন গান হাতে নিয়ে তারা ট্রাকে উঠছে—ট্রাক রওনা হচ্ছে কোহিমার উদ্দেশে। ত্রিশখানা ক'রে ট্রাকের কনভয়, সামনে সামনে চলেছে ব্রেনগান ক্যারিয়ার—ড্রাম ম্যাগাজিন ফিট ক'রে। প্রতি তিনখানা লরির পেছনে একখানা ব্রেনগান ক্যারিয়ার। তাদের কাছে নির্দেশ—যে কোন উপায়েই হোক কোহিমা ক্যাণ্টনমেণ্টে তাদের পৌঁছতেই হবে।

কয়েকখানা ট্রুপস স্পেশ্যাল আসার পরই এলো একখানা ট্যাংক স্পেশ্যাল—বারোখানা বত্রিশ টন ট্যাংক নিয়ে! তারপর আবার আসতে শুরু করে ট্রুপস স্পেশ্যাল—রয়াল আইরিশ ফুসিলিয়ার্স, নরফোক রেজিমেণ্ট, এসেক্স রেজিমেণ্ট ইত্যাদি। ব্যবস্থা সেই একই, ত্রিশখানা ট্রাকের কনভয়, তার সামনে ট্যাংক, তার পেছনে ট্যাংক। ডিমাপুর থেকে কোহিমা পর্যন্ত রাস্তা সম্পূর্ণ আয়ত্তে থাকা চাই-ই।

খুশির একটা ভাব যেন ঘনিয়ে উঠতে চায়। হয়তো যুদ্ধের মোড় এইবার ঘুরবে। লাল-ফৌজ যদি স্ট্যালিনগ্রাড থেকে জার্মানদের তাড়িয়ে রাশিয়া মুক্ত করতে পারে, তাহলে কোহিমা কেন মুক্তি পাবে না!

খবর আসতে থাকে, ব্রিটিশ সেকেণ্ড ডিভিশন সামাল দিতে পারছে না। একটার পর একটা রেজিমেণ্ট যাচ্ছে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। যে কনভয় ক'রে তারা গিয়েছিল কোহিমায় লড়তে সেই কনভয় ক'রে তারা ফিরে আসছে রেডক্রস ঝুলিয়ে। নিতান্ত ভাগ্যবান যারা, তারা ফিরে আসছে ডিমাপুরের বেস হাসপাতালে।

হাসপাতালে আর সিট নেই। সাধারণ রোগীদের ছুটি দিয়ে ইউনিটে পাঠিয়ে দিচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতাল ব্যারাকের ফাঁকে ফাঁকে যেখানে যতটুকু জমি আছে, সেইখানেই তাঁবু খাটানো হচ্ছে। এম্বুলেন্স স্পেশ্যাল দু'খানার

জায়গায় আরও দু'খানা আমদানি করা হয়েছে—সিরিয়স কেস ট্রান্সফার করার জন্যে গৌহাটিতে।

মেজর নেলসন, যিনি নিজে বোধহয় দিনে দু'বার দাড়ি কামিয়ে থাকেন, ইন্সপেকশন প্যারেডে যিনি ছেলেদের গালে হাতের উল্টো পিঠ ঘষে দাড়ি কামানো পরীক্ষা করেন, তাঁরও গাল খোঁচা খোঁচা দাড়িতে কালো হয়ে উঠেছে। ছেলেদের বুটের ওপর কাদা আর মাটি জমে একটা আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছে, প্যাণ্টে ক্রীজ নেই, জামায় বোতাম নেই, টুপির নীচে ঘাড়ে চুল বড় হয়ে উঠেছে, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে মুখগুলো কদাকার হয়ে উঠেছে। তবুও মেজর নেলসনের মেজাজ খারাপ হয় না।

ওয়েস্ট-ইয়ার্ডের এক নম্বর লাইনে হেড কোয়ার্টার স্পেশ্যালখানা স্টেবল করা আছে। গাড়ীর নীচে লাইনের মাঝখানে ঘাস বড় হয়ে উঠেছে, রেলের ওপর আর চাকার টায়ারে মরচে ধরে গেছে। মেজর নেলসন সতৃষ্ণ নয়নে কিছুক্ষণ গাড়ীখানার দিকে চেয়ে থাকেন। প্রত্যেকটা কামরা জিনিসপত্রে বোঝাই— ধীরে ধীরে তার ওপর ধুলো জমে উঠেছে।

মেজর নেলসন তলব করলেন ইয়ার্ড ফোরম্যানকে। অমল এসে সামনে দাঁড়ায়। মেজর সাহেব হুকুম দিলেন, "প্লেস দি এইচ. কিউ. স্পেশ্যাল ইন প্ল্যাটফরম নাম্বার থ্রি, ওয়েস্ট ট্রুপস সাইডিং এ্যাট ওয়ান্স—"

পয়েণ্টসম্যান রবীন মেজর সাহেবের সামনেই হাত নেড়ে বলে উঠল, "কি যাদু, দৌড় বুঝি ফুরিয়ে গেল? যত বড়াই বুঝি আমাদের কাছে?"

মেজর সাহেব রবীনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, হনহন ক'রে স্টেশনের দিকে চলে গেলেন। পয়েণ্টসম্যান মবারক বললে, "তা ছাড়া আর কি! ও শালারা তো এবার পালাবে ল্যাজ গুটিয়ে, আর মরব শালা আমরা!"

অমল রবীনকে বললে, "যাও রবীন, ট্যাংক স্পেশ্যাল থেকে ইঞ্জিনটা কেটে এক নম্বরে নিয়ে এস।"

রবীন আপন মনে গজ গজ করতে করতে চলল, "ট্যাংকগুলো আগে আন-লোড হলে ডাউন ট্রেনটা ছেড়ে দেওয়া যেত। তা না ও-শালাদের পালানোর বন্দোবস্তটাই হলো জরুরী!" ইঞ্জিনের কাছে গিয়ে তেড়ে উঠল, "চলো হে, এইবার কর্তাদের পালানোর ব্যবস্থা কর—"

সাণ্টার সামিন বললে, "তার মানে?"

"মানে আর কি! এঁরা তো পড়ছেন কেটে, এইবার মর শালা যত হাভাতের দল। চলো, সব ছেড়ে এখন ওঁদের এইচ. কিউ. স্পেশ্যাল প্লেস ক'রে আসি—"

ইঞ্জিন কেটে এক নম্বর লাইনের মধ্যে ঢুকে রবীন ফুট প্লেটের ওপর লাফিয়ে উঠে বললে, "শালারা না যদি পারে, ছেড়ে দিক না—আমরা ওই জাপানীদের খতম ক'রে দিচ্ছি। তা না, এই রকম একটা অবস্থায় আমাদের হাতে রাইফেল স্টেনগান তো দূরের কথা, একটা ডাণ্ডাও শালারা দিলে না! বেঘোরে প্রাণটা যাবে আর কি—"

আমিনের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করলে, "জাপানীরা এসে পড়েছে নাকি?"

রবীন খেঁকিয়ে ওঠে, "আসবে না তো কি, বসে থাকবে নাকি?"

রবীনের দিকে চেয়ে কথা বলার ফলে, আমিন সিগন্যাল লক্ষ্য করতে পারে নি। পাইলট ইঞ্জিনটা প্রায় রেকটার ওপর এসে পড়েছে। সামনে দাঁড়িয়ে অমল, মবারক আর সিরাজ হা হা ক'রে চিৎকার ক'রে উঠল। আমিন সমস্ত ভ্যাকুয়াম ডাউন ক'রে দিলে। তবুও ইঞ্জিনটা গড়িয়ে গিয়ে রেকটায় ধাক্কা মারলে।

অমল আঁতকে উঠল, "সর্বনাশ!" এক নম্বর লাইনে একটা ওয়াগন গড়ালে যেখানে রোখা যায় না, সেখানে মালভর্তি কুড়িখানা বগির একখানা রেক ঠেকাবে কি ক'রে! রেকটা গড়াতে শুরু করেছে, ধীরে ধীরে যেন তার গতি বেড়ে উঠছে। সকলে থতমত খেয়ে গেছে, অমল হাঁ ক'রে রেকটার দিকে চেয়ে আছে, আর সেটা দুলতে দুলতে গড়িয়ে চলেছে মেইন ইয়ার্ডের দিকে! মেইন ইয়ার্ডে তখন সান্টিং হচ্ছে।

সিরাজ বলে উঠল, "কি হবে অমলবাবু?"

অমল নিজেকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "রবীন, পয়েন্ট বানাতে বানাতে চলে যাও মেইন ইয়ার্ডে—ওদের সান্টিং বন্ধ করতে বলো। সিরাজ, তুমি চলে যাও ব্রেকে, জোরসে হ্যাণ্ড ব্রেক লাগাও।"

সিরাজ বললে, "ব্রেক ভ্যানের হ্যাণ্ড ব্রেকগুলো যে ধরে না—"

অমল চিৎকার ক'রে উঠল, "উপায় নেই সিরাজ, এ গাড়ী আমাদের থামাতেই হবে। যদি কোন এ্যাকসিডেন্ট হয় এই গাড়ীতে, তাহলে আমাদের জাপানী-চর বলে গুলি ক'রে মারবে।"

সিরাজ চলে গেল, অমল মবারককে বললে, "আমি এক কাজ করি মবারক, ইঞ্জিনের কাউক্যাচারে উঠে দেখি কাপলিংটা লাগানো যায় কি না—তুমি ইঞ্জিনে উঠে সিগন্যাল দাও।"

মবারক বললে, "আমি কাউক্যাচারে উঠছি, আপনি ইঞ্জিনে উঠুন।"

পাইলট ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে—ব্রেকটার অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছে। মবারক কাপলিং হুক ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। অমলের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, বললে, "আর ছ' ইঞ্চি আমিন—খুব সাবধান—আর যেন বাম্প না লাগে—"

আর একটু স্পীডের দরকার। আমিন লিভারটা আর একটু তুলে ধরে—ছোট্ট একটা ঝাঁকানি দিয়ে ইঞ্জিনটা ঝপ ক'রে এগিয়ে যায়— কাপলিঙে কাপলিঙে লাগে ঠোকাঠুকি। অমল ফুটপ্লেটের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস ক'রে, "লেগেছে মবারক ?"

কোন উত্তর এলো না—কেবল একটা আর্তনাদ মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল। আমিন পুরো ভ্যাকুয়াম ডাউন ক'রে দিয়ে উল্টো দিকে রেগুলেটার ঘোরাতে লাগল। রেক আর ইঞ্জিন খানিকটা ঝাঁকানি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ইঞ্জিনের সামনে দৌড়ে গিয়েই অমল আঁতকে ওঠে, "ও-ও-ওঃ—" তার সমস্ত শরীর ঠকঠক ক'রে কাঁপতে থাকে—চোখ দুটো কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসে—মবারকের দিকে খানিকটা এগিয়ে যায়—হাত দুটো বাড়িয়ে মবারককে ধরতে গিয়ে থমকে যায়—শূন্যে মেলা তার হাত দুটো ঝুলতে থাকে—বুজে আসা গলার মধ্যে থেকে একটা স্বর কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসে, "ম-বা-র-ক—"

আমিন নেমে এসেছে, ফায়ারম্যান দুজনও নেমে এসেছে। কাউক্যাচার, রেললাইন, স্লিপার, দুটি লাইনের মাঝখানের খোয়াগুলো লালে লাল হয়ে উঠেছে—ফিনকি দিয়ে তখনও রক্ত ছুটছে।

রবীন আর সিরাজ আনন্দে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে। রবীন চিৎকার ক'রে বলছে, "এ যাত্রা খুব বেঁচে গেছি অমলবাবু—"

রবীন এসে পাশে দাঁড়াতেই অমল তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চেপে ধরল—ফুঁপিয়ে সে কেঁদে উঠল—সমস্ত শরীরটা তার থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। ধীরে ধীরে রবীন অমলকে সরিয়ে দিলে—এগিয়ে গেল এক ধাপ, দু'ধাপ। মবারকের শরীরটা কেটে ছ'টুকরো হয়ে গেছে—হাত, পা, ধড়, সব মিলে মিশে তালগোল পাকিয়ে গেছে। খোয়ার ওপর রক্ত জমে উঠেছে দইয়ের মতো। রবীন আরও এগিয়ে গিয়ে বসল মবারকের কাটা মাথাটার সামনে। মবারকের চোখদুটো যেন তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। অতি সন্তর্পণে সে মাথাটা দুটি হাতের মধ্যে তুলে নিলে—নাড়া পেয়ে মাথা থেকে খানিকটা রক্ত ঝরঝর ক'রে ঝরে পড়ল।

পেছনদিকে মুখটা ঘুরিয়ে রবীন ডাকলে, "আয়রে সিরাজ—"

আমিন বললে, "অফিসারদের খবর না দিয়ে লাশে হাত দেওয়া কি ঠিক হবে রবীন?"

রবীন আমিনের মুখের ওপর চোখ দুটোকে স্থির রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। যেন আপন মনেই বলতে থাকে, "এঁ্যা ঠিক হবে না—মবারকের লাশে হাত দেওয়া ঠিক হবে না—আমাদের মবারক—" হঠাৎ সে এক লাফে এগিয়ে এলো আমিনের দিকে, উন্মত্তের মতো চিৎকার ক'রে উঠল, "আমাদের মবারকের লাশে হাত দেব কি না, তার হুকুম নিতে যাব ওই সব হারামির বাচ্চা অফিসারদের কাছে? সে শালা কুত্তার দল তো আর এক ডালকুত্তার মুখে আমাদের ছেড়ে দিয়ে পালাবার মতলব করছে।"

সিরাজ রবীনের হাত থেকে মবারকের মাথাটা নিলে। রবীন একটা একটা ক'রে মবারকের শরীরের টুকরো সিরাজের হাতে দিতে লাগল···

কোহিমার লড়াইয়ে ব্রিটিশ সেকেণ্ড ডিভিশন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বিশ্ববিশ্রুত সেকেণ্ড ডিভিশন, যারা জার্মানীকে উত্তর আফ্রিকায় ঘায়েল করতে পারে, যার মদগর্বিত পদভরে পৃথিবী টলমল করে, যার রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না—সেই অপরাজেয় ব্রিটিশ বাহিনী জাপানীদের হাতে কচু-কাটা হয়ে গেল।

ডিমাপুর যায় যায়। হেড কোয়ার্টার স্পেশ্যালের যাত্রী সংখ্যা প্রতিদিন বাড়তে থাকে—আর মালপত্তর ট্রেনে বোঝাই হতে থাকে। বড় বড় অফিসাররা ঘন ঘন এসে গাড়ীটাকে দেখে যান।

অকাদাকে ঘিরে ধরে ছেলেরা জিজ্ঞেস করে, "ঠিক ক'রে বলুন দাদা, আমাদের অবস্থাটা এখন কি? এ শালারা কি সত্যিই পালাবে?"

আকাদা বললেন, "সত্যি বলছি ভাই, এদের মতলব আমি কিছুই বুঝতে পারি না। তবে শেষ চেষ্টা আর একবার করবে বলে তো মনে হয়। আজ রাতে নাকি জিরো আওয়ার্স থেকে ফিফথ ইণ্ডিয়ান ডিভিশন আসতে শুরু করবে। ফোরটিনথ আর্মির কমাণ্ডার জেনারেল স্লিম বলেছেন, জাঙ্গল ফাইটিং ব্রিটিশ সোলজারদের কম্মো নয়—যদি কিছু করতে পারে তো ইণ্ডিয়ানরাই পারবে। অবশ্য আমাদের অফিসাররা একথা শুনে মুচকি হেসেছে—ব্লাডি ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা আবার লড়াই! অথচ দেখ ভাই, সেভেন্থ আর্মি তো ইটালি দখল করলে! জানিস, তার মধ্যে বারোয়ানা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান সোলজার।"

এ সংবাদে প্রাণে আশ্বাস জাগে না, উৎসাহ আসে না। জাপানের জয়ে প্রাণে আর উল্লাস জাগে না, ব্রিটিশের জয়ে তারা খুশি হয় না। বারবার মনে হয়, তারা যদি আজ স্বাধীন হতো, তাহলে স্ট্যালিনগ্রাডের মতো যুদ্ধ তারাও তো করতে পারত! আর কোহিমাকে বলছে কিনা ভারতের স্ট্যালিনগ্রাড! কিন্তু ভারতীয়রাই যেখানে পরাধীন—ভারতীয় সৈনিক যেখানে নিছক ভাড়াটে গুণ্ডা—সেখানে কোহিমার লড়াইকে স্ট্যালিনগ্রাডের সঙ্গে তুলনা করা মানে স্ট্যালিনগ্রাডের তাৎপর্যকে বিকৃত করা।

অকাদা ছেলেদের বারণ ক'রে দিয়েছেন, কোহিমার লড়াই নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে। কেমন যেন সন্দিগ্ধ একটা আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে। এরিয়া হেড কোয়ার্টারের দুজন ভারতীয় কেরানীর কোর্ট মার্শালে প্রাণদণ্ড হয়ে গেছে। তারা নাকি জাপানী-চরের কাজ করছিল।

অমলের মনে পড়ে, জয়ন্তর মুখে মেজর রায়ের ঘুঁষির কথা। মেজর রায়ও তো জয়ন্তকে জাপানী চর বলেছিলেন!

মনে পড়ে কোস্টাল ব্যাটারীর কোর্ট মার্শালের কথা। বারো জনের ফাঁসি আর দুজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর! তারা নাকি মাদ্রাজ উপকূল আক্রমণ করতে জাপানীদের সাহায্য করার ষড়যন্ত্র করেছিল!

আরও মনে পড়ে, টেরিটোরিয়াল ফোর্স সিকসটিনথ বেঙ্গল ব্যাটালিয়ানের ইতিহাস। প্রায় দু-হাজার বাঙালী ছেলের ওপর কি অমানুষিক নির্যাতন এরা করেছে! ভারতের সীমানার মধ্যে রাখার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ভারতের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অন্যায় জুলুম চালিয়েছে। কিন্তু অন্নের কাঙাল এই ছেলেদের নোয়াতে পারে নি। দিনে বারোঘণ্টা পাহাড় কাটিয়ে, কাঁটা-পেরেকের ওপর খালি পায়ে ডবল মার্চ করিয়ে, আড়ালে ডেকে রিভলভারের ডগায় শাসিয়েও রাজি করাতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত ব্যাটালিয়ন ভেঙে দিয়েছে। তারাও কি ছিল জাপানী চর?

আগস্ট আন্দোলনের সময়ে বহু ভারতীয় সৈনিক জনতার ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেছে। তাদের সরিয়ে স্টেশনে স্টেশনে মোতায়েন করতে হয়েছিল ব্রিটিশ সৈনিক। গুলি করার হুকুম যে সব ভারতীয় সৈনিক মানে নি, তাদের ফাঁসি দিয়েছে, গুলি ক'রে মেরেছে। তাদের বিরুদ্ধেও সেই একই অভিযোগ—জাপানী চর!

আঘাতে আঘাতে শতচূর্ণ হয়ে ছেলেরা যেন একটু একটু ক'রে বুঝতে পারে, কী বিরাট এক ষড়যন্ত্রের ফাঁদে তারা এসে পড়েছে। ব্যক্তিগত অভাব

অনটনের বিরুদ্ধে প্রাণের বিনিময়ে লড়াই করতে এসে তাদের মধ্যে জাগে পরাধীনতার চেতনা। পরাধীনতা যে কত কদর্য, তা তারা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে। তাই একক মানুষগুলো ধীরে ধীরে বহুর সমষ্টিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। বুঝতে তারা পারে, বাঁচতে হলে এই ষড়যন্ত্রকে বাধা দিতেই হবে—প্রতিরোধ করতে হবে প্রতি পদে পদে।

নতুন ক'রে আবার সৈন্য আমদানি শুরু হয়ে গেছে। আবার সেই ট্রুপস স্পেশ্যাল একটার পর একটা—আসছে পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, বেলুচি, গাড়োয়াল, গুর্খা। উৎসাহ এদের মধ্যেও নেই, কিন্তু আছে যেন একটা দৃঢ় সংকল্প। যুদ্ধ এরা করে, প্রাণের মমতা না রেখেই করে; কিন্তু কার স্বার্থে, কি উদ্দেশ্যে, তা এরা জানে না।

ফিফথ ইণ্ডিয়ান ডিভিশন লড়াইয়ের মাঠে নেমেছে—লড়াই করতেই তারা নেমেছে। দুর্জয় জাপানের বীরত্বের মুখোশ খসে পড়তে লাগল—অজেয় জাপান পেছু হঠ্‌তে লাগল। ডিমাপুরের চেহারায় পরিবর্তন ঘটতে থাকে। হেড কোয়ার্টার স্পেশ্যাল থেকে অফিসারদের মালপত্তর খালাস হলো। তারপর একদিন খালি গাড়ীখানা পাণ্ডু ফিরে গেল।

অমল ভাবে, তবে মবারকের এমন ভাবে মরবার কি দরকার পড়েছিল। তবুও তো মবারক মরল—এই কি তার বিধিলিপি! নিছক দু-মুঠো অন্নসংস্থান করতে এসে, এ কি শোচনীয় ভাবে মবারক মরে গেল! তাতে কারই বা কি ক্ষতি হলো? কেবল তার যুবতী বউ আর শিশু পুত্রের রইল না কেউ। কিন্তু ভাবনা কি—খুনীরাই তো বড় দাতা! মেজর নেলসন দিয়েছেন পঞ্চাশ টাকা, আর গভর্নমেণ্ট দেবে মাসে ন-টাকা পেন্সন। তবে আর কি, মবারকের দাম তো উঠেই গেল!

পনেরো দিনের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাচ ক্যাম্পে ফিরে এল, রেকী স্কোয়াড ভেঙে দেওয়া হলো, টেকনিক্যাল ডিউটির ছেলেরা রানিং রুম ছাড়ল। এরিয়া হেড কোয়ার্টার থেকে লম্বা লম্বা বুলেটিন বার হয়—রোলকলে তার সমস্তটাই ছেলেরা খুশি মনে শোনে। কোহিমা থেকে জাপানীরা বিতাড়িত হয়েছে, ইম্ফলের অবরোধ গেছে ভেঙে। ফিফথ ডিভিশন তখন টিড্ডিমে ঢুকছে।

ফিফথ ইণ্ডিয়ান ডিভিশন এগিয়ে চলেছে—এগিয়ে চলেছে জয়ের নেশায়, বীরত্বের মোহে। বর্মা থেকে পালিয়ে আসার পথে যাদের বুকের ওপর দিয়ে তারা হেঁটে এসেছিল, সেই অভাগা সাথীদের স্মরণ ক'রে তারা এগিয়ে চলেছে। দুর্দম হয়ে উঠেছে তাদের পদক্ষেপ পিতৃপিতামহের অমর ঐতিহ্যের প্রেরণায়,

দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে তারা সৈনিকের মর্যাদায়, যে মর্যাদা দিতে ব্রিটিশ আজও অস্বীকার করে ; আজও তাদের বানিয়ে রাখে ভারতের দাসত্বকে কায়েম রাখার জন্যে দাস-বাহিনী করে।

ষোল

ক্যাম্প আবার জমজমাট। রিজার্ভ ব্যাচ আর রেকী স্কোয়াডের ছেলেরা প্যারেড আর ফেটিগ শুরু করেছে। বিমর্ষ মুখে তারা ভাবে, কোহিমা সংকটের দিনগুলোর কথা।

রেলের কাজ তখনও পুরোদমে চলেছে, কিন্তু এত লোক ফালতু হওয়া সত্ত্বেও বারো ঘণ্টা ডিউটিই বহাল আছে। মণিপুর রোড থেকে পাণ্ডু পর্যন্ত ডবল লাইনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এইবার ফিফথ ইণ্ডিয়ান ডিভিশনকে শুধু রসদ যুগিয়ে যেতে হবে। তাই আসছে পল্‌টন—চীনডুইন নদী পার হতে হবে। আসছে ব্রিজিং পার্টস—ডিমাপুর থেকে ইম্‌ফল সমস্ত রাস্তাটা ডবল করতে হবে। আসছে টেলিগ্রাফের তার আর পোস্ট, অসংখ্য ট্রাক, খচ্চর আর অপর্যাপ্ত পেট্রোল।

অমল ওয়েস্ট ইয়ার্ডে সকালের শিফটে ডিউটি—সমস্ত শরীর দিয়ে তার দরদর ক'রে ঘাম ঝরছে, মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছে, তবুও এক মুহূর্তের অবসর নেই। পেট্রোল সাইডিঙে লোড প্লেস করতে হবে, ট্রান্সপোর্টেশন সাইডিঙে প্লেস করতে হবে সমস্ত পনটুন, গ্রেফ সাইডিঙে বুলডজার, স্টোরস সাইডিঙে টেলিগ্রাফ লোড। তিনখানা ডাউন ট্রেন এডভারটাইজ হয়ে আছে, রাঙাপাহাড় মার্শালিং ইয়ার্ডে যাবে সমস্ত ব্রিজিং পার্টস নিয়ে একখানা সাটল, আর হসপিটাল সাইডিঙ থেকে যাবে এ্যাম্বুলেন্স স্পেশ্যাল।

রাগে, ক্ষোভে অমলের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে, এত কম লোক দিয়ে কি এত কাজ সম্ভব! অথচ ক্যাম্পে লোক বসিয়ে রেখে ঘাস ছেঁড়াচ্ছে! জয় সম্বন্ধে কি এরা এতই নিশ্চিত! রাশিয়া যদি আজ জার্মানিকে খায়েল করতে না পারত, তাহলে জাপানকে পেছু হঠানোর ক্ষমতা কি এদের হতো?

সাদেক লুজসাণ্ট করেছে—একটা ওয়াগন গড় গড় ক'রে গড়িয়ে যাচ্ছে—বাম্‌ম্‌! বাষ্পের শব্দ হলেই অমল চমকে ওঠে, তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে

রক্তে মাথামাখি মবারকের টুকরো টুকরো দেহ—তাজা লাল রক্তের ওপর তার বিস্মিত চোখ দুটো।

মার্শালিং ইয়ার্ডের ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল অনন্ত। অমলকে কাছে ডেকে বললে, "একটা জবরদস্ত খবর আছে অমল—"

"কি ব্যাপার ?"

অনন্ত বলতে লাগল, "কালকে মকবুল একখানা টেলিগ্রাম পেয়েছে, তার বৌয়ের অবস্থা খুব খারাপ। আঠারো মাস সে ছুটি পায় নি। বললে ছুটি আমাকে করিয়ে দিতেই হবে। খগেন বললে, হাবিলদার মেজর থেকে সুবেদার, সব শালাকে পাকড়াও কর—ও. সি-র কাছে তোমাকে পেশ করবে। কাল বিকেল থেকে মকবুল এদের প্রত্যেকের কাছে ধর্ণা দিয়েছে—কিন্তু তাতে কোন ফলই হয় নি। হাবিলদার মেজর বলেছে, চার্জশীট ছাড়া কাউকেও পেশ করি না। জমাদার সাহেব বলেছেন, আমার কথা আর কে শুনছে! আর সুবেদার সাহেব তো ধমক-ধামক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

অমল বলে উঠল, "তা এঁদের মেজাজটা এত গরম কেন ?"

"কি জানি ভাই, শালারা আক্রোশে যেন ফেটে পড়ছে। তারপর মকবুল এসে সমস্ত খবর জানাতে, বসে গেল আমাদের কমিটি। পাঁচকড়ি তখন মতলবটা দিলে ; প্যারেডে নামবার সময় মকবুল ফল্‌ইন না করে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে—হাবিলদার মেজর যখন ধমক-ধামক শুরু করবে, তখন মকবুল সমস্ত কথা চেঁচামেচি ক'রে বলবে—সেই ফাঁকে আমরাও লাইনের মধ্যে থেকে হৈ চৈ শুরু করে দেব। দেখি শালারা পেশ করে কিনা!

"হলোও ঠিক তাই। প্যারেড ফল্ ইনের সময় মকবুল বললে, আমাকে মেজর সাহেবের কাছে পেশ না করলে আমি ফল্ ইন করব না—তাতে আমার জানই যাক আর যাই হোক। প্রথমটা হাবিলদার মেজর মিঠে কথায় বোঝাতে লাগল, এই সব ছুটিছাটা বাজে ব্যাপারে মেজর সাহেবের কাছে গেলে, তিনি ভীষণ চটে যান।

"প্ল্যান আমাদের তৈরিই ছিল। একজন লাইনের মধ্যে থেকে বলে উঠল, আর চার্জশীটে পেশ করলে বুঝি খুব খুশি হন ? আর একজন বললে, একজনের বৌ মরে যাওয়াটা বুঝি বাজে ব্যাপার হলো ? এমনি ক'রে একটা দুটো কথা থেকে রীতিমত একটা হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। হাবিলদার মেজর মুখচোখ লাল ক'রে মকবুলকে বললে, ভালো চাও তো ফল্ ইন কর বলছি। মকবুল কোন জবাব দেওয়ার আগেই অনেকে মিলে চিৎকার ক'রে উঠল—না, কিছুতেই ফল্-

ইন করবে না। সুবেদার সাহেব আশেপাশে কোথায় যেন ছিলেন। হঠাৎ দৌড়ে এসে মকবুলের হাতটা টানতে টানতে নিয়ে গেলেন কোয়ার্টার গার্ডে। কেমন যেন হাওয়াটা থমথমে হয়ে গেল, ছেলেরাও কেউ আর কোন কথা বললে না।"

অমল বললে, "তারপর ?"

"তারপর চার্জশীট বানিয়ে সুবেদার সাহেব মকবুলকে ও· সি-র কাছে পেশ করলেন। অর্ডারলি-রুমে মকবুল সমস্ত কথা বলে দেয়। মেজর সাহেব মকবুলকে সাত দিনের মাইনে ফাইন করেছেন বটে, কিন্তু ছুটিও দিয়েছেন ; শুধু মকবুলকে একা নয়, সেই সঙ্গে আরও প্রায় কুড়ি জনকে।"

অমল লাফিয়ে উঠল, "তবে ? ভেব না যেন দয়া ক'রে ছুটি দিয়েছে।"

ডিউটি থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অমলের ডাক পড়ল হাবিলদার মেজরের ঘরে। অমল গিয়ে হাজির হতেই তিনি যেন আপ্যায়িত ক'রে ডাকলেন, "আসুন অমলবাবু, ডিউটি থেকে ফিরলেন নাকি ?

অমল বললে, "আমি বড্ড ক্লান্ত—একটু বসতে পারি কি ?"

"আরে বসুন বসুন, সেই জন্যেই তো আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আপনারা তো আমাকে শত্তুর মনে করেন—কিন্তু শত হলেও আমি একটা মানুষ তো বটে ! আপনাদের ভালোমন্দের কথা ভাবা আমার কর্তব্য—" একটা ক্যাম্পটুল্ তিনি অমলের দিকে এগিয়ে দিলেন।

অমল বসে পড়ল। হাবিলদার মেজর আবার শুরু করলেন, "তা আজ প্রায় ছ'মাসেরও ওপর হয়ে গেল, একটানা রেলওয়ে ডিউটি করছেন, শরীরটাতো দেখছি খুবই খারাপ হয়ে গেছে। আমি মেজর সাহেবকে বলেছি। কাল থেকে আপনাকে আর রেলওয়ে ডিউটিতে যেতে হবে না—ক্যাম্পে থাকবেন, একটু-আধটু পি টি· প্যারেড করবেন—ব্যস্, বাকী সময়টা আপনার রেস্ট—"

অমল হাসি চেপে বললে, "আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ !"

হাবিলদার মেজরের খুশিখুশি মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল। তবুও মোলায়েম সুরে বললেন "আর কি, এইবার তো সব বাড়ীতে ফিরবেন, লড়াই তো শেষ হলো বলে। কোম্পানির ছেলেরা খুব খুশি, না ?"

অমল বললে, "এই জন্যেই বোধহয় আমাকে ডেকেছেন ? আচ্ছা, আমি সত্যি কথাই বলছি। এভাবে যদি কোম্পানি আর কিছু দিন চলে তাহলে যে-কোন মুহূর্তে একটা গণ্ডগোল বেঁধে যেতে পারে।"

"কেন ?"

"কেন, সে কথা আপনি বোধহয় আমার চেয়েও ভালো জানেন।"

"কিন্তু যত দোষ, সবই কি আমার? আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখছেন না—আমাকেও তো চাকরী বজায় রাখতে হবে—আমি তো নিছক হুকুমের দাস—"

"সে তো বটেই—" অমল উঠে দাঁড়াল।

হাবিলদার মেজর বললেন, "তাহলে গণ্ডগোল আপনারা করবেনই?"

অমল ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, "একথা আমি একবারও বলি নি। গণ্ডগোল করতে কেউই চায় না—কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে—"

"কার কার সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, তাদের নামটা একবার শুনি?"

অমল হেসে বললে, "আপনার পাত্র নির্বাচন খুব ভুল হয়েছে স্যার—ঠিক ও-জাতের লোক আমি নই—"

হাবিলদার মেজর বললেন, "কিন্তু আপনি কেন বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছেন অমলবাবু! অফিসারদের কানে পর্যন্ত পৌঁচেছে, আপনিই হচ্ছেন ছেলেদের লীডার। এ আর মেজর ব্রাউন নয় যে, জয়ন্তর মতো আপনাকেও ট্রান্সফার ক'রে দেবে—নির্ঘাত একটা কোর্ট মার্শাল ক'রে আপনার জীবনটাই হয়তো নষ্ট ক'রে দেবে। লাভ কি অমলবাবু, এই সব অশিক্ষিত ছোট লোকদের নিয়ে নাচানাচি ক'রে? তার চেয়ে আমাদের সঙ্গে—"

অমল ফস্ ক'রে বলে উঠল, "আপনি যদি হুকুম করেন, আপনার লেকচার আমি শুনতে বাধ্য। কিন্তু আপনার হুকুমে আমার মন বদলাবে না—" অমলের মুখের দিকে হাবিলদার মেজর ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকেন! অমল বললে, "এবার আমি যেতে পারি কি?"

হাবিলদার মেজরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, "আচ্ছা—যান—"

সন্ধ্যের পর ক্যাম্পের সমস্ত ছেলে এসে জড় হয় ক্যান্টিনে। ছোট ছোট দলে এসে ইউরোপের বড় ম্যাপটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে—লাল ফৌজ কতদূর এগোলো—বার্লিন আর কতদূরে!

'বাঙলায় খবর বলছি' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে থাকে এসে ভেঙে পড়ে কাউণ্টারটার ওপর—মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকে রেডিওটার দিকে—রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনতে থাকে পৃথিবীজোড়া মানুষের ফ্যাশিস্ট বর্বরদের বিরুদ্ধে অভিযান। লাল ফৌজ জার্মানদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছে রাশিয়ার শেষ সীমান্তে—প্রবেশ করেছে রুমানিয়া আর পোল্যাণ্ডের মধ্যে—সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তা ধরে এগিয়ে

চলেছে বার্লিনের পথে। ব্রিটিশ আর আমেরিকানরা উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ শেষ ক'রে ইতালি দিয়ে এগিয়ে আসছে খাস জার্মানির দিকে। প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকানরা কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করছে। বর্মায় ফিফ্‌থ ইণ্ডিয়ান ডিভিশন ফোর্ট হোয়াইট দখল ক'রে এগিয়ে চলেছে মান্দালয়ের দিকে।

খবর বলা শেষ হয়। ছেলেরা ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়ে—গোল হয়ে হিসেব করতে বসে, আর কতদিন! আশায়, আনন্দে মন নেচে ওঠে, বুক ভরে যায়—মুক্তির পথে তারা পা বাড়িয়েছে। লাল ফৌজ এগিয়ে চলেছে বার্লিনের দিকে—তাদের চলার পথে বুক ভরা দরদ ঢেলে দেয় লক্ষ যোজন দূরে বসে এই মুক্তিকামী মানুষগুলো। মুক্তির প্রতীক লাল ফৌজ—জীবনে তাদের এনেছে আশা, উৎসাহ, উদ্দীপনা। তারাও যেন চলতে থাকে লাল ফৌজের সঙ্গে কার্পেথিয়ান পর্বত ডিঙিয়ে, দানিয়ুব পার হয়ে, ওয়ারশ-র ওপর দিয়ে দুর্মদ পদক্ষেপে বার্লিনের দিকে। বার্লিন! বার্লিন দখল হয়ে গেলেই যুদ্ধ শেষ—তাদের মুক্তি—সৈনিক জীবনের অবসান! আবেগে উচ্ছ্বাসে তাদের বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে। তারাও তাহলে বাঁচবে! আবার তারা বাড়ী ফিরবে!

রোলকলের হুইসিস্ পড়লে মাঠ থেকে উঠে গিয়ে ছেলেরা অলস মন্থর গতিতে রোলকলে দাঁড়ায়। হাবিলদার মেজর ঘোষণা করলেন, "কাল সকালে রুট মার্চ—মার্চ অফ্ সাড়ে পাঁচটায়।"

পাঁচকড়ি লাফিয়ে উঠল, "তার মানে আবার টাইট দিতে শুরু করেছে। মকবুলের ব্যাপারটায় দাদারা মনে বড় দাগা পেয়েছেন। সেই জন্যেই বোধহয় তোমাকেও ডিউটি থেকে সরিয়ে নিল অমল।"

অমল বললে, "বোধহয় তাই—"

পরদিন সকালে একখানা ক'রে পুরি আর এক মগ চা খেয়ে কোম্পানির সমস্ত প্যারেডওয়ালা ছেলে মার্চ করল। সামনে হাবিলদার মেজর, তাঁর পেছনে তিনটি স্কোয়াড—প্রতি স্কোয়াডের সামনে একজন ক'রে হাবিলদার স্কোয়াড-কামাণ্ডার স্টেপিং দিচ্ছে, লেফট—রাইট—লেফট—ঝপ ঝপ ঝপ ক'রে একই তালে পা পড়ছে। শব্দের মাদকতায় ছেলেরা নেশাতুর হয়ে উঠেছে—শ'খানেক ছেলে একটা মানুষের মতো এগিয়ে চলেছে—দু'নম্বর স্কোয়াড কামাণ্ডার হাবিলদার সরকার বললে, "তোমরা গান ধর, তাহলে স্টেপিং আরও ভালো হবে।" সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল গানের সুর, "জিন্দেগী হ্যায় প্যারসে—প্যারসে বিতায়ে যাও—"

দু'ধারে ঘন জঙ্গল, তার মাঝ দিয়ে নতুন তৈরি পথ—পীচ ঢালা রাস্তা। সবক'টা বুটের আওয়াজ যেন একটি আওয়াজ হয়ে দূর থেকে দূরান্তরে ঘন সবুজ

বনানীর প্রান্ত থেকে প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। সকালের সূর্যের মিঠে রোদ কোথাও কোথাও গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়ী রাস্তার ওপর এসে পড়েছে। দু'নম্বর স্কোয়াডের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এক আর তিন নম্বর স্কোয়াডও গান ধরেছে। গানের লহরে লহরে, পায়ের তালে তালে, শরীরের রক্তও যেন নাচতে শুরু করেছে। সৈন্যদল তখন একটা খাড়াই-এর ওপর উঠছে। হঠাৎ হাঁক এলো, "কোম্পানি—হলট—"

একটি আওয়াজে তিনটি স্কোয়াড দাঁড়িয়ে পড়ল। হাবিলদার মেজর স্কোয়াড কমাণ্ডারদের ডাকলেন। ছেলেরা গুঞ্জন ক'রে ওঠে, "শুধু শুধু হলট্ করালে কেন? বেশ তো চলেছিলাম—বড় ভালো লাগছিল।"

হাবিলদার সরকার ফিরে এসে বললে, "তোমরা কেউ গান গেয়ো না।"

একজন জিজ্ঞেস করলে, "কেন হাবিলদার সাহেব?"

"হাবিলদার মেজর সাহেব বারণ করেছেন—"

"ইস্, বারণ করলেই হলো!"

আবার চলার হুকুম হয়—ছেলেরাও চলতে থাকে। কিন্তু স্টেপিং আর মিলতে চায় না। স্কোয়াড কমাণ্ডাররা তারস্বরে স্টেপিং হেঁকে চলে, "লেফট্—রাইট—লেফট—" হাবিলদার মেজর একটা টিবির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের পা লক্ষ্য করছেন আর তাড়া দিচ্ছেন, "কদম মিলাও।" কদম তাতেও মিলতে চায় না। বেতালা বেথাপ্পা পা পড়ছে, মাঝে মাঝে পা ঘষড়ে চলার শব্দ হচ্ছে—সে যেন এক বিশ্রী ব্যাপার! ক্ষিপ্তের মতো হাবিলদার মেজর হুংকার দিয়ে উঠলেন, "কোম্পানি, ডবল—মার্চ—"

ক্ষণেকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে সবক'টি ছেলে দৌড়তে শুরু করল, অসম তালে, যথেচ্ছ পদক্ষেপে। প্রায় পঞ্চাশ গজ দৌড়নোর পর থামবার হুকুম হলো। ছেলেরা দাঁড়াল—কোন লাইন নেই—ফাইল নেই—ড্রেসিং নেই—যে যেভাবে পেরেছে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। সন্তোষ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল, "দেখি কত মুরোদ ওর, কেমন ক'রে স্টেপিং মেলায়।"

খগেন জোরে বলে ওঠে, "স্টেপিং আর মিলছে না বাছাধন, যতই ডবল করাও আর হামাগুড়ি দেওয়াও!"

অনন্ত বললে, "বেটা মনে করেছে কি? গান হলো রুট মার্চের একটা অঙ্গ—আর উনি চান নিয়মটাই বদলে দিতে!"

সাদেক বললে, "বলুন অমলবাবু, শালাকে আজ মালুম করিয়ে দিই—"

অমল থপ ক'রে সাদেকের কব্জিটা চেপে ধরে। হাবিলদার মেজর দৌড়ে ওদের সামনে এসে হাঁকলেন, "রাইট টার্ন—রাইট ড্রেস—" পাগুলো ঘষতে ঘষতে ছেলেরা ট্যারা-বাঁকা হয়ে দাঁড়াল, ডান হাতটা কিছুটা ওপরে উঠে যেন শূন্যে ঝুলছে—ঘাড়টা ডাইনে না ফিরে, কেবল কাৎ হয়ে আছে।

হাবিলদার মেজর হাঁকলেন, "আইজ ফ্রন্ট—" হাতগুলো উরুর ওপর থপাস ক'রে পড়ে গেল, আর মাথাগুলো সামনের দিকে ফিরল, শির টেনে ধরা ঘাড় বেঁকানোর মতো।

একটু উঁচু একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে হাবিলদার মেজর বললেন, "তোমরা যদি মনে ক'রে থাক, এইভাবে আমাকে জব্দ করবে—তাহলে আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা খুব ভুল করছ। কয়েকটা চ্যাঙড়া ছোঁড়ার মতলব শুনে আমার সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা করো না। বিপদে পড়বে তোমরা যারা নির্দোষ। কাউকেও আমি ছেড়ে কথা কইব না। যতদিন আমার কব্জিতে এই ক্রাউন আছে আর মেজর নেলসন এই কোম্পানিতে আছে, ততদিন আমি যা হুকুম করব, তাই তোমাদের শুনতে হবে।"

ছেলেদের মাঝখান থেকে কে যেন বলে উঠল, "দূর শালা কুত্তা—"

হাবিলদার মেজরের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে, কি যেন একটা বলতে গিয়ে তখনই ঢোক গিলে নেন। দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত ছেলেদের ওপর বারেক চোখ বুলিয়ে নিয়ে হেঁকে ওঠেন, "লেফট টার্ন—কুইক মার্চ—"

হুড়মুড় ক'রে ছেলেরা হাঁটতে শুরু করেছে। হাবিলদার মেজর দৌড়ে সামনে চলে যান। স্কোয়াড কমাণ্ডাররা বার কয়েক স্টেপিং দিয়ে চুপ ক'রে যায়। একটা কিছুর আশঙ্কায় সবক'টি ছেলে গুম হয়ে আছে। কিছু দূর যাওয়ার পর হুকুম এলো, "কোম্পানি—লেফট্ হুইল—"

বাঁক খেয়ে এক নম্বর স্কোয়াড এগিয়ে চলেছে, নেমে চলেছে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে—আর কিছু দূরে নামলেই পচা জলের ডোবা। পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে নামছে—পায়ের ধাপ একটু অসাবধান হলেই পড়ে যাচ্ছে। হাবিলদার মেজর অনর্গল হেঁকে চলেছেন, "লেফট্—রাইট—লেফট্—"

খগেন দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "ওই পাঁকের মধ্যে নামাবে নাকি!"

অনন্ত বললে, "আমি জানতাম, ও শালা অত সহজে ছাড়বে না।"

সাদেক অমলের হাতটা চেপে ধরে বললে, "আমরা কেউ জলে নামব না অমলবাবু—"

অমল বললে, "কিছুতেই না— তাতে যা হয়, হবে।"

এক নম্বর স্কোয়াড নেমে চলেছে—প্রথম সারির তিনটি ছেলে বারবার পেছন ফিরে চাইছে। ভিজে মাটিতে তাদের পা পড়েছে, বুট একটু একটু ক'রে বসে যাচ্ছে। মাঝের ছেলেটি পেছন দিক চেয়ে সামনে পা ফেলতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সাদেক আঁতকে উঠল, "অমলবাবু!"

সঙ্গে সঙ্গে অমল্ হেঁকে উঠল, "হলট্—"

সমস্ত ছেলে দাঁড়িয়ে পড়ে পেছনে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। হাবিলদার মেজর স্বরটাকে লক্ষ্য ক'রে ছুটে এলেন, "কে, কে হলট্ বললে?"

লাইনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে অমল বললে, "আমি।"

হাবিলদার মেজর অমলের একটা হাত চেপে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, "তুমি হলট্ বলার কে?"

সাদেক এক লাফে অমলের পাশে এসে বললে, "খবরদার, গায়ে হাত তুলেছ কি তোমার দফা আজ শেষ—হাত ছেড়ে দাও বলছি—"

হাবিলদার মেজরের হাত থেকে অমলের হাতটা খসে পড়ল। সমস্ত ছেলেরা ওদের ঘিরে ধরেছে। হাবিলদার মেজরের মুখখানা ঘেমে উঠছে, উত্তেজিত ছেলেদের দিকে তিনি ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে আছেন।

সাদেক বলে উঠল, "মনে করেছ কি? আমরা তোমার বেগারী নাকি?"

অনন্ত বললে, "আমরা স্যাপার হতে পারি, কিন্তু মানুষ হিসেবে আপনার চেয়ে কোন অংশে নীচে নই!"

বার কয়েক ঢোক গিলে হাবিলদার মেজর সামনে পেছনে চারপাশে কি যেন চেয়ে চেয়ে দেখলেন। একটু দূরে দেখতে পেলেন স্কোয়াড কমাণ্ডার তিনজন খুব উত্তেজিতভাবে কি যেন আলোচনা করছে। তিনি ফিরে অমলের মুখের ওপর চোখ রেখে বললেন, "তা তোমরা কি চাও?"

সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত বলে উঠল, "আমরা চাই মানুষের মতো ব্যবহার।"

হাবিলদার মেজর ফিক ক'রে হেসে বললেন, "ও কথা আমাকে বলে কোন লাভ নেই অনন্ত—পরাধীন জাত কোনদিন মানুষের মতো ব্যবহার পেতে পারে না—ও কথা মেজর নেলসনকে বলো।"

ছেলেরা কেমন যেন ভ্যাবাচাকা মেরে যায়—তারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে। হাবিলদার মেজর মোলায়েম স্বরে বললেন, "বেশ তো তোমরা যদি ম্যানুভ্যারিং করতে না চাও, তাহলে আর সামনে যেও না। কিন্তু এইটাই ছিল আজকের প্রোগ্রাম—"

পেছন থেকে একজন বলে ওঠে, "সব মিছে কথা। শালা শয়তান, বেকায়দায় পড়ে এখন ভালো মানুষ সাজছে।"

চকিতে পেছনে একবার দেখে নিয়ে হাবিলদার মেজর বললেন, "কি করব বলো! দোষ আমার নয়—দোষ আমার র‍্যাংকের। যাক, এখন তোমরা কি করতে চাও, তাই বলো ?"

সাদেক বললে, "আমরা মার্চ করার সময় খুশি মাফিক গান গাইব—"

হাবিলদার মেজর হেসে বললেন, "বেশ তো, রুট মার্চ করার সময় গান গাওয়ার তো নিয়মই আছে। আমি কি এর আগে কখনও বারণ করেছি ? কিন্তু আজ যে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল ম্যানুভারিং—"

একজন ভেঙচে উঠল, "ওঃ, কি আমার ভিজে বিড়ালটিরে! ম্যানুভার ট্যানুভার সব বাজে কথা—আসল কথা আমাদের ওপর মেজাজ ফলানো—"

হাবিলদার মেজর বললেন, "যাক, আর সময় নষ্ট ক'রে দরকার নেই। অনেক বেলা হয়ে গেছে, রোদ চড়ছে। চলো আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাই।"

নাচতে নাচতে লাফাতে লাফাতে ছেলেরা ফল্ ইন করলে। মার্চ করতে শুরু ক'রে ছেলেরা বুকের সমস্ত জোর ঢেলে দিয়ে গেয়ে উঠল :

জিন্দেগী হ্যায় প্যারসে—প্যারসে বিতায়ে যাও।
জিন্দেগী হ্যায় কওমকি—কওমসে বিতায়ে যাও।

পরদিন সকালে অর্ডারলি এন. সি ও. অমলের নাম হেঁকে গেল, "দশ বাজে দফতরমে হাজির।"

ক্যাম্পময় রাষ্ট্র হয়ে গেল, অমলের নামে হাবিলদার মেজর চার্জশীট করেছে।

চাপা একটা উত্তেজনা সমস্ত ক্যাম্পটার মধ্যে গর্জে গর্জে উঠছে। স্কোয়াড ড্রিলে তাল কেটে যায়, ডাইনে ঘুরতে ছেলেরা বাঁয়ে ঘুরে বসে। হাবিলদার সরকার হতাশ হয়ে অবশেষে পাঁচ মিনিটের ব্রেক অফ্ দিয়ে দেয়। সাদেক হাবিলদার সরকারকে বললে, "আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে হাবিলদার সাহেব, আপনি তো কাল সবই নিজের চোখে দেখেছেন।"

হাবিলদার সরকার আমতা আমতা ক'রে বললে, "সে ক্ষমতা আমার নেই সাদেক—"

সকালের প্যারেড শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খানার হুইসিল পড়ল। কিন্তু মগ প্লেট হাতে নিয়ে ছেলেরা লঙ্গরের দিকে দৌড়োয় না—ছোট ছোট দলে জটলা

পাকাতে থাকে। অনন্ত বললে, "কি করা যায় এখন—অমলকে তো নিশ্চয়ই ফাঁসাবে।"

পাঁচকড়ি দাঁত কড়মড় ক'রে ওঠে, "আমার ইচ্ছে করছে, ওই শালা হাবিলদার মেজরের মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিই।"

খগেনের হাত দুটো নিশপিশ করছে—অসহায়ভাবে সে সাদেকের দিকে চাইলে। সাদেক বললে, "অমলবাবুকে ফিরিয়ে না এনে আমরা কেউ খেতে যাব না।" জমায়েত ছেলেদের মধ্যে থেকে সম্মতি গর্জে উঠল, "চলো সকলে দফতরে—অমলবাবুকে কোন শাস্তি দেওয়া চলবে না।"

অফিসের আশেপাশে ধীরে ধীরে ভিড় বেড়ে ওঠে—ছোট ছোট দলে জটলা চলতে থাকে। সুনীল বললে, "কিন্তু এতে কি কোন লাভ হবে? এ তো মিউটিনীর মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে!"

সাদেক তেড়ে ওঠে, "তবে কি নেলসনকে বাপ ডেকে তার পা জড়িয়ে ধরে বলব, হুজুর, ধর্মাবতার, গরীবের মা-বাপ, অমলবাবুকে ছেড়ে দাও। আর অমনি ওই চকচকে ব্রাউন বুটের ঠোক্কর খেয়ে গালে হাত বুলোতে বুলোতে এসে বলব, নেলসন সাহেব মানুষ নয় রে—একেবারে দেবতা। ওসব কুত্তাপনা আর চলবে না। আজ সাফ কথা, যদি অমলবাবুকে ছাড়িয়ে আনতে না পারি, তাহলে এই শালারা বুটের ডগায় আমাদের টিপে টিপে মারবে।"

ছোট ছোট দলগুলো ক্রমশই কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে আসছে—তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা রীতিমত একটা সোরগোলের সৃষ্টি করেছে। হাবিলদার মেজর অফিসঘরের জানলায় এসে দাঁড়ালেন। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল, "ধরে নিয়ে আয় শালা কুত্তাকে—"আর একজন আক্ষেপ করতে থাকে, "কাল শালা ঠেলায় পড়ে কেমন ভেজা বেড়ালটি সেজেছিল! ঘা কতক না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া খুব ভুল হয়েছে।"

কিছুক্ষণের মধ্যে চারজন রাইফেল সেন্ট্রি মার্চ ক'রে অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। গার্ড কমাণ্ডার অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রচুর হাঁক ডাক ক'রে এক এক দরজায় দুজন ক'রে সেন্ট্রি মোতায়েন ক'রে দিলে; চিৎকার ক'রে বললে, "অফিসের দশহাতের মধ্যে কেউ এলেই সোজা তার ওপর ফায়ার করবে—" তারপর কটমট ক'রে জমায়েত ছেলেদের দিকে চেয়ে দেখে হনহন ক'রে কোয়ার্টার গার্ডের দিকে চলে গেল।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি ছেলে একজন সেন্ট্রিকে বললে, "কিরে আমাদের গুলি করবি নাকি?"

সেন্টি মুচকি হেসে রাইফেলের ওপর থেকে বুড়ো আঙ্গুলটা দেখালে। ছেলেরা হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

একটু পরে স্থবেদার সাহেব এসে দরজায় দাঁড়ালেন। তাঁর পেছন থেকে অফিসের কেরানী হাবিলদাররা উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে। স্থবেদার সাহেব মাঠে নেমে একজন সেন্ট্রির পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা এখানে ভিড় করেছ কেন?"

অনেকে একসঙ্গে বলে উঠল, "আমরা অমলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাব—"

স্থবেদার সাহেব বললেন, "তোমরা কি ভুলে গেছ যে, তোমরা এখনও মিলিটারীতে আছ!"

সাদেক বলে উঠল, "মিলিটারীতে আছি বলে তো আর কেনা গোলাম হয়ে যাই নি?"

মেজর সাহেবকে দরজার গোড়ায় দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট্রিরা ভিড়ের দিকে রাইফেল ঘুরিয়ে 'অন-গার্ড' পজিশনে দাঁড়াল। মেজর সাহেব নেমে এলেন স্থবেদার-সাহেবের পাশে, আর তাঁদের পেছনে এসে দাঁড়ালেন হাবিলদার মেজর। প্রত্যেকের কোমরে রিভলবার, হোলস্টারের মুখ খোলা, বাটগুলো বেরিয়ে আছে। মেজর সাহেব কিছুক্ষণ চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন—ক্রূর দৃষ্টিতে চোখ দুটো তাঁর কুঁচকে উঠেছে, ডান হাতটা রিভলভারের ওপর নিশপিশ করছে। আঙ্গুল নেড়ে তিনি একজনকে ডাকলেন। জনকয়েক একসঙ্গে এগিয়ে আসছিল। তিনি বললেন, "এক আদমী—"

এগিয়ে এলো সাদেক, উত্তেজনায় সে স্যালিউট করতে ভুলে গেছে। মেজর সাহেব বললেন, "তুমলোক ইধর ক্যোঁ খাড়া হায়?"

সাদেক বললে, "হমলোক অমলবাবুকা বিচার দেখনে মাঙতা—"

"ক্যোঁ! উসকো জরুর সাজা মিলেগা!"

"নহি সাব, উনকো কোই সাজা হোনা নহি চাই—উনকা কোই কসুর নহি হায়—হাবিলদার মেজর সাব হমলোগোঁ পর জুলুম কিয়া ঔর উনকো ঝুটমুট ফাঁসানে মাঙতা। আপ সাজা দেনে মাঙতা তো পুরা কোম্পানিকো সাজা দিজিয়ে—হমলোক তৈয়ার হায়—"

মেজর সাহেব আর একবার সমস্ত ছেলেদের ওপর চোখ বুলিয়ে নেন। একটু যেন চিন্তা ক'রে নিয়ে বললেন, "আচ্ছা ঠিক হায়, তুমলোগোঁকো বাত য়াঁদ করেগা অর্ডারলি রুমকে বখত—যাও, তুমলোক খানা খা লেও—"

সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে থেকে আওয়াজ উঠল, "অমলবাবুকে সঙ্গে না নিয়ে

আমরা খেতে যাব না—" মেজর সাহেব ভিড়টার ওপর আরও একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অফিস ঘরে চলে গেলেন।

আধঘণ্টা পরে অমল বেরিয়ে এলো অর্ডারলি-রুম থেকে—মুখে তার বিজয়ীর হাসি। সেন্ট্রিরা তাকে ঘিরে ধরল, রাইফেলের মুখ ঘুরিয়ে ধরল ছেলেদের দিকে। কয়েক পা এগোতেই ছেলেরা অমলকে ঘিরে ধরল। অনেকগুলো স্বর একই সাথে ভেঙ্গে পড়ল, "তোমায় ছেড়ে দেয় নি অমল ?"

অমল বললে, "মাত্র চোদ্দ দিনের কয়েদ—আমি নিজেই মেনে নিয়েছি দুটি শর্তে। প্রথমত, প্যারেড প্রোগ্রাম হাল্কা করা হবে, আর দ্বিতীয়—হাবিলদার মেজরকে এ কোম্পানি থেকে ট্রান্সফার করা হবে। অফিসের সামনে তোমাদের এভাবে জমায়েত হতে দেখে, মেজর সাহেব রীতিমত ভয় পেয়ে গেছেন। আমাদের জয় হয়েছে।"

সাদেক হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে বললে, "কিন্তু কয়েদ কেন আপনি মেনে নিলেন অমলবাবু ?"

অমল বললে, "এ ছাড়া আর যে কোন উপায় ছিল না সাদেক !"

সাদেক ফুঁসে উঠল, "উপায় ছিল না মানে ? আমাদের ওপর ভরসা রাখতে পারলেন না ! আমরা কি কিছুই করতে পারতাম না ?"

সাদেকের আরক্ত, ক্ষুব্ধ মুখখানার ওপর থেকে অমল চোখ নামিয়ে নিলে। বাকী ছেলেরা নীরবে ধীরে ধীরে ব্যারাকে ফিরে গেল।

হাবিলদার মেজরের ঘরের সামনে ছেলেরা সারাদিন ঘুরঘুর ক'রে বেড়াচ্ছে। লক্ষ্য করছে, সত্যিই হাবিলদার মেজর চলে যাচ্ছে কিনা ! দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সন্দেহও গভীর হয়ে ওঠে। থ্রী থার্টি ডাউনের সময় পার হয়ে যাওয়ার পর ব্যাপারটা তাদের কাছে সরল হয়ে যায়। পাঁচকড়ি আক্রোশে ছটফট করছে, "দেখলে তো শালা নেলসন ভাঁওতা দিয়ে অমলকে কেমন কোয়ার্টার গার্ডে পুরে দিলে !"

সাদেক বলে উঠল, "অমলবাবুও যেমন ! মনে করেন বুঝি এ শালারা মুখে কথা কয় ! এশালা বেজন্মারা সব করতে পারে ! ভেবেছে, অমলবাবুকে কোয়ার্টার গার্ডে পুরে আমাদের সায়েস্তা করবে ! আচ্ছা, আমরাও দেখছি।"

রোলকলে হাবিলদার মেজর এলেন অর্ডার শোনাতে। অন্ধকার আকাশের তলায় ছেলেদের মুখ দেখা যায় না। ছেলেদের যার প্রাণে যা আসে, তাই বলে

হাবিলদার মেজরকে খিস্তি করতে থাকে। হাবিলদার মেজর আর মেজাজ দেখান না—অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে রোলকল ডিসমিস ক'রে দিয়ে নিজের কোয়ার্টারের দিকে চলতে থাকেন। হঠাৎ তাঁর পিঠের ওপর একখানা আধলা-ইট এসে পড়ল ধাঁই ক'রে। পেছনের দিকে না চেয়ে, তিনি দৌড়ে চলে যান নিজের ঘরের মধ্যে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতেই একজন সেন্ট্রি অমলকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে যায়। উত্তেজনায় সে হাঁপাতে থাকে, চোখদুটো তার বড় বড় হয়ে উঠেছে। অমল বলল, "কি হয়েছে ?"

"ভীষণ কাণ্ড অমলবাবু !"

"কি কাণ্ড ?"

"কাল রাত্রে হাবিলদার মেজরের ঘরে শাবল ছুড়ে মেরেছে—"

"তারপর ?"

"শাবলটা দেয়াল ফুটো ক'রে ভেতরে ঢুকে যায়—তবে হাবিলদার মেজর সাহেবের গায়ে লাগে নি—" শুনে অমল স্তম্ভিত হয়ে যায়। থরথর ক'রে তার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। এমন কাজ করল কে ? কেন ?

বেলা বাড়তে থাকে—স্বাভাবিক ভাবেই সমস্ত কাজ শুরু হয়। প্যারেড, ফেটিগ সমস্তই চলতে থাকে। প্রিজনার্স ওন্- সি ও- নায়েক রামজীবন যথা সময়ে এসে অমলকে ফেটিগ খাটাতে নিয়ে যায়। বুটের ওপর মোজাটা উল্টে দিয়ে, হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে, খালি মাথায় কোদাল কাঁধে নিয়ে অমল চলে জঙ্গলে মাটি কাটতে। সকালে সাতটা থেকে এগারোটা, আর বিকেল একটা থেকে পাঁচটা মাটি কাটা হলো কয়েদীর ফেটিগ। প্যারেড গ্রাউণ্ডের ওপর দিয়ে, এক নম্বর আর তিন নম্বর ব্যারাকের ফাঁক দিয়ে অমল চলেছে। কোন ছেলেকে দেখলেই সে ক্ষণেকের জন্যে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। নায়েক রামজীবনকে পাশ কাটিয়ে রবীন অমলের পাশে পাশে চলতে চলতে চাপা গলায় বললে, "হয় আপনাকে ছেড়ে দেবে, না হয় ও-শালাকে তাড়াবে—এর একটা আদায় আমরা করবই।"

অমলের মনে পড়ে সাদেকের কথা, "আমরা কি কিছুই করতে পারতাম না !" সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়, সত্যিই কি কেউ পারে, এই বিরাট শক্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে ! জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে নায়েক রামজীবন বললে, "লিজিয়ে অমলবাবু, বৈঠ্‌কে থোড়া আরাম করু লিজিয়ে—আজ ঔর কোই নহি আয়গা—"

অমল কোদালটা নামিয়ে রেখে ভাবছে, শাবলটা যদি হাবিলদার মেজরের

গায়ে লাগত! সমস্ত মনটা তার শিউরে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, মবারকের সেই রক্তাক্ত দেহ—সেই বিস্মিত চোখ আর তার এক-টুকরো আর্তনাদ! শুধু মবারক একা নয়, তার চোখের ওপর ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ায় এই কোম্পানির মৃত, আহত, বিকলাঙ্গ ছেলের দল—যারা প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছে—যারা একটা না একটা অঙ্গ খেসারৎ দিয়ে এদের বহাল্ তবিয়তে রেখেছে। আরও মনে পড়ে, কোলকাতার রাস্তায় দেখা গ্রামের নিরীহ মানুষদের কাক-চিলে ঠুকরে খাওয়া শবদেহ, পাঁচকড়ির হাতে গুলি-খাওয়া সেই বারো বছরের ছেলেটি, বর্মা ইভ্যাকুয়ী জীবন্ত মানুষের শবযাত্রা!

ঝোপের আড়ালে খড় খড় শব্দে অমল চমকে ওঠে। লঙ্গরখানার বাচ্চা লাঙ্গরী আরফান এক মগ চা আর দুখানা পুরি নিয়ে বেরিয়ে এলো। অমলের কাছে এসে বললে, "খেয়ে নিন অমলবাবু, আপনার জন্যে নিয়ে এলুম—"

অমল আরফানের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—চেয়ে চেয়ে তার চোখ জ্বালা ক'রে ওঠে। আবার তার মন সচল হয়ে ওঠে, জয়ন্তকে যেন সে অনুভব করতে পারে তার পাশেই! আরফানের গা-টা স্পর্শ করার জন্যে মনটা তার আনচান ক'রে ওঠে। আরফানের কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বললে, "ওরা যদি দেখতে পায়?"

"দেখতে আর তেনাদের হচ্ছে না বাবু—ল্যাজ গুটিয়ে তেনারা অফিস ঘরে ঢুকে ব'সে আছেন"—এই কথা কয়টা বলার মধ্যে তার গর্ব কত! অমল আবার ভাবে, এত জোর এই আরফানই বা পেলে কোথা থেকে!

এগারোটার সময় আবার কোদাল ঘাড়ে ক'রে অমল কোয়ার্টার গার্ডের দিকে চলতে থাকে। হাবিলদার সরকার অমলকে আড়ালে ডেকে বললে, "আপনি বারণ করে দিন অমলবাবু—আপনার কথা ওরা শুনবে।" অমল ভাবে শুনবে কি! বোধহয় নয়। সে অধিকার সে হারিয়ে ফেলেছে। সে ভেবেছিল, তার কারাবরণের মধ্যে দিয়ে কোম্পানিতে আসবে মঙ্গল। এতগুলো মানুষের শক্তির ওপর সে ভরসা রাখতে পারে নি। চোখের ওপর ভেসে ওঠে, হতাশ সেই ছেলেদের ধীরে ধীরে ব্যারাকে ফিরে যাওয়া। অনুতাপে তার বুকের মধ্যেটা দুমড়ে মুচড়ে যায়।

বেলা পাঁচটায় ফেটিগ শেষ ক'রে কোয়ার্টার গার্ডের মধ্যে ঢুকতেই স্পেয়ার সেন্ট্রি দুজন দৌড়ে অমলের কাছে এসে বললে, "শুনেছেন, আজকে থ্রি-থার্টি ডাউনে হাবিলদার মেজর সাহেব ছুটিতে যাচ্ছেন।"

অপর জন বলে ওঠে, "সত্যি অমলবাবু, আমি স্বচক্ষে দেখে এলুম—"

প্রথমজন আবার বললে, “জানেন অমলবাবু, ছুটি না আরো কিছু! আসলে শালা কেটে পড়ছে; বুঝলেন না, শালারা ভাঙবে তবু মচকাবে না।”

অমলের কানে বেজে ওঠে সাদেকের ভৎর্সনা, ‘আমরা কি কিছুই করতে পারতাম না!’

সেদিনকার রেডিওর খবর, রেড্ আর্মি বার্লিন থেকে আর বত্রিশ মাইল। কুড়ি দিনে রেড্ আর্মি ওয়ারশ’ থেকে ওডের নদীর তীরে এসে পৌঁচেছে। বৃটিশ আর আমেরিকানরা জার্মানিকে পশ্চিম দিক থেকে ঘিরে ফেলছে। ইতালিতে সেভেন্‌থ্ আর্মি মিলানের কাছে এসে পৌঁচেছে—উত্তর ইতালিতে ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছে—মুসোলিনী বিদ্রোহী কৃষকদের হাতে নিহত হয়েছেন। ওকিনাওয়ায় অবতরণ করার জন্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় আমেরিকান সৈন্য প্রবল লড়াই চালাচ্ছে। তিন দিনের যুদ্ধে ফিফথ ইণ্ডিয়ান ডিভিশন মান্দালয় দখল করেছে।

খবর বলা শেষ হলো। পাঁচকড়ি, খগেন আর অনন্তর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, “আমারও যেন রেড আর্মির মতো এগিয়ে চলেছি, না রে?”

অনন্ত বললে “সে আবায় কি রে!”

“কেন! প্যারেড কমিয়েছি, হাবিলদার মেজরকে তাড়িয়েছি, এইবার মেজর নেলসনকে ঘায়েল করতে পারলেই সমস্ত জুলুমের শেষ—”

সতেরো

রাত তখন বারোটা কি একটা! ক্যাম্প নিশুতি হয়ে ঘুমোচ্ছে। কেবল নাইট পিকেট ডাণ্ডা হাতে ক্যাম্পের রাস্তায় টহল দিচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষের কালো রাত, অন্ধকারে সব কিছুই একাকার হয়ে গেছে, কেবল ক্যাম্পের ধারে নালাটার ওপর জোনাকির ঢেউ বহে চলেছে।

হঠাৎ একসাথে দুটো ডব্লিউ· ডি· ইঞ্জিনের হুইসিল বেজে উঠল। সেটা বেজে চলেছে একটানা! কয়েক মুহূর্ত পরেই অনেকগুলো পটকা ফাটার শব্দ—লম্বা একটা ফিতের মতো! ফগ সিগন্যালের শব্দ।

ব্যারাকে ব্যারাকে ছেলেরা উঠে পড়েছে। তারা প্রথমটা ঘাবড়ে যায়, বিপদের সংকেত মনে করে। কিন্তু বেখাপ্পা ভাবে এতগুলো ফগ সিগন্যাল ফাটার শব্দে

মনে হয়েছে, এ তো বিপদের সংকেত নয়। পাঁচকড়ি বিছানার ওপর উঠে বসে বললে, "শব্দটা মেইন ইয়ার্ড থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে!"

খগেন বললে, "নিশ্চয়ই ওই আমেরিকানগুলোর কীর্তি।"

অনন্ত বললে, "তাহলে জার্মানি সারেণ্ডার করল নাকি!"

পাঁচকড়ি লাফিয়ে ওঠে, "ঠিক বলেছিস—নিশ্চয়ই তাই। দাঁড়া, আমি অফিস থেকে খবর নিয়ে আসছি—" মশারির মধ্যে থেকে বেরিয়ে, শুধু লুঙ্গিটা পরেই সে ব্যারাক থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

অফিসের সামনে রীতিমত ভিড় জমে গেছে। পাঁচকড়ি আর খগেন অফিসের মধ্যে ঢুকে মেইন স্টেশনে ফোন করছে। খবর পৌঁচেছে ব্যারাকে ব্যারাকে—সমস্ত ক্যাম্পটাই উঠেছে জেগে—দলে দলে ছেলেরা বেরিয়ে পড়েছে—যে যে-পোশাকে শুয়েছিল সেই অবস্থাতেই—দল পাকিয়ে হট্টগোল করতে করতে অফিসের সামনে গিয়ে জড় হচ্ছে।

হাবিলদার সরকার ছেলেদের উদ্দেশ ক'রে বললে, "তা বলে একেবারে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে পড়েছ—আনন্দ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ম্যালেরিয়া বাঁধিয়ে বসো না।" হাবিলদার সরকার হাবিলদার মেজরের কাজ করছে—হাবিলদার মেজর মুখার্জি আর ছুটি থেকে ফেরেন নি।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বললে, "আর হাবিলদার সাহেব, এবার যদি ম্যালেরিয়া হয়, তাহলে তো বাড়ীতেই চিকিৎসা করাব—আপনাদের আর কষ্ট ক'রে মেপাক্রীন খাওয়াতে হবে না।"

আর একজন বললে, "জার্মানি সারেণ্ডার করলেই বুঝি বাড়ীতে ফিরতে পারবে মনে করেছ—এখনও শালা জাপানীরা বাকী আছে।"

"হ্যা, জাপানীরা আবার লড়বে! রেড আর্মি যদি একবার ঠেলা দেয়—তাহলেই শালারা কুপোকাৎ—"

পাঁচকড়ি আর খগেন অফিস থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার ক'রে বললে, "জার্মানি সারেণ্ডার করেছে।"

সমবেত ছেলেরা লাফ মেরে চিৎকার ক'রে উঠল, "হিপ-হিপ-হুর-রে—" সমস্ত ক্যাম্পময় তারা ছোটাছুটি শুরু ক'রে দিয়েছে—পাগলের মতো বকবক করছে—যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরছে। যেখানেই জনকয়েক ছেলে জড় হয়েছে, সেইখানেই তারা একই সঙ্গে প্রলাপ বকে চলেছে। এইবার তারা বাড়ী ফিরবে—এইবার তাদের মুক্তি!

এক নম্বর ব্যারাকে ঢুকে হাবিলদার সরকার বললে, "আচ্ছা, এইবার

তোমরা শুয়ে পড়—রাত জেগে আর লাভ কি !"

একজন বলে উঠল, "বলেন কি হাবিলদার সাহেব! রাত জাগা কি বলছেন—এখন যদি আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেন, তাও পারি। ভাবতে পারছেন, এই নরক থেকে মুক্তি পাব! ওঃ, জীবনে এত বড় পাপ বোধ হয় আর কখনও করি নি—যা করেছি এই মিলিটারীতে ঢুকে!" ছেলেটি গুম হয়ে যায়—চোখ ফেটে তার জল আসে।

ব্যারাকের মাঝখান থেকে একজন দাবী জানায়, "কাল আমাদের ছুটি চাই—আজ আমরা সারারাত হৈহৈ করব।"

অনেকে সমর্থন জানায়, "ঠিক, কাল পি. টি. প্যারেড, কিচ্ছু নয়—

হাবিলদার সরকার বললে, "ছুটি দেওয়ার মালিক আমি তো নই, এমন কি সুবেদার সাহেবও পারেন না। কাল সকালে ও. সি. এলে জিজ্ঞেস ক'রে ছুটির বন্দোবস্ত করা যাবে।"

একজন বললে, "কাল সকালে কেন, এখনই জিজ্ঞেস ক'রে আসা যায়।"

হাবিলদার সরকার বললে, "দূর, তা কখনো করা যায়!"

"কেন যাবে না? গিয়ে দেখবেন, সে শালারা মদ গিলে আর নার্স নিয়ে নাচানাচি শুরু করেছে।"

হাবিলদার সরকার যেন একটু ফাঁপরে পড়ে যায়। আমতা আমতা ক'রে বললে, "কিন্তু এত রাত্তিরে যাওয়া ঠিক হবে কি?"

"আলবৎ ঠিক হবে। আমরা তো আর ওদের নার্সগুলোর ওপর ভাগ বসাতে যাচ্ছি না। জার্মানি সারেণ্ডার করেছে—আমরা ছুটি চাই। ভাবুন তো দেখি একবার ইউরোপের কথা—সেখানকার মানুষগুলো এখন কি করছে!"

·

জার্মানির সারেণ্ডার উপলক্ষে কোম্পানির পুরো ছুটি, তদুপরি 'বড়-খানা'। সন্ধ্যেবেলায় ক্যানটিনে উৎসব—মেজর সাহেবের বক্তৃতা আর বিনামূল্যে রম্ বিতরণ। সকাল থেকে চলেছে 'বড়-খানা'র মহড়া। সমস্ত কোম্পানিটা আনন্দে আত্মহারা। শুধু একটি কথা বারবার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, এইবার তারা বাড়ী ফিরবে! বাড়ী বলতে তাদের মনে সুখী একটা সংসারের ছবি ভেসে ওঠে নি। তারা জানে, লড়াই থেকে ফিরে আবার তাদের সেই বেকার দশা, সেই অভাব অনাটন! তবুও চেয়েছে বাড়ী ফিরতে, সৈনিক নামে এই ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে।

সন্ধ্যে থেকে ছেলেরা ক্যানটিনে জমা হতে শুরু করে। উদ্যোগী রম্‌পায়ীরা আগেভাগে এসে কাউণ্টার দখল ক'রে দাঁড়ায়। মগ, ওয়াটার বটল, সবকিছু নিয়ে একেবারে তৈরি। অল্পে যাদের নেশা জমে না, তারা অরসিকদের ভাগটুকু জোগাড়ের তালে ক্যানভাস ক'রে বেড়াচ্ছে। এন· সি· ও-রা ব্যারাকে ঘুরে ছেলেদের তাড়িয়ে নিয়ে আসছে ক্যানটিনে।

অফিসাররা সকলেই এসেছেন, সঙ্গে তাঁদের মাথাপিছু একজন ক'রে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স। অনেক দিন পরে অতগুলো মেয়েকে এত কাছাকাছি দেখে ছেলেদের মন চনমনে হয়ে ওঠে। সান্নিধ্য একটু ঘনিষ্ঠতর ক'রে নেওয়ার জন্যে ছেলেরা আরও একটু কাছে এগিয়ে যায়।

মেজর সাহেব বলতে শুরু করেন, "আর এক বছর আগে, এমনই একটা দিনে আমরা এখানে জমায়েত হয়েছিলাম—সেদিন আর আজকের মধ্যে কত তফাত! সেদিন আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম। আর আজ, আমরা দুটো ফ্যাশিস্ট শক্তিকে খতম্ করেছি—ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। কিন্তু, আমাদের যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি—এখনও জাপানীরা লড়ছে। যতক্ষণ জাপানীদের এক-জনেরও হাতে অস্ত্র থাকবে, ততক্ষণ আমাদের বিরাম নেই"—পাঁচজন নার্স খিল খিল ক'রে হেসে উঠে হাততালি দিতে থাকে—অফিসাররাও সেই হাসি আর হাততালিতে যোগ দেন। ছেলেরা নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে নার্সদের টোল খাওয়া গালের দিকে।

মেজর সাহেব একটু থেমে ঘোষণা করেন, "আর দু-মিনিটের মধ্যে তোমরা প্রিমিয়ার চার্চিলের ঘোষণা শুনতে পাবে।"

রুদ্ধনিঃশ্বাসে ছেলেরা কান খাড়া ক'রে থাকে! ব্রডকাস্ট শুরু হলো বি· বি· সি· থেকে, "গতকাল সকাল ২-৪২ মিনিটে জার্মানী বিনাশর্তে মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।"

মেজর সাহেব শিস দিয়ে 'গড সেভ দি কিং' গেয়ে উঠলেন—সঙ্গে সঙ্গে বাকী অফিসার আর নার্সরা নাচের ভঙ্গিতে কাউণ্টারের প্ল্যাটফরমে ঘুরতে থাকেন। নার্সদের আঁটসাঁট জামার ওপর দিয়ে নারীদেহের লীলায়িত ভঙ্গি ছেলেদের মন লুব্ধ, লোভার্ত ক'রে তোলে।

কিছুক্ষণ পরে রম্ বিতরণ শুরু হলো। ছেলেরা লাইন দিয়ে মগ হাতে কাউণ্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মেজর সাহেব মেজার-গ্লাসে ঢেলে তাঁর নার্সটির হাতে দেন, আর নার্সটি হেসে করমর্দন ক'রে ছেলেদের মগে ঢেলে দেয়। মেমসাহেবের হাসি মুখ আর করমর্দনের লোভে উৎসাহীর সংখ্যা বেড়ে

যায়। মেজর সাহেব খোশ মেজাজে ছেলেদের ডাকাডাকি পীড়াপীড়ি শুরু ক'রে দেন।

ক্যানটিনের ভিড় পাতলা হয়ে আসে। এক কোণে জনকয়েক ছেলে চুপচাপ বসে সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখছিল। মেজর সাহেব একজনকে ডেকে বললেন, "তুমহারা মগ কিধর ?"

ছেলেটি বললে, "হম্ সরাপ নহি পিতা সাব—"

মেজর সাহেব বললেন, "কোই ডর নহি—পি লেও—"

ছেলেটি করুণ আবেদন জানালে, "মুঝকো মাফ কিজিয়ে সাব—"

মেজর সাহেব তাঁর সঙ্গিনীর দিকে মুচকি হেসে, আবার ছেলেটিকে বললেন, "আচ্ছা—একঠো মগ লিয়াও মেমসাহেবকে ওয়াস্তে—" এক চোখ বুজে মেমসাহেবকে বললেন, "হোয়াট ডু ইউ সে ডারলিং"—

মেমসাহেব খুক্ খুক্ ক'রে হেসে বললে, "মেক হিম ড্রিংক ডিয়ার—ইট উইল বি এ রিয়াল ফান—"

ছেলেটি একটি মগ এনে কাউন্টারের ওপর রাখলে। মেজর সাহেব তাঁর সঙ্গিনীকে বললেন, "গিভ দি বাগার ডবল ডোজ ডারলিং—"

চার আউন্স রম্ মেমসাহেব মগে ঢেলে দিলে, মেজর সাহেব মগটা ছেলেটির দিকে এগিয়ে ধ'রে বললেন, "পিয়ো—"

ছেলেটি বললে, "হম্ নহি পিয়েগা সাব—"

মেজর সাহেবের মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে, তবুও হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন, "হামারা হুকম মানো।"

"নহি সাব—"

"ক্যা ?" মেজর সাহেব ফেটে পড়লেন। সুবেদার নন্দীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "টেক হিম টু গার্ড রুম, নন্দী—"

সুবেদার সাহেব যেন একটু ইতস্তত করেন, কি যেন একটা তিনি বলতে চেষ্টা করেন। মেজর সাহেব বললেন, "এ্যাণ্ড পুট হিম আপ বিফোর মি টু-মরো।" সুবেদার ছেলেটির পিঠে একটা হাত রেখে বলেন, "চলো—" তাঁরা বেরিয়ে যাওয়ার পর ক্যানটিনে আর একটিও লোক নেই, কেবল অফিসার আর নার্সরা কাউন্টারের ওপর ব'সে আছেন, আর জ্বলছে বেবি-পেট্রোম্যাক্সটা জ্বলজ্বল ক'রে।

ছেলেরা যখন খেতে বসেছে, তখন অফিসার আর নার্সরা খাওয়া পরিদর্শন করতে আসেন। মেস টিন সামনে নিয়ে, উবু হয়ে ব'সে ছেলেরা খাচ্ছে। মেজর

সাহেব জিজ্ঞেস করেন, "খানা কৈসা হ্যায় ?"

যাকে জিজ্ঞেস করা হয়, সে আশপাশ দেখে নিয়ে, বারকয়েক ঢোক গিলে. মাথা নামিয়ে বলে, "বহুৎ আচ্ছা সাব।"

মেজর সাহেব এগিয়ে গেলে ছেলেটি তার পাশের জনকে তেড়ে ওঠে, "ওঃ, দরদ উথলে উঠল! আজ বড়-খানা কিনা, তাই মেম সাহেবদের দেখাতে এনেছেন। অন্যদিন যে ধান আর কাঁকর মেশানো ভাত, ডালের জলে আর চোখের জলে মেখে খাই—তখন তো শালারা দেখতে আসে না।"

রোলকলের সময় পাচকড়ি, খগেন, অমল প্রভৃতি বারোজনের নাম ডেকে বলা হলো, তারা যেন ফুল ইউনিফর্মে রাত সাড়ে ন'টার সময়ে অফিসার্স বাঙলোয় রিপোর্ট করে। ব্যারাকে ফিরে পাচকড়ি রীতিমত চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিয়েছে, "শালাদের কি এমন পাকা ধানে মই দিয়েছি যে কথায় কথায় আমাদের এই কজনকে ধরে টানাটানি করে!"

খগেন বললে, "শুধু শুধু ক্ষেপছিস কেন পেচো! ভিকট্রি ডেতে শুধু মেমের হাত থেকে মদই নিয়েছিস্, নাচ তো আর দেখিস নি। সুবেদার সাহেব আমাদের একটু বেশী ভালোবাসেন কিনা, তাই শুধু আমাদের জন্যে এই স্পেশ্যাল বন্দোবস্তটা করেছেন!"

অনন্ত বললে, "বুঝলি না ব্যাপারটা! রমের টোপে একটা তো শিকার হয়েছে, এইবার মেমসাহেবের টোপে যদি এক-আধটা রুই কাতলা ওঠে—"

ডাণ্ডা ঘাড়ে ক'রে ওরা বাঙলোয় এসে পৌছুলে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ওদের পোস্ট দেখিয়ে দিয়ে ডিউটি বাতলে দিলেন। সারারাত ধরে অফিসাররা ফুর্তি করবেন, বল্‌নাচ হবে, খানাপিনা হবে, আর ছেলেরা বাঙলোর চারকোণে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে।

খগেন আর পাঁচকড়ি ভেতরে দাঁড়াল, অনন্ত আর সাদেক বাইরে। খগেন ডাণ্ডাটাকে সোলডার আর্ম ক'রে নিয়ে টহল দিতে দিতে পাঁচকড়ির কাছে গিয়ে বললে, "শালারা কি মদটাই গিলছে মাইরি!"

পাচকড়ি বললে, "আর ছুঁড়িগুলোও তো কম যায় না!"

একটু পরে খগেন আবার পাঁচকড়ির কাছে এসে বলে, "শালাদের নাচ তো কত, কেবল দেখ জড়াজড়ি আর কামড়াকামড়ি করছে—"

পাঁচকড়ি বললে, "ওইই তো ওদের নাচ—কেবল গা গরম করা—"

আবার ওরা টহল দিতে থাকে। স্পেয়াররা কিছুক্ষণ উঁকি ঝুঁকি মেরে, শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছে। মেইন ইয়ার্ড থেকে মাঝে মাঝে

পাইলটের হুইসিল আর ওয়াগন ঠোকাঠুকির শব্দ ভেসে আসছে। খগেন বাঙলোর কোণ থেকে সরে গিয়ে অন্ধকারের আড়ালে দেয়ালে ঠেস দিয়ে একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছে। হঠাৎ পাঁচকড়ির ধাক্কায় আঁতকে উঠে বললে, "ওঃ, কি ভয়টাই না পেয়ে গিয়েছিলাম—"

পাঁচকড়ি বললে, "এদিকে আয়—একটা ছুঁড়ি টলতে টলতে এসে ওই গাছ তলায় শুয়ে পড়েছে—বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

"তা দেখ না তুই—"

"না ভাই, আমি পারব না। মাতাল হয়ে আছে—যদি জড়িয়ে ধরে।"

"তাহলে তো তোরই লাভ—"

"নাঃ, সে প্রবৃত্তি মরে গেছে—"

দু-জনে এক সঙ্গে মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে থেকে কিছুটা আলো এসে পড়েছে তার গায়ে। মেয়েটি একেবারে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। খগেন বললে, "ওই টিনের ঘরে বি. টি. কুক ল্যাজার থাকে, ওকে ডেকে দে, জলটল দেওয়ার দরকার হলে সে-ই দিতে পারবে।"

পাঁচকড়ি ল্যাজারকে ডেকে নিয়ে এলো। চোখ মুছতে মুছতে ল্যাজার উঠে এসে মেয়েটির স্তিমিত দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ল—চোখের পাতা টেনে দেখে, তাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিলে। মেয়েটি ল্যাজারের গলাটা আঁকড়ে ধরে গোঙিয়ে ওঠে, "মাই ডার্লিং—" অনর্গল সে ল্যাজারকে চুমো খেয়ে চললো।

বারান্দার ওপর হুড়মুড় ক'রে জুতোর শব্দ হলো। চমকে ওরা পেছন ফিরে দেখে, লেফটেন্যান্ট কর্নেলি একটি মেমকে টানতে টানতে নিজের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। পাঁচকড়ি খগেনকে বললে, "যা তোর পোস্টে গিয়ে দাঁড়াগে যা—আর ঘুমোস নি যেন।"

খগেন আর পাঁচকড়ি আবার নিজের নিজের পোস্টে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ খুট ক'রে একটা শব্দ শুনে খগেন চমকে ওঠে—চোখ কুঁচকে দেখে, ল্যাজার দরজায় ছিটকানি লাগিয়ে দিয়েছে। হনহন করে সে পাঁচকড়ির কাছে গিয়ে বললে, "কি রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে যে!"

পাঁচকড়ি খেঁকিয়ে উঠল, "তাতে তোর কি হয়েছে? যা, আপনার জায়গায় যা—" খগেন চলে যায়। পাঁচকড়ি আপন মনে বিড়বিড় ক'রে ওঠে, "যত্তো শালা জানোয়ার—"

আঠারো

জাপানের অন্তিমদশা ঘনিয়ে এসেছে। ওকিনাওয়া আমেরিকানরা দখল করেছে। লাল ফৌজ দুর্দম বেগে মাঞ্চুরিয়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে প্যাসিফিকের তটে—জাপানীরা কোথাও সামান্য একটু বাধা দিতে পারছে না। ফিফথ ইণ্ডিয়ান ডিভিশন বর্মী প্রতিরোধ-বাহিনীর সহযোগিতায় রেঙ্গুন দখল করেছে।

মণিপুর রেল-হেড-এর ওপর থেকে কাজের চাপ একেবারেই কমে গেছে। ওয়েস্ট ইয়ার্ডের সাতখানা লাইন প্রায়ই খালি পড়ে থাকে। সাইডিং লাইনগুলো ঘাসে ঢেকে যাচ্ছে। কোম্পানির জীবন যেন প্রথম দিককার দিনগুলোতে ফিরে এসেছে—মিলিটারী ট্রেনিং আবার গোড়া থেকে শুরু হয়েছে।

ইতিমধ্যে নতুন খবর—কোম্পানি কোহিমা যাবে বিশ্রামের জন্যে। ঠিক হয়েছে, তিনটি ব্যাচে কোম্পানিকে ভাগ ক'রে, এক একটি ব্যাচকে এক মাস ক'রে কোহিমায় রেস্ট দেওয়া হবে। কোহিমা যাওয়ার নামে ছেলেরা স্বাভাবিকভাবেই খুশি হয়েছে। কোহিমা যুদ্ধের দিনগুলোর ওপর ছেলেদের মনে জেগে আছে অপার মমতা—এত স্বাধীনতা তারা মিলিটারী-জীবনে আর কখনো পায় নি। খগেন বললে, "যেতে তো খুবই ইচ্ছে করছে, কিন্তু ব্যাপারটা তেমন ভালো মনে হচ্ছে না—নতুন কোন ফন্দি আঁটলো নাকি ?"

পাঁচকড়ি বললে, "আমার তো তাই মনে হচ্ছে। না হলে মেজর নেলসনের প্রাণ কেঁদে উঠল আমাদের রেস্টের জন্যে !"

স্বরাজ কোথা থেকে ঘুরে এসে বললে, "আসল ব্যাপারটা শুনে এলুম। কোহিমায় যাওয়া মেজর সাহেবের মর্জি নয়, ওপরওয়ালাদের হুকুম। কিন্তু সুবেদার সাহেব এই মৌকায় এক মতলব ফেঁদেছেন।"

পাচকড়ি বললে, "কিসের মতলব ?"

"আর কিসের !" দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বরাজ বলতে শুরু করে, "আমাদের কোতল করার। এই মৌকায় এরা সমস্ত দলগুলোকে ভেঙে দেবে। এক একটা দলের কিছু পাঠাবে কোহিমায় আর কিছু রাখবে এখানে—তারপর দুদিক থেকে বল্টু টাইট দিতে থাকবে।"

পরদিন ভোর থেকে ফেটিগ শুরু হলো। একজন বি. ও. আর. এসে সুবেদার

সাহেবের কাছে দুজন লোক চাইলে, সার্জেণ্ট মেজরের মাল ট্রাকে তোলার জন্যে। সুবেদার সাহেব দুজন ছেলেকে ডেকে হুকুম দিলেন। ক্ষণেক ইতস্তত ক'রে ফট ক'রে ছেলেটি বলে বসল, "আমরা বি. ও. আর-দের মাল তুলব না—"

সুবেদার সাহেব ফেটে পড়লেন, "হোয়াট! জলদি যাও—"

একজন মরিয়া হয়ে বললে, "বেশ, আমরা সার্জেণ্ট মেজরের মাল তুলে দিয়ে আসতে পারি, যদি একজন বি. ও. আর. এসে আমাদের হাবিলদার মেজরের মাল তুলে দেয়—র‍্যাংক-এ তো দুজনেই সমান! আপনি কেন বি. ও. আর-দের মাল তোলার হুকুম দেবেন? ওরা কি আপনাকে স্যালিউট করে?"

মুহূর্তে সুবেদার নন্দীর মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে। মনের অতি গোপন এক ক্ষতস্থানে যেন খোঁচা লাগে। বি. ও. আর! কোলকাতার ইণ্টালি বস্তি, বড়জোর রিপন লেনের ট্যাশ, তারাও নাকি রাজার জাত! আইন মোতাবিক একজন বি. ও. আর. একজন ভি. সি. ও-র নীচে। কিন্তু রাজার জাত বলে উপযুক্ত পদে উপযুক্ত মর্যাদা দানের নিয়মানুবর্তিতাটুকু পালন করাও এদের প্রয়োজন হয় না। বি. ও. আর-দের এই বর্ণাভিমানকে 'বিদ্রোহী বাঙালী' মেজর রায় থেকে শুরু ক'রে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেজর ব্রাউন আর খাস-বিলেতী মেজর নেলসন পর্যন্ত সকলেই মেনে নিয়েছেন। ক্ষমতার নেশায় মাতাল সুবেদার নন্দী অফিসারদের এতভাবে খুশি করেও বি. ও. আর-দের সমপর্যায়ে আসতে পারেন নি। স্যাপার বি. ও. আর-এর কাছ থেকে ন্যায্য প্রাপ্য একটা স্যালিউট কোনদিনই পান নি। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ায় সুবেদার নন্দী অধীর হয়ে বি. ও. আর-টিকে খেঁকিয়ে ওঠেন, "লেট দি বি. ও. আরস লুক আফটার দেয়ার ওন বিজনেস—"

মুচকি হেসে বি. ও. আর-টি চলে যায়। অপর ছেলেটি বলে ওঠে, "একটি ঘুঁষিতে শালাদের ওই হাসি চিরদিনের মতো মুছে দিতে হয়— সুবেদার সাহেব সবই শোনেন, কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার মহান দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছেলেটিকে স্তব্ধ ক'রে দেন না।

গাড়িতে ওঠার আগে আরও একদফা ফলইন করতে হয়। মেজর সাহেব ভাষণ দেন, "তোমাদের এই যাত্রার পূর্বে একটা সুসংবাদ দিতে এসেছি। আশা করি এই সুসংবাদ তোমাদের যাত্রাকে আরও আনন্দময় ক'রে তুলবে। জাপান সন্ধির শর্ত দাখিল করেছে। মিত্রশক্তি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোন শর্তে তাঁরা রাজি হবে না। মিত্রপক্ষীয় কর্তৃপক্ষ মহল আশা করছেন, আর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই জাপান বিনাশর্তে আত্ম-

সমর্পণ করবে। আর আমিও আশা করছি,এই সপ্তাহের মধ্যেই খবরটি তোমাদের দিয়ে আসতে পারব।”

লাইনের মধ্যে থেকে একটি ছেলে ফিসফিস ক'রে বলে ওঠে, “দোহাই বাবা, আবার যেন ট্যাঁকে করে মেমসাহেব নিয়ে যেও না—”

কনভয় যাত্রা শুরু করল। মেজর নেলসন টুপি নেড়ে বিদায় অভিনন্দন জানালেন। বি. ও. আর-রা টুপি খুলে প্রত্যাভিবাদন জানাল। আর ভারতীয়রা ভাবতে থাকে, তারা কি করবে!

রবীন বলে ওঠে, “দে শালাকে বুটসুদ্ধ লাথি দেখিয়ে—”

ডিমাপুর বাজার ছেড়ে, স্টেশনের লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে কনভয় এসে পড়ে মণিপুর রোডে। কনভয়ের পাইলট হয়েছে বি. ও. আর-দের গাড়িখানা। তারা গান ধরেছে। সুনীল বললে, “আয়, আমরাও গান ধরি—”

খগেন খেঁকিয়ে ওঠে, “থাক, আর গানে কাজ নেই, ঢের হয়েছে—”

সুনীল বললে, “কেন বাপু থামখা চটাচটি করছিস—আর কটা দিন মুখ বুজে কাটিয়ে দে না—”

নীচুগার্ড পার হয়ে কনভয় পাহাড়ে উঠতে থাকে। খানিকটা সোজা উঠে বাঁক খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা হুমড়ি খেয়ে এ-ওর ঘাড়ের ওপর পড়ে যায়। খগেন গজগজ করতে থাকে, “আমাদের পেয়েছে যেন ময়দার বস্তা—একটা ট্রাকে গেদেছে বাইশ জন ক'রে,আর ওই শালা বি. ও. আর-রা আটজন উঠেছে একটা ট্রাকে!”

অনন্ত বললে, “তা উঠবে না, বিশ্রাম তো ওদেরই দরকার—ভীষণ লড়াই করেছে কিনা! শালারা একেবারে অপদার্থ! বাগিয়ে যদি একটা ঘা দেওয়া যায়, তাহলে ওদের কাত করতে বোধহয় কয়েক ঘণ্টাও লাগে না!”

সুনীল বললে, “কিন্তু এমনই মজা, ওরাই আমাদের ওপর ঝাল ঝাড়ছে!”

“ঝাড়বে না! কাজ ফুরিয়েছে যে—এইবার তাড়াবার তাল।”

ঘাসপানি পার হয়ে পিফিমায় পৌঁছে কনভয় দাঁড়িয়ে পড়ে। গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে বি. ও. আর-রা রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছে। খগেন বললে, “চলরে, নেমে একটু পেচ্ছাব সেরে নিই—”

সুনীল বললে, “বি. ও. আর-দের যদি হুকুম না লাগে, তাহলে আমাদেরও লাগবে না।”

হুড়মুড় ক'রে ট্রাকসুদ্ধ ছেলে নেমে পড়ল। হাবিলদার সরকার দৌড়ে এসে রাগতস্বরে বললে, "তোমরা বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছ—আমার ভালোমানষির সুযোগ নিচ্ছ !"

অমল টপ ক'রে বলে ওঠে, "কি রকম ?"

হাবিলদার সরকার বললে, "গাড়ি থেকে আপনারা নামলেন কেন ?"

অমল বললে, "বি· ও· আর-দের কি আপনি নামবার হুকুম দিয়েছেন ?"

"ওদের কথা আলাদা—"

"তাহলে এখন থেকে আমাদেরও আলাদাভাবে দেখতে হবে।"

রবীন বলে ওঠে, "যে হাবিলদারি বি· ও· আর-দের কাছে খাটে না, সে হাবিলদারি আর কেন আমাদের ওপর ফলাচ্ছেন ! কোন রকমে আর কটা দিন ওই ফিতে তিনটে বজায় ক'রে যান, ব্যস—"

হাবিলদার সরকার কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে, বারকয়েক সকলের মুখের দিকে দেখে ধীরে ধীরে চলে যায়। খগেন বললে, "এর মধ্যে তবুও কিছুটা মনুষ্যত্ব আছে—একেবারে জাত-কুকুর হয়ে যায় নি !"

জুবজা জাপানীদের শেষ অক্রমণস্থল—যুদ্ধের চিহ্ন তখনও রয়েছে চতুর্দিকে। টিনের সমস্ত বাড়ি, তার দেয়ালে অসংখ্য বুলেটের ছিদ্র। জুবজা ছাড়িয়ে কনভয় কোহিমার দিকে উঠতে থাকে। সবক'টা ট্রাকের ফার্স্ট গীয়ারের গোঁ গোঁ শব্দ পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে। কনর্ভয় চলেছে একরাশ মেঘের মধ্যে দিয়ে হেডলাইট জ্বেলে। চোখে-মুখে ভিজে হাওয়ার ঝাপটা লাগে, জামাকাপড় স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে ওঠে। মণিপুর রোড ছেড়ে কনভয় কোহিমার রাস্তায় ঢোকে—চার হাজার দুশো ফিট ওপরে নাগা পাহাড়ের প্রধান শহর কোহিমা। যেদিকে চোখ পড়ে, সেইদিকেই অসংখ্য লাল রঙের টিনের বাড়ি পাহাড়ের ঢালুর বুকে লেগে রয়েছে। আর তারই পাশে সিঁড়ির মতো খাঁজকাটা জমিতে ফলেছে ধান—সোনালী সবুজের হোলি লেগে গেছে পাহাড়ের বুকে।

খগেন বলে ওঠে, "এমন জায়গায় কি ক'রে যে এত বড় যুদ্ধটা হলো, ভেবেই পাচ্ছি না !"

সুনীল দূরে আঙুল তুলে দেখায়, "দেখ দেখ, অত বড় বড় গাছগুলোর ডালপালা সব গেল কোথায় !"

বাজার পার হয়ে কনভয় চললো কোহিমার শহর এলেকা ছেড়ে আরও ভেতরের দিকে। রাস্তা দিয়ে চলেছে নাগা মেয়ে-পুরুষের দল। মেয়েদের কপালের ওপর দিয়ে পিঠে ঝোলানো টুকরি, আর মেয়েদের বুকের মধ্যে বাঁধা

স্তন্য পানরত শিশু। মেয়ে-পুরুষ সকলেরই গায়ে নানান জাতের মিলিটারী জামা—ব্যাটল-ড্রেস ব্লাউজ থেকে টিউনিক-কোট পর্যন্ত! বেশীর ভাগ পুরুষদের কাঁধে একটা ক'রে বন্দুক—মনে হয় যেন গাদা-বন্দুক।

কনভয় এসে দাঁড়ায় একটা পাহাড়ের তলায়। সেখান থেকে একটা রাস্তা এঁকে বেঁকে পাহাড়ের বুক বেয়ে উঠে গেছে। যেখানটায় এসে ছেলেরা থামে, সেখানে এর আগেও ক্যাম্প ছিল—তার নিদর্শন রয়েছে একমানুষ সমান উঁচু গাঁদা গাছের সরল লাইন। বোঁচকা বুঁচকি নামিয়ে ছেলেরা যখন চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, তখন অকস্মাৎ তাদের মনে একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে, 'সেই মানুষগুলো, যারা একদিন এখানে ফুলের গাছ লাগিয়েছিল, তারা কি আজও বেঁচে আছে!'

সারাদিন ধরে চলে ফেটিগ। লঙ্গরখানা থেকে শুরু ক'রে পায়খানা পর্যন্ত সবই নতুন ক'রে তৈরি করতে হয়। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ক্লান্তিতে শরীর ভারী হয়ে উঠেছে। খাওয়া শেষ ক'রে ছোট ছোট দলে তাঁবুর সামনে বসে ছেলেরা গল্প করছে। সেইদিনকার অভিযানের রোমন্থন—

খগেন একজন হাফপ্যাণ্ট পরা লোক সঙ্গে ক'রে তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে ভালো ক'রে ঠাহর করতে না পেরে সুনীল বলে ওঠে, "কে রে, এখনও হাফ প্যাণ্ট পরে আছিস—মরবার পাখা উঠেছে নাকি?"

খগেন বললে, "ভয় নেই, ইনি আমাদের মতো তাঁবেদার নন, রীতিমত একজন সিভিলিয়ান—"তারপর শুরু করে লোকটির পরিচয় দিতে। লোকটি একজন বাঙালী, কতকাল আগে যে নাগা পাহাড়ে এসেছে, তা সে নিজেই বলতে পারে না। একটি নাগা মেয়েকে বিয়ে ক'রে এখন সে রীতিমত নাগা বনে গেছে। কোহিমা রিইনফোর্সমেণ্ট ক্যাম্পে জল সরবরাহ করার জন্তে একটা ওভারহেড ট্যাংক বসিয়ে, পাহাড়ের বুক থেকে পাম্প ক'রে জল তোলা হতো—এই লোকটি ছিল সেই পাম্প-ড্রাইভার। জাপানীরা যখন কোহিমা আক্রমণ করে, তখন সে ছিল এখানেই। তারপর জাপানীরা যখন পেছু হটে যায়, তখন জলের ট্যাংকটা তারা মেশিনগান চালিয়ে উড়িয়ে দেয়, এর ওপর তারা অন্তত দশ রাউণ্ড গুলি ছোড়ে। জঙ্গলের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়ায় সে-যাত্রা বেঁচে গেছে লোকটা।

চাঁদের তলা দিয়ে হাল্কা একটা মেঘ ভেসে যাচ্ছে—তারই ছায়া পড়েছে তাদের ওপর—অপর পাহাড় তখন চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। লোকটির কাছ ঘেঁষে সকলে গোল হয়ে বসল। সে বলতে শুরু করল—'এই জায়গাটা ছিল রিইনফোর্সমেণ্ট ক্যাম্প। বিরাট এর এলেকা, আর এই ক্যাম্পটা ছিল কোয়ার্টার গার্ড। এইখানটাতেই জাপানীরা প্রথম আক্রমণ করে। সেদিন ঠিক রাত বারোটার সময়ে ডিউটি বদলে হচ্ছে, একজন মাত্র সেণ্ট্রিকে খাড়া রেখে গার্ড কমাণ্ডার আর সকলকে নিয়ে ডিউটি বদল করতে বেরিয়েছে। ওই যে সামনের পাহাড়টা, যার তলায় আপনাদের কোয়ার্টার গার্ড বসেছে, ওর পেছনে আছে ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে জাপানীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে কোয়ার্টারের ওপর। নিশুতি রাত, ঘুটঘুটে অন্ধকার—লাইট আউট-এর পর সমস্ত ক্যাম্পটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ গুলি ছুটল। পাহাড়ের বুকে সেই গুলির শব্দ একটাই যেন একশোটা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে! ঘুমন্ত সৈনিকের দল আচমকা ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসে—অন্ধকারে তাদের দিক ভুল হয়ে যায়। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তারা এগোতে লাগল কোয়ার্টার গার্ডের দিকে। কিন্তু তাদেরই কোয়ার্টার গার্ড থেকে মেশিন গানের গুলি এসে পড়ছে তাদের ওপর! অবাক, হতভম্ব হয়ে তারা পালাতে লাগল যে যেদিকে পারে। শূন্য রাইফেল ছুড়ে ফেলে তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে থাকে। কতক তাদের হোঁচট খেয়ে পড়ে, কতক তাদের গুলি লেগে মরে, আর কেউ কেউ গড়িয়ে পড়ে যায় পাহাড়ের অতল খাদে। সেই অবসরে জাপানীরা সমস্ত কোয়ার্টার গার্ড ঘিরে ফেলে, যাকে সামনে পায় তাকেই গুলি করে। বন্দী ওরা বড় একটা কাউকেও করে না—যারা হাত তুলে আত্মসমর্পণ করতে গেছে, তাদের বুকে সোজা বসিয়ে দিয়েছে বেয়নেট।'

লোকটি চুপ করল। হঠাৎ এই নিস্তব্ধতায় ছেলেরা চমকে ওঠে। এ ঘটনা ঘটেছিল প্রায় দেড় বছর আগে, তবুও ছেলেরা বারংবার শিউরে উঠে। মেঘে-ঢাকা চাঁদের আলোয় পাহাড়ের চূড়া ধূসর হয়ে উঠেছে—মনে হয়, ওই ধূসরতার অন্তরালে কারা যেন ওৎ পেতে রয়েছে!

রাত নটা বেজেছে। সময় সংকেত করার জন্যে ফাটা একটা লোহা ঝুলিয়ে রেখেছে কোয়ার্টার গার্ডে! মরচে পড়া সেই ভাঙ্গা লোহাটার ঢং ঢং শব্দ ছেলে-দের কানে কেমন যেন রহস্যময় শোনায়। ধীরে ধীরে তারা তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ে। মশারির সারি ঠেলে পথ ক'রে নিতে নিতে কেমন যেন গা ছমছম ক'রে ওঠে। মনে হয়, তাদের অলক্ষ্যে কারা যেন তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে। দেড় বছর আগের সেই মেশিনগানের গুলির শব্দ, আহতদের আর্তনাদ, ভয়ার্তের

অসহায় চিৎকার সহসা যেন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে—তাদের অশরীরী আত্মা যেন সারা ক্যাম্পময় ছুটোছুটি করছে।

বিশ্রামের প্রোগ্রাম শুরু হলো পরদিন থেকেই। সকালে সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে সাতটা পি. টি.—অর্থাৎ পাহাড়ী রাস্তায় একটি ঘণ্টা দৌড়নো। আধঘণ্টা ব্রেক-অফের পর পুরো ইউনিফর্মে রুট-মার্চ—বেলা এগারোটা পর্যন্ত।

পি. টি. থেকে ফিরে ইউনিফর্ম পরতে পরতে খগেন বলে ওঠে, "আর কেন বাবা এই পৈতৃক প্রাণটার ওপর এত জবরদস্তি! লড়াই তো শেষ হয়েছে—এইবার ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—"

পাশের সিট থেকে বললে, "তা বললে আর ছাড়ছে কে? পুরোদস্তুর ফিট ক'রে তবে ছাড়বে—সিভিল লাইফে ফিরে খেটে খেতে হবে তো!"

"ফিট করার ঠেলায় আবার টি. বি. না হয়ে যায়—"

"তা হয় হোক—তা ব'লে আপনাকে মজবুত করবে না! এই তো এখন দশ মাইল রুটমার্চ—তারপর আবার নাগরিক বৃত্তির ক্লাস—"

খগেন হতবাক হয়ে যায়, "নাগরিক বৃত্তির ক্লাস! সেটা আবার কি?"

"সিভিল লাইফে কেমন ভাবে চলাফেরা করতে হবে, তারই তালিম।"

"কেন, আমরা ভুঁইফোঁড় নাকি? এরা আমাদের শেখাবে ভদ্রসমাজে কেমন ভাবে চলাফেরা করতে হয় তার নিয়ম?"

"আসল কথা কি জানেন, আমাদের ভেড়ুয়া বানাবার মতলব!"

যথারীতি প্যারেড ফল্ ইন হলো। ডিট্যাচমেণ্ট ও. সি., লেফটেন্যাণ্ট কর্নেলি একটা নাইট-গাউন পরে ইন্সপেকশন করলেন। হাবিলদার সরকার দিলে মার্চ অফের অর্ডার। কাঁচা রাস্তা পার হয়ে ওরা বড় রাস্তায় এসে পড়ে। যতই ওরা এগিয়ে চলেছে, রাস্তাটা ততই নির্জন হয়ে উঠছে। পাহাড় কেটে রাস্তা—তার একদিকে উঁচু খাড়াই, অপর দিকে গভীর খাদ। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা যায় পাহাড়ের খাদে পড়ে রয়েছে একটা ব্রেনগান ক্যারিয়ার। ধীরে ধীরে এমনতর ব্রেনগান ক্যারিয়ার আর মোটর ট্রাকের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। মাইলটাক যাওয়ার পর একটা খোলা জায়গায় এসে হাবিলদার সরকার পাঁচ মিনিটের ব্রেকঅফ দিলে। ছেলেরা বিড়ি, সিগারেট ধরিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতে থাকে—পাহাড়ের ঢালুতে নেমে খুঁজতে থাকে যুদ্ধের চিহ্ন। খগেন একটা নরকঙ্কাল দেখে লাফিয়ে এক পা পেছিয়ে আসে। 'কি রে-কি রে'

করতে করতে আরও অনেকে সেখানে জড় হয়। সুনীল বললে, "বল তো, এ কঙ্কালটা জাপানীর না ব্রিটিশের ?"

জনকয়েক হুমড়ি খেয়ে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপামাপি শুরু ক'রে দেয়। একজন গম্ভীরভাবে বলে, "মনে হচ্ছে যেন ব্রিটিশের—"

আর একজন বললে, "দূর, ব্রিটিশের হলে কি আর এখানে পড়ে থাকত ! নিশ্চয়ই কোন জাপানীর।"

রবীন বলে ওঠে, "জাপানী হলে তো কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে কার্জন পার্কে এক্সিবিশন্ করত—এ শালা নিশ্চয়ই আমাদের মতো হাভাতের।"

আবার ফল্‌ইন্ ক'রে মার্চ শুরু হয়। ছেলেরা চলেছে নীরব জনশূন্য রাস্তার ওপর দিয়ে। তাদের বুটের আওয়াজ পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে শতধা হয়ে আবার তাদের কাছে ফিরে আসছে। গান ধরার চেষ্টা জনকয়েক করেছিল, কিন্তু কখন যেন তারা নিজেরাই বিমর্ষ হয়ে উঠেছে। কোথাও দেখা যাচ্ছে কোন একটা ক্যাম্পের চিহ্ন, কোন একটা শেডের ফ্রেম, কোথাও বা খানিকটা সিমেণ্ট বাঁধানো চত্বর। ছেলেরা চলেছে যেন যমপুরীর মধ্যে দিয়ে—খর রৌদ্রের মধ্যেও তাদের গা ছমছম করতে থাকে।

ক্যামেরন হিল্‌স্-এ গিয়ে ওরা হল্ট করলে—কোহিমার সর্বোচ্চ চূড়া। লড়াইয়ের চিহ্ন আজও ছড়িয়ে রয়েছে তার ধূলি-কাঁকরের সঙ্গে। পাহাড়ের মাথায় সমতল ভূমিটুকুর শেষ প্রান্তে একটি স্মৃতিস্তম্ভ—বেঙ্গল স্যাপারস এ্যাণ্ড মাইনারসের উদ্দেশে। পুরো একটি কোম্পানি এখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। স্মৃতিফলকের ওপর চোখ দুটো স্থির হয়ে যায়। একটি ছেলে চিৎকার ক'রে ওঠে, "এ শালাদের যুদ্ধ কি কেবল মানুষ-মারা কল নাকি ?"

অমল অনন্তর একটা হাত চেপে ধরে বলে ওঠে, "বলতে পার, এরাও কি মবারকের মতোই শুধু শুধু মরেছে ?"

অনেকগুলি ছেলে অমলের থমথমে মুখখানার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। অমল আবার বলে ওঠে, "কেন এরা আমাদের জোর ক'রে টেনে এনে এমন ক'রে খুন করলে—আমরা তো এদের কোন ক্ষতি করি নি।"

খগেন অমলের কাঁধটা চেপে ধরে বললে, "আঃ অমল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি !"

শূন্য দৃষ্টিতে অমল কিছুক্ষণ খগেনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর মাথাটা ঈষৎ দোলাতে দোলাতে বলে, "ঠিকই বলেছ খগেন, এই কথা বলার জন্যে আমার বিরুদ্ধে এরা রাজদ্রোহের চার্জ আনতে পারে, না ?"

দেড়টার সময় আবার হুইসিল। এডুকেশন্যাল ক্লাস। ক্লাস নেবেন লেফটেন্যাণ্ট কর্নেলি স্বয়ং। ঘুম ভেঙে ছেলেরা উঠে বসে—বিরক্তিতে সমস্ত মনটা বিষিয়ে ওঠে। অনন্ত খেঁকিয়ে ওঠে, "শালা কর্নেলি নেবে ক্লাস! যেন সবজান্তা হ্যামিলটন রে! বিদ্যের দৌড় তো এইটথ স্ট্যাণ্ডার্ড, রেলেতে ছিল একটা টি. টি. আই., হিটলারের দৌলতে তো হয়েছে লেফটেন্যাণ্ট!"

ক্লাস শুরু হলো। কর্নেলি সাহেব হাই তুলে আড়ামোড়া ভেঙে জুড়ে দিলেন খোশ গল্প। নাগা মদের তারিফ করলেন—নাগা মেয়েদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লোভার্ত প্রশংসা করলেন। এও জানালেন, নাগারা ভীষণ হিংস্র, অল্পতেই ক্ষেপে যায়, একটা মানুষকে কেটে ফেলতে ওদের মধ্যে কোন দ্বিধা-সংকোচ জাগে না। আর নাগা মেয়েরা একেবারে জঙ্গলী—হাসবে, কথা কইবে, কিন্তু প্রেম বোঝে না। কাজেই নাগা মেয়েদের দিকে না এগুনোই বুদ্ধিমানের কাজ।

সুনীল ফিসফিস ক'রে খগেনকে বললে, "আর কাল রাতে উনি নিজের তাঁবুতে নাগা মেয়ে আনিয়ে ফুর্তি লুটেছেন—"

খানিকটা মদ আর মেয়েমানুষের গল্প ক'রে নিয়ে তারপর শুরু করলেন শিক্ষার কথা। এইবার তারা মিলিটারী থেকে ছাড়া পাবে। কিন্তু সমস্যা, নাগরিক জীবনে ফিরে গিয়ে তারা করবে কি? অবশ্য এখনই তারা একেবারে অকূল পাথারে পড়ছে না—গভর্নমেণ্ট তাদের হাতে দিয়ে দেবে মোটা মোটা টাকা—ডেফারড পে, তাদের পাওনা টাকা, আর তার ওপর ছাপ্পান্ন দিনের পুরো মাইনে।

রবীন জিজ্ঞেস করে "আর চাকরী? ভর্তি করবার সময় যে রিক্রুটিং অফিসার বলেছিল, প্রত্যেকের জন্যে চাকরী রিজার্ভ রাখা হবে!"

কর্নেলি সাহেব বলেন, "নিশ্চয়ই, গভর্নমেণ্ট তাঁর প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন—চাকরী সকলকেই দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কিন্তু অত চাকরী কোথায়? আর সকলকেই তো একসঙ্গে চাকরী দেওয়া যায় না, সময় একটু লাগবে বৈকি। কাজেই আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।"

অনন্ত জনান্তিকে খগেনকে বললে, "অপেক্ষা যে করব, সে ক'দিন খাব কি! উনি তো খুব মোটা টাকার হিসেব দিলেন, কিন্তু পাওনা টাকা সবই তো গেছে ওঁদের গর্ভে—ট্রেড-পে কেটে আর কয়েদ খাটিয়ে জমার অঙ্ক কবে শূন্য ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন!"

কর্নেলি সাহেব বলতে থাকেন, "কাজেই গভর্নমেণ্ট ঠিক করেছেন, যারা মিলিটারীতে থাকতে চাইবে, তাদের স্থায়ীভাবে মিলিটারীতে রাখা হবে।"

খগেন বলে ওঠে, "কেন স্যার, লড়াই তো থেমে গেল—আবার মিলিটারী কি হবে!"

কনেলি সাহেব বলেন, "লড়াই করাই সৈনিকের একমাত্র কাজ নয়। দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে সব সময়েই সৈনিকের প্রয়োজন। যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেল, তখন আবার পীস-টাইমের মতো ক'রে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যকে ঢেলে সাজাতে হবে—অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কারখানা বন্ধ ক'রে দিতে হবে—অনেক বড় কারবারকে গুটিয়ে ছোট করতে হবে। কিন্তু দেশের মধ্যে দুষ্ট লোকের অভাব নেই—তারা গভর্নমেণ্টের সমস্ত প্ল্যান হয়তো বানচাল ক'রে দিতে চাইবে—ধর্মঘট বাঁধিয়ে উৎপাদন ব্যাহত করবে, নাশকতামূলক কাজ চালিয়ে অরাজকতার সৃষ্টি করবে। তখন এই মিলিটারী সমস্ত কাজে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে।"

অমল অনন্তকে বললে, "তার মানে ওঁরা যত খুশি লোক ছাঁটাই করবেন, আর তারা যদি বেঁকে দাঁড়ায়, তাহলে আমরা মিলিটারী সেজে তাদের ওপর গুলি চালাব। বাঃ, কী চমৎকার শৃঙ্খলার নমুনা!"

সুনীল বললে, "কিন্তু এদেরই বা উপায় কি! আমরা যদি অন্যায় আব্দার ধরে বসি, আমাদের সকলকেই এক্ষুণি চাকরী দিতে হবে—তাহলে এরা করবে কি? কাজেই শান্তি বজায় রাখতে হলে কড়া হতে হবে বৈকি।"

অমল বললে, "বেশ বলেছ সুনীল! শান্তিটা কেবল ওদেরই জন্যে! যুদ্ধ বাঁধিয়ে কোটি কোটি টাকার গোলা-বারুদ বানিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে, যুদ্ধের কাজে দেশসুদ্ধ লোককে চাকরী দিতে পারে, দুর্ভিক্ষ বাঁধিয়ে দেশসুদ্ধ লোককে কাঙালী ভোজন করাতে পারে; কিন্তু পারে না কেবল পীস-টাইমে সকলকে চাকরী দিতে—পেট ভরে খেতে দিতে! এ তো বড় মজার যুক্তি!"

খগেন বলে ওঠে, "তবে কোন শালা আর মিলিটারীতে থাকে! ভিখ্ মেগে খাব—সেওবি আচ্ছা, কিন্তু দেশের লোকের ওপর গুলি চালানোর জন্যে থাকব মিলিটারীতে? তার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভালো!"

কনেলি সাহেবের বক্তৃতা ম্লান হয়ে যায়। ছেলেরা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে—চোখের ওপর ভেসে উঠেছে যুদ্ধপূর্ব যুগের সেই বেকার দশা! কনেলি সাহেব বারকয়েক হাই তুলে আড়ামোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন।

বৈকালিক চায়ের পর কাঠ কুড়ানোর ফেটিগ। জঙ্গলে ঢুকে খগেন অমলকে বললে, "চলো হে, এই ফাঁকে আমরা একটু ঘুরে আসি। এই জঙ্গলটা পার হলেই

মিহিমা—ওইখান থেকে জাপানীরা রিইনফোর্সমেণ্ট ক্যাম্প আক্রমণ করেছিল। চলো না, গাইডও একজন ঠিক করেছি।" অমল রাজি হতেই মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ ক'রে খগেন বললে, "নাগারা দূরে কাকেও ডাকতে হলে এই রকম শব্দ করে—দেখ না টাকু এক্ষুণি এসে পড়বে।"

বাচ্চা একটি নাগা ছেলে এসে হাজির হলো। কোমরে তার একটা নেঙটি জড়ানো, বাকী সমস্ত দেহটা খালি—হাতে একটা 'নাগা দা', ধারের দিকটা ঝকঝক করছে। বয়স তার আট থেকে ষোল যে-কোন একটা হতে পারে। টাকু তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো—পাহাড়ের উঁচু-নীচু ভেঙে, জঙ্গল ডিঙিয়ে, খাদ পেরিয়ে, মিনিট পনেরোর মধ্যে তারা পৌঁছে গেল মিহিমায়। একটা বাড়ীর সামনে দাঁড় করিয়ে টাকু ভেতরে চ'লে গেল। সামনের খোলা জানলা দিয়ে খগেন উঁকিঝুঁকি মেরে বলল, "ওহে অমল দেখ দেখ, আয়না, চিরুণী, পণ্ডস ক্রীম—এ তো দেখছি রীতিমত সাহেব!"

অমল বললে, "বোধহয় এরা খ্রীষ্টান।"

টাকু ফিরে এসে ওদের দুজনকে একটা ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। ঘরের মাঝখানে একটা কাঁচা কাঠের টেবিল, কাঠটা শুকিয়ে ট্যারা-বাঁকা হয়ে উঠেছে—তার চারদিকে চারটে ওই একই জাতের চেয়ার। টেবিলের ওপর একটা মেখলা পাতা, তার ওপর খানকয়েক খ্রীষ্টের সুসমাচার। ঘরের দেয়ালে কয়েকটা বাইবেলের ছবি এঁটে দেওয়া। অমল আর খগেন পাশাপাশি দুটি চেয়ারে যথাসম্ভব সাবধান হয়ে বসল। ঘরের ভেতর-দরজা দিয়ে একজন আধা প্রৌঢ় নাগা এসে ঢুকলেন। হাত তুলে নমস্কার ক'রে কথা কইতে গিয়ে খগেন পড়ল বিপদে—কোন ভাষায় কথা কইবে! নাগা ভদ্রলোক সমস্যার সমাধান ক'রে দিলেন। তিনি কথা যা কইলেন, তার অধিকাংশ ইংরেজী আর তার সঙ্গে কিছু কিছু অসমীয়া।

খগেন জানালে, তারা এসেছে জাপানীদের সম্বন্ধে জানতে—

'জাপানী' কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক সোজা হয়ে যান—মুহূর্তের মধ্যে চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। সরে গিয়ে তিনি দেখান ঘরের আধপোড়া বাতাগুলো।

অমল জিজ্ঞেস করলে, "আপনার ঘরে আগুন লাগল কি ক'রে?"

নাগা ভদ্রলোক একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ে গর্জে উঠলেন, "জাপানীরা শয়তান।" মুখের ওপর রূঢ় একটা ভাব ধীরে ধীরে ঘনিয়ে উঠল—টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলতে আরম্ভ করলেন, "কোহিমা আক্রমণ করার দিন সাতেক

আগে ছোট একটা জাপানী দল আমাদের মতো পোশাক পরে এই গ্রামে ঢোকে। আমাদের কাছে তারা বলতে শুরু করে আমাদের দুঃখ-কষ্টের কথা, ব্রিটিশের রাজত্বে আমাদের দুর্দশার কথা, রাণী গুইদালোর ওপর অকথ্য অত্যাচারের কথা। আরও বললে, তারা যে যুদ্ধ করছে, সে শুধু ব্রিটিশদের তাড়াতে। ভারতবর্ষের লোকেরা তাদের ভাই। নাগা পাহাড়ই নাগাদের দেশ—সেখানে অন্য কেউ রাজত্ব করবে কেন ?"

একটু চুপ ক'রে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে লাগলেন, "আমরাও ভাবলুম, সত্যিই বুঝি তাই ! তাদের কথা আমরা বিশ্বাস করলুম, আমাদের বাড়ীতে তাদের লুকিয়ে রাখলুম, তাদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দিলুম। তারা আমাদের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিলে—আমরাই তাদের কাছে শহরের খবরাখবর এনে দিতে লাগলুম। রোজই তাদের দশ-বিশ জন ক'রে লোক বাড়তে থাকে। আমাদের খাবারে টান পড়তে শুরু হয়। এদিকে কোহিমার যুদ্ধও শুরু হয়ে গেল। ওদের লোক আরও বাড়তে লাগল—ওরা তখন আমাদের মুখের ভাত কেড়ে নিতে লাগল। আপত্তি জানালে ভয় দেখায়, এমন কি দু-চার জনকে গুলিও করে।

"দেখতে দেখতে ওরা আমাদের বাড়ীগুলো দখল করতে লাগল—আমাদের খাওয়ার সমস্ত জিনিস দখল ক'রে নিলে—বন্দুক হাতে যাবতীয় জিনিস পাহারা দিতে লাগল। নিজেদের খাবার জিনিস নিজেরা চুরি করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরেছি—দিনের পর দিন আমরা না খেয়ে কাটিয়েছি। কোহিমার লড়াইয়ে তারপর যখন হারতে শুরু করল, তখন ওরা আরও খারাপ ব্যবহার করতে লাগল। তখন ওরা শুরু করল আমাদের মেয়েদের ওপর অত্যাচার। বন্দুকের সঙিন দেখিয়ে ওরা স্বামীর বুক থেকে স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়েছে—বাপের সামনে মেয়ের ওপর বলাৎকার করেছে।"

চাপা ক্ষোভে ভদ্রলোকের শরীরটা যেন ফুলে উঠতে থাকে, চোখ দুটো কুঁচকে আসে, মুখটা পাথরের মতো কঠিন হয়ে ওঠে। তিনি বলে চলেছেন, "এতদিনে আমাদের চোখ ফুটল—আমরাও তৈরি হতে লাগলুম। ঘরে ঘরে অস্ত্র দিলুম—আমাদের ওই একটি মাত্র অস্ত্র 'দাও'—আমাদের ছেলে-মেয়ে বুড়োবুড়ি সকলকেই শক্ত হাতে 'দাও' ধরতে বললুম। লড়াই আমরাও শুরু করলুম। বাড়ীঘর ছেড়ে, জঙ্গলে লুকিয়ে ওদের আক্রমণ করেছি—সুযোগ পেলেই ওদের কুপিয়ে মেরেছি—দশজনের প্রাণ দিয়েও ওদের একজনকে মেরেছি। আমাদের মেয়েরা ভীরু নয়, তারাও অস্ত্র ধরলে, নিজেদের মানমর্যাদা নিজেরা

রক্ষা করতে লাগল। তারপর দেখলাম, জাপানীগুলো পালাতে শুরু করেছে—কিন্তু তখনও তাদের শয়তানী শেষ হয় নি। তারা বাড়ী লুঠ করতে লাগল, যাকে তাকে গুলি ক'রে মারলে, বাড়ীতে বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিলে—" হঠাৎ তিনি চুপ করলেন। চোখ দুটো তাঁর জ্বলছে, আর সেই জ্বলন্ত চোখ সমস্ত ঘরময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অমল আরও একবার বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। প্রথম সে বিভ্রান্ত হয়েছিল বর্মার ইভ্যাকুয়েশন দেখে—তারপর আগস্ট আন্দোলনের দোটানায় পড়ে, আর এই তৃতীয়বার সে বিভ্রান্ত বোধ করছে মরণের এই অফুরন্ত মিছিল দেখে! মানুষ মরেছে লাখে লাখে, পঙ্গপালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে। মরেছে বর্মা ইভ্যাকুয়েশনে, দুর্ভিক্ষের তাড়নায়, মরেছে লড়াইয়ের ময়দানে। যেন মরাটাই হলো মানুষের জীবনে একমাত্র কাজ! প্রশ্নের পর প্রশ্ন বারবার তাঁকে খোঁচা দিচ্ছে, কেন এই মানুষগুলো মরেছে? কি জন্যে মরেছে? কার জন্যে মরেছে? মৃত্যুর এই বিরাট জলুস তার মনকে সন্দিগ্ধ ক'রে তুলেছে। যুদ্ধের নামে এই নরমেধ যজ্ঞ কার হিতার্থে? কোথায় বসে কারা এই ষড়যন্ত্র ফেঁদে চলেছে?

সকালের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে—রবিবারের ছুটি। অমল চুপচাপ শুয়ে আছে। অনন্ত তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, "কি হলো অমল, কেমন যেন মুষড়ে পড়েছ—বাড়ী থেকে কোন খারাপ খবর পেয়েছ নাকি?"

অমল বললে, "না, বাড়ীর খবর ভালোই—ভাবছি অন্য কথা—"

"কি কথা?"

"এই আমাদের জীবনের কথা—"

"আর কেন মন খারাপ করছ। এইবার তো বাছাধনদের ছাড়তেই হবে।"

অমল তড়াক করে উঠে বসে, সোজা অনন্তর চোখের ওপর চোখ রেখে বললে, "মিলিটারী থেকে ছাড়া পেলেই কি আমাদের মুক্তি? কিছুকাল আগে তো আমরা সেখানেই ছিলাম—বাঁচতে তো সেখানে পারি নি, তাই তো এখানে এসে হাজির হয়েছি। তুমি কি মনে কর, মিলিটারী থেকে ফিরে গিয়ে আমরা বাঁচতে পারব?"

অনন্ত বললে, "অতশত ভাবি নি অমল; এখানে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, তাই এখন আমার একটি মাত্র চিন্তা, এখান থেকে ছাড়া পাব কবে? বাড়ী ফিরে গিয়ে আবার নতুন ক'রে জীবনকে গড়ে তুলতে চাই। লীলা আমায় ক্ষমা

করেছে, আমি তাকে নিয়ে আবার ঘর বাঁধব !”

অমলের উত্তেজনা মুহূর্তে শান্ত হয়ে যায়। যে-কথা সে অনন্তকে বলতে চেয়েছিল, সে-কথা এখনই এই মুহূর্তে বলা চলে না। অনন্তর সুখের নীড় রচনা করার এই আকুল আগ্রহকে তার দমিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু অনন্ত কি পারবে ঘর বাঁধতে ? পারবে কি সে শান্তিতে জীবন কাটাতে ?

খগেন তাঁবুর মধ্যে ঢুকে বললে, “নাও হে অমল, ইউনিফর্ম পরে নাও”, অনন্তর দিকে তাকিয়ে বললে, “তোমার কি হয়েছে অনন্ত, এই দুপুরবেলা শুয়ে আছ ? চলো শহরে ঘুরে আসি, তোমাদের নামে পারমিট নিয়েছি।”

বাজারে পৌঁছে খগেন বললে, “কোথায় আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব, তার চেয়ে চলো সিনেমা দেখা যাক—”

অনন্ত বললে, বেঁচে থাকলে অনেক সিনেমা দেখতে পাব, কিন্তু কোহিমাতে যে আর কোনদিন আসা হবে না, সে কথা আমি বাজি রেখে বলতে পারি।”

অমল বললে, “কোহিমাকে এরা বলে এশিয়ার স্টালিনগ্রাড—চলো না, ঘুরে ঘুরে দেখা যাক।”

অনন্ত বললে, “ঘুরতে শুরু করার আগে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।”

ক্যান্টিনে ঢুকে ওরা দেখলে, এক কোণে আসাম-রাইফেলের এক হাবিলদার বসে চা খাচ্ছে। অমল বললে, “চলো, আমরা ওর কাছে গিয়ে বসি, কিছু খবর-টবর নিশ্চয়ই দিতে পারবে।”

টেবিলটায় গিয়ে বসতে গুর্খা হাবিলদার সাহেব হেসে অভ্যর্থনা করলে। খগেন বললে, “কোহিমা লড়াইয়ের গল্প শুনব বলে আপনার কাছে এসে বসলাম হাবিলদার সাহেব।”

হাবিলদার সাহেব খুব খুশি, হেসে বললেন, “আমি নিজে জাপানীদের সঙ্গে লড়াই করেছি। তখন আমি ছিলাম সিপাই।”

অমল বললে, “শুনেছি, আপনাদের রেজিমেণ্টই না কি শেষ পর্যন্ত জাপানীদের ঠেকিয়েছিল ?”

হাবিলদার সাহেব বললে, “আলবত, প্রথম প্রথম তো আমাদের লড়তেই দেয় নি, সারা কোহিমায় কেবল গার্ড-ডিউটি দিইয়েছে। তারপর ব্রিটিশ সৈন্যরা যখন সব শেষ হয়ে গেল, তখন আমাদের নিয়ে এলো জাপানীদের কোন রকমে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের রেজিমেণ্টের অর্ধেক খতম হয়ে গেল। কিন্তু জাপানীদের আমরা এক পা-ও এগোতে দিই নি !”

অনন্ত বললে, “ব্রিটিশ সৈন্য সব শেষ হয়ে গেল কি করে ?”

"শেষ হবে না তো কি! ওরা জঙ্গলের মধ্যে না ঢুকে, ওপরে বসেই কামান দাগতে লাগল। সে সময় জাপানীরা ঘাপটি মেরে বসে থাকে। যেই ওরা থামে, তখন জাপানীরা আচমকা এক সঙ্গে চারিদিক থেকে আক্রমণ শুরু করে দেয়। সমস্ত ডিভিশনটা শেষ হয়ে গেল, তবুও ওরা জঙ্গলে ঢুকল না। ওরা শুধু কোহিমার প্রবেশপথটা আটকে বসে রইল।"

খগেন বললে, "তারপরই বুঝি ফিফথ ইণ্ডিয়ান ডিভিশন এলো!"

"না, তারপর এলাম আমরা। আমরা ছোট ছোট দলে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম, খাদে নামলাম, পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগলাম। আশ্চর্য যুদ্ধ করতে জানে এই জাপানীরা! কোথাও তারা গাছের ওপর উঠে ডালের সঙ্গে নিজের দেহটা বেঁধে নিয়ে মেশিন গান চালাচ্ছে, কোথাও তারা খাদের মধ্যে নেমে স্নাইপ শট্ করছে, কোথাও তারা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে হ্যাণ্ড গ্রেনেড মারছে। তবুও আমরা এগিয়ে গেলাম, বহু লোকের প্রাণ দিয়ে ওদের অনেকগুলো ঘাঁটি নষ্ট করলাম। তারপর এলো ফিফথ ইণ্ডিয়ান ডিভিশন। তারা জঙ্গলের মধ্যে আরও বেশী ক'রে ঢুকে পড়ল, আশপাশ দিয়ে, পিছন দিয়ে, জাপানীদের সমস্ত যোগাযোগের রাস্তা বিচ্ছিন্ন ক'রে দিলে। তখন জাপানীরা পালাতে শুরু করল, জঙ্গলের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে লাগল, নাগাদের বস্তিতে বস্তিতে ঢুকতে লাগল। কিন্তু নাগারাও তখন জাপানীদের ওপর ক্ষেপে উঠেছে। যে সমস্ত নাগাদের হাতে জাপানী রাইফেল দেখবেন, জানবেন—সে অন্তত একজন জাপানীকেও মেরেছে।"

ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে চলতে চলতে একটা চত্বরে ওরা পৌঁছল। একপাশে একটা পাথরের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা, "হিয়ার দি জ্যাপস ওয়্যার হল্টেড।" ব্যাপারটা বোঝবার জন্যে খগেন একটি নাগা যুবককে ডেকে নিয়ে এলো। সে বললে, এই জায়গাটা হচ্ছে কোহিমার প্রবেশপথ—আর একটু এগিয়ে গেলেই মণিপুর রোড। এখানেই হয়েছিল শেষ লড়াই। আশপাশের গাছগুলো, তার ডালপালা সবই ফিল্ড গানের গুলিতে উড়ে গেছে। টিনের বাড়ীগুলোর দেয়াল থেকে ছাদ পর্যন্ত ঝাঁঝরা হয়ে গেছে বুলেটের গুলিতে।

নাগা যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চলতে অনন্ত জিজ্ঞেস করলে, "লড়াইয়ের সময় তুমি ছিলে কোথায়?"

সে বললে, নাগারা পাহাড় ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না। কোহিমার ডি. সি. যখন শিলঙে বসে জাপানী মাথাপিছু ত্রিশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করছিল, তখন তারা জাপানীদের মেরে গ্রাম পরিষ্কার করে ফেলেছে! যুদ্ধের

সময় পালিয়েছিল যত বিলেতী সাহেব আর বিদেশী বাবুরা।

কোহিমাতে বুঝি এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে সামনাসামনি হাতাহাতি লড়াই না হয়েছে । লড়াই হয়েছে বস্তিতে বস্তিতে, মিলিটারী ক্যাম্পে ক্যাম্পে, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে। রাস্তার ধূলোবালির সঙ্গে মিশে রয়েছে বুলেট—এই দেড় বছর পরেও! চারদিক দেখাতে দেখাতে যুবকটি ওদের নিয়ে গেল মিলিটারী স্টোরে। সেখানে তিনজন অফিসার আর চল্লিশজন সৈনিকের উদ্দেশে একটি স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা রয়েছে। তারপর সে নিয়ে গেল ছোট একটি পার্কের মধ্যে। সেখানেও আছে একটি স্মৃতিস্তম্ভ, নাম-না-জানা সেই সব নাগা শহীদদের উদ্দেশে, যারা জাপানীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল। অমল-হঠাৎ ফুঁসে ওঠে, "ইতিহাসের পাতায় কিন্তু এদের জন্যে একটা আঁচড়ও কাটবে না এই ব্রিটিশরা, কাউকে জানতেও দেবে না—কোহিমার লড়াই জেতার পেছনে এদের কতখানি দান" !

ধীরে ধীরে ওরা এগিয়ে চলেছে চারিদিকে চাইতে, চাইতে নবজাতকের মতো নতুন এই জগৎটাকে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে। এ জগতে জীবনের কোন কথা নেই—নেই বাঁচার কথা—নেই তাদের আশা—আকাঙ্ক্ষার কোন আভাস-ইঙ্গিত। এখানে কেবল মৃত্যুর খবর! মৃত্যুর গৌরব জীবন্ত মানুষদের জীবনবোধকে পরিহাস করছে। সকলেই ওরা মিইয়ে যাচ্ছে, ঝিমিয়ে পড়ছে, চলার তাল শিথিল হয়ে আসছে। দূরে দেখা যাচ্ছে কোহিমা সিমেট্রির বিরাট স্টেডিয়াম্—ধাপে ধাপে তার সাদা সাদা ক্রসের সারি।

সিমেট্রির প্রথম ধাপে পা রেখে অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, অনন্তর একটা হাত চেপে ধরে বললে, "আচ্ছা অনন্ত, এই তো এতদিন মিলিটারীতে রয়েছ, কিন্তু কোনদিন কি তোমার মনে শ্রদ্ধা জেগেছে এই যুদ্ধের ওপর ?"

অনন্ত বললে, "শ্রদ্ধা না করি, ভয় তো করেছি।"

"কিন্তু কেন ?"

"যেহেতু অসহায়, সেইজন্যে। দেখলে না, যুদ্ধ বাঁধল রাজায়-রাজায়, আর প্রাণ গেল আমাদের মতো কাঙালদের।"

অমল যেন মনে মনে কি একটা হিসেব করতে থাকে। হঠাৎ অনন্তর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললে, "তাহলে কথাটা হলো এই—আমরা কাঙাল বলেই কতকগুলো লোক রাজা হয়েছে, আর রাজা আছে বলেই যুদ্ধ বেঁধেছে !"

অনন্ত অমলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর তাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললে, "শেষকালে কি একটা অসুখ বাধিয়ে বসবে অমল !"

সন্থ গাঁথা সিঁড়ি দিয়ে ওরা সন্তর্পণে ওপরে উঠছে। সিঁড়ির দুধারে চওড়া

চওড়া ধাপের মাঝে কাঁচা মাটি, তার ওপর নতুন ঘাস গজিয়েছে। এক একটা ধাপের এক এক অংশ এক একটি রেজিমেণ্টের সৈনিকদের কবর। প্রত্যেকটি কবরের মাথার দিকে একটি ক'রে ক্রস, তার ওপর লেখা সৈনিকদের নাম, রেজিমেণ্টাল নম্বর আর তিনটি অক্ষর—আর· আই· পি·।

খগেন জিজ্ঞেস করলে, "ওই আর· আই· পি· কথাটার মানে কি ?"

অনন্ত বললে "রেস্ট ইন পীস।"

অমল বলে ওঠে, "কি মারাত্মক রসিকতা দেখ !"

খগেন বললে, "তার মানে ?"

"তার মানে, যারা এই মানুষগুলোকে ঘরবাড়ী থেকে টেনে এনে মরতে বাধ্য করল, তারাই আজ সেই অভাগা মানুষগুলোর বুকের ওপর লটকে দিয়েছে রেস্ট ইন পীস-এর লেবেল—যেন মরাটাই হলো চরম ও পরম শান্তি !"

ধাপ ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ওরা উঠছে, ঘুরে ঘুরে দেখছে সেই ডারহামস, ডি· সি· এল· আই, কে· আর· আর· , কিংস ওন রেজিমেণ্ট, কুইনস ওন রেজিমেণ্ট—প্রাইভেট থেকে ব্রিগেডিয়ার। অমলের মনে পড়ে সেই মানুষগুলোর কথা—স্বাস্থ্যবান, সবল, স্বাধীন দেশের মানুষ সেই ব্রিটিশ সৈনিকদের কথা, যারা মাত্র দেড় বছর আগে মণিপুর রোড স্টেশনে এসে নেমেছিল। তারাও কি তাদের দেশে অশান্তি সৃষ্টি ক'রেছিল ? তারাও কি পীস-টাইমে সকলের জন্যে চাকরী চেয়েছিল ? পেট ভরে খেতে চেয়েছিল ? তাই কি আজ তাদের মাটির গর্তে পুঁতে শান্ত করতে হয়েছে ?

খগেন বলে ওঠে, "যাই বলো ভাই, আমার কিন্তু খুব আহ্লাদ হচ্ছে—তবুও তো এতগুলো ব্রিটিশ মরেছে !"

অনন্ত যেন আপন মনেই বলে ওঠে, "আহ্লাদ করে আর লাভ কি ! ব্রিটিশের রাজত্ব এখনও লোপ পায় নি—আর আমাদের ওপর জুলুমও এক তিল কমে নি—মাঝখান থেকে এতগুলো লোক শুধু শুধু মরে গেল—"

শেষ ধাপে ওরা এসে পড়েছে। সামনেই এক বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ। খগেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে থাকে :

হোয়েন ইউ গো হোম
টেল দেম অফ আস
এ্যাণ্ড সে—
ফর দেয়ার টু-মরো
উই গেভ আওয়ার টু-ডে।

খগেন বারবার লেখাটা পড়তে থাকে—তার গলার স্বর ধীরে ধীরে নেমে আসে—আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা ম্লান হয়ে যায়—ব্যথায় ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে।

অনন্ত আর খগেনকে জড়িয়ে ধরে অমল বললে, "হ্যাঁ অনন্ত, আমরা ফিরে গিয়ে সকলকেই বলব—সকলকে বলব, আর না, আর মৃত্যু নয়, যুদ্ধ নয়, আমরা বাঁচব—এরা মরার মুহূর্ত পর্যন্ত চেয়েছিল আমাদের বাঁচাতে।"

উনিশ

কোম্পানি হেড কোয়ার্টার থেকে হুকুম এসেছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোহিমা ডিট্যাচমেণ্ট গুটিয়ে ডিমাপুরে ফিরতে হবে। ছেলেরা কেমন যেন গুম হয়ে গেছে। বারবার তাদের মনে হচ্ছে আবার যেন তারা নতুন ক'রে কোম্পানিতে ফিরছে। জাপান সারেণ্ডার করেছে, তাতে ছেলেদের খুশির অন্ত নেই, কিন্তু আনন্দ করবার জন্যে ছুটি তারা চায় নি। মনে আছে তাদের, জার্মানী-সারেণ্ডার উৎসবের কথা—মদ খেতে অস্বীকার করায় একজনের চোদ্দ দিনের কয়েদ!

স্থনীল বললে, "ফিরছি তো ক্যাম্পে, কিন্তু সেখানে তো দক্ষযজ্ঞ চলেছে—না জানি আমাদের ভাগ্যেও কি লেখা আছে!

খগেন বললে, "ভাগ্যে যা আছে, সেখানে গেলেই দেখতে পাবে—"

"কিন্তু বেশী দিন তো আর নয়, আর তো মাত্র তিনশো চুয়াল্লিশ দিন।"

অনন্ত বলে ওঠে, "দিন গুনলে কি হবে স্থনীল, তার আগে রসটুকু নিঙড়ে ছিবড়েটি বানিয়ে দেবে।"

রবীন তেড়ে ওঠে, "তা ব'লে যা ইচ্ছে তাই করবে—সেটিও হচ্ছে না।"

কনভয় ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকল। ট্রাকের মধ্যে লাফিয়ে উঠে ছেলেরা হৈ হৈ ক'রে উঠল। ক্যাম্পের ছেলেরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এলো অভ্যর্থনা জানাতে, কোলাকুলি করতে লাগল সকলে সকলের সঙ্গে, ছুটোছুটি ক'রে চা নিয়ে এলো তাদের জন্যে। হঠাৎ নায়েক রামজীবনের 'ডবল আপ' হাঁক শুনে কোহিমা-ফেরত ছেলেরা ঘুরে দাঁড়ায়। প্রায় দশটি ছেলে মাথার ওপর হাত তুলে পিঠঠু প্যারেড করছে। দুপুর রোদে গলগল ক'রে ঘামছে, হাঁ ক'রে নিঃশ্বাস নিচ্ছে—মাথাগুলো তাদের পায়ের তালে তালে লটপট করছে।

নায়েক রামজীবন আবার হাঁকল, "ডবল মার্ক টাইম—"

কয়েদীরা আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেও মাটি থেকে ছ'ইঞ্চি ওপরে পা তুলতে পারছে না, শরীরটা তাদের ক্রমেই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। হঠাৎ সুবেদার নন্দী গাছের ছায়া থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে এসে ছড়ি নেড়ে বলতে থাকেন, "টাং ঔর উপর উঠাও—ঔর—ঔর—"

খগেন পাঁচকড়িকে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা কি ?"

অমল, খগেন আর অনন্তকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে পাঁচকড়ি বললে, "তোমরা ফিরে এসেছ—আমি যেন বাঁচলুম, আর পারছি না ভাই—"

অমল বললে, "সব কথা খুলে বলো পাঁচকড়ি—"

পাঁচকড়ি বললে, "মেজর নেলসন অর্ডার দিয়েছে, যে-যে এন. সি. ও. সপ্তাহে অন্তত তিনজনকে অর্ডারলি রুমে পেশ করতে না পারবে, একমাসের মধ্যে তাদের র‍্যাংক চলে যাবে।"

খগেন বললে, "তাই এন. সি. ও-রা বুঝি র‍্যাংক বজায় করছে ?"

পাঁচকড়ি বললে, "তা করছে বটে, কিন্তু সকলে নয়। ল্যান্স-নায়েক দত্তর র‍্যাংক চলে গেছে, সিক এন. সি. ও. হাবিলদার ব্যানার্জিরও ওই একই হাল, জমাদার রামকিষণ ট্রান্সফারের জন্যে দরখাস্ত করেছে। আর এদের জায়গায় বি. ও. আর. দের এন. সি. ও. করা হয়েছে—"

অনন্ত বললে, "চালটা দেখছি নতুন !"

পাঁচকড়ি বলে চলে, "তা নতুনই বটে ! কিন্তু তার জন্যে ক্যাম্পের সমস্ত ব্যবস্থাও নতুন হয়ে উঠেছে। ঠিক ছটার মধ্যে মশারি না ফেললে সাতদিন কয়েদ। মশারিতে যদি একটা ফুটো থাকে তাহলে তিন দিন, আর এটা বাড়বে ফুটো-প্রতি তিন দিন হিসেবে। মুখে-হাতে যদি এ্যান্টি-ইনসেক্ট-ক্রীম না মাখো, তাহলে পাঁচদিন—সন্ধ্যে হলেই এন. সি. ও-রা ছেলেদের গালে হাত বুলিয়ে মুখ শুঁকে বেড়াবে। প্যারেডে ফল্ ইন করতে দেরী করলে মিনিট-প্রতি তিন দিন। দাড়ি ঠিক মতো কামানো না হলে তিন দিন। বিনা হুকুমে ক্যাম্পের বাইরে গেলে চোদ্দ দিন, কোন এন. সি. ও-র হুকুম না মানলে আঠাশ দিন, আর ভি. সি. ও-র অবাধ্য হলে ফিল্ড পানিশমেণ্ট—"

খগেন চোখ কুঁচকে পাঁচকড়ির ক্লান্ত মুখখানার দিকে চেয়ে বললে, "এটা কি শেষ মহড়া নাকি ?"

ম্লান হেসে পাঁচকড়ি বললে, "আর এ সবের ওপর অন্তরীক্ষে ভগবানের মতো কাজ করছে তিনজন বি. ও. আর. সিকিউরিটি এন. সি. ও। তারা রিপোর্ট করে খোদ মেজর সাহেবের কাছে, আর তাদের রিপোর্টের ওপর ভি. সি. ও-র

কমিশনও ঘুচে যেতে পারে।"

অমল বললে, "তারপর ?"

"শুনছি তো রিলিজ রোল তৈরি করার হুকুম এসে গেছে। আমাদের কোম্পানি এখন স্ট্যাণ্ড-বাই, যে কোন দিন নাকি মুভ করতে পারি—"

খগেন বললে, "এটা তাহলে একটা সুখবর, কি বলো ?"

"সব খবরই চাপা পড়ে গেছে খগেন, এদের জুলুমের ঠেলায়। আজকে মনে হচ্ছে, কোম্পানির এ অবস্থাকে বদলাতে যদি না পারি, তাহলে বোধহয় আমরা রিলিজও হতে পারব না।"

মোটঘাট নামিয়ে, ফেটিগ শেষ ক'রে কোহিমা-ফেরত ছেলেরা আবার যে-যার ব্যারাকে এসে ওঠে। সুনীল শিবেনকে জিজ্ঞেস করলে, "রেলের কাজ কি একেবারে শেষ হয়ে গেছে ?"

শিবেন বললে, "আর রেলের কাজ! আমাদের দফাই শেষ। কেবল তিনজন স্টেশন মাস্টার মিলিটারী সংক্রান্ত কাজগুলো দেখাশুনা করে। বাকী সমস্ত ছেলে প্যারেডে। তোরা তো তবুও কটা দিন মজা লুটে এলি !"

স্বরাজ বললে, "একটা নতুন জিনিস দেখিস নি তো ? কোম্পানিতে হাসপাতাল হয়েছে। সেখানে সব হাত ভাঙ্গা, পা মচকানো, মাথায় চোট লাগা রুগীরাই আছে। পাছে বড় হাসপাতালের ডাক্তাররা জানতে পেরে এই সব প্রোগ্রাম বাতিল ক'রে দেয়, সেই ভয়ে মেজর নেলসন আর সুবেদার নন্দী মতলব করেছে, প্যারেডের মাঠে যেসব এ্যাকসিডেণ্ট হবে, তাদেরও পুরে রাখবে কোম্পানির ওই হাসপাতালটিতে !"

সুনীল বললে, "এমন কি প্যারেড বাবা, যে রোজ এত এ্যাকসিডেণ্ট !"

স্বরাজ বললে, কালই বুঝতে পারবে। এদের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, অক্ষত শরীরে আর কাউকেও বাড়ী ফিরতে দেবে না।"

সুনীল বললে, "কিন্তু মোদ্দা কথাটা কি ! কেন এরা এমন করছে ?"

স্বরাজ বললে, "আর কেন ! লড়াইয়ে জিতে ওদের ল্যাজ হয়ে গেছে মোটা —এইবার এক পক্কড় দেখে নিচ্ছে—"

শিবেন বললে, "হেড কোয়ার্টারসে আমাদের কোম্পানির নাকি ভীষণ বদনাম হয়েছে। সেখান থেকে নেলসনের কাছে কড়া চিঠি এসেছে—আমাদের জন্যে নাকি আশেপাশের কোম্পানিগুলোও বিগড়ে যাচ্ছে—"

স্বরাজ গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললে, "শোন তবে আসল কথা— ভয়ে বাছাধনদের পিলে চমকে গেছে। ৩৩৩ কোম্পানিতে বিদ্রোহ হয়ে গেছে—

কোম্পানির সবক'টা অফিসারকে রাতারাতি দিয়েছে সাবড়ে—"

ব্যারাকে ফিরে বিস্তারা লাগিয়ে ছেলেরা চিঠি লিখতে বসেছে। রিলিজ রোল তৈরির খবর সকলেই পেয়েছে। সেই সুখবরটি দেওয়ার জন্যে বাড়ীতে চিঠি লেখার ব্যগ্রতা আর বাধা মানে না। একটি ছেলে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কি রে, কি লিখব, আর কতদিনের মধ্যে বাড়ী ফিরছি ?"

সন্তোষ বললে, "ফিরতে আর হচ্ছে না বাছাধন, প্রাণটাকে এইখানেই রেখে যেতে হবে।"

"কেন ?"

"কালই বুঝতে পারবে—পি. টি. প্যারেডের নমুনা তো এখনো দেখ নি।"

"আরে হ্যাঃ, জার্মানি, জাপানীরাই খতম হয়ে গেল, আর এ শালারা কোন ছার—এইবার এই শালাদের খতম করার পালা।"

সন্তোষ উঠে এসে ছেলেটির কানে কানে ফিসফিস ক'রে বললে, "শুনেছিস ৩৩৩ কোম্পানির খবর ?"

"সে আর শুনি নি—কাজ তো শুরু হয়ে গেছে—"

অর্ডারলি এন. সি. ও. বলে গেল, "কোহিমা থেকে যারা ফিরেছ, তারা পাঁচ মিনিটের মধ্যে সুবেদার সাহেবের ঘরের সামনে ফল্ ইন—"

কোহিমা-ফেরত ছেলেরা গিয়ে দাঁড়াল। সুবেদার সাহেব বললেন, "কোহিমাতে তোমরা খুব ভালোভাবে ছিলে শুনে আমি খুশি হয়েছি। তোমরা শুনেছ বোধহয় রিলিজ রোল তৈরি হচ্ছে, কিন্তু সেই আনন্দে কোম্পানিটাকে বাড়ী বানিয়ে তুলো না। আমি চাই না কাউকেও আটক রাখতে। কিন্তু আমি সাফ বলে দিচ্ছি, কোনরকম গণ্ডগোল আমি বরদাস্ত করব না। মেজর সাহেবও বলেছেন, স্যাপারদের তরফ থেকে একতিল বেয়াদপি বরদাস্ত করবেন না। যদি সত্যিই তোমরা বাড়ী ফিরতে চাও, তাহলে মুখটি বুজে কোম্পানির ডিসিপ্লিন মেনে চলো।"

সুবেদার সাহেবের বক্তৃতা শুনে অমলের মনে হয়, তিনি যা বলেছেন—তা যেন একটা চ্যালেঞ্জ ! কোম্পানিটা যেন পরিষ্কার ছুটি দলে ভাগ হয়ে গেছে। একদল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, মুখ বুজে তাদের হুকুম তামিল করতে হবে। আর অন্য দল, শান্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেও বিক্ষুব্ধ না হয়ে পারছে না। অমল ভাবে, এই ছুইয়ের মাঝামাঝি কি কোন রাস্তা নেই !

অমল দেখে অফিসারদের পেছনে রয়েছে গভর্নমেন্ট, সামরিক বিভাগ, গোলাবারুদ, সব কিছুই তাদের মুঠোর মধ্যে। আর স্যাপারের দলে শুধু অনেক

গুলো মানুষ। কিন্তু তাদের অবস্থাটা কি! বহির্জগত থেকে তারা বিচ্ছিন্ন—তাদের নিজেদের মধ্যেই অজস্র বিভাগ! প্রথমেই রয়েছে অফিসারদের কৃপাপুষ্ট ভি. সি. ও. আর এন. সি. ও-র দল—সকলেই তারা নির্মম নয়, তবুও তারা ওই অফিসারদের হাতে কলের পুতুল। তারপর রয়েছে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের দল, ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক—শেষ পর্যায়ে এসে আজ এদেরই ওপর কোম্পানির সিকিউরিটির ভার দেওয়া হয়েছে। তারপরও রয়েছে সেন্সরশিপের ধারালো কাঁচি—সেই কাঁচির ধারে তাদের মনের সমস্ত খবর, সমস্ত ব্যথা-বেদনা ছেঁটে ফেলে, তাদের পোশাকটাকেই দুনিয়ার চোখে তুলে ধরা হয়েছে। তাই আগস্ট আন্দোলনের সময়ে তারা আখ্যা পেয়েছে 'দেশের শত্রু'—দুর্ভিক্ষের সময় দেশের লোক মনে করেছে—তাদেরই আরাম আর ফুর্তির জন্যেই মরেছে লাখে লাখে মানুষ খেতে না পেয়ে। সাধারণ মানুষ জেনেছে—তারা বর্বর, তারা পশু, তাদের মধ্যে মানবীয় কোন বৃত্তি নেই!

কিন্তু কোম্পানির মধ্যে এত উত্তেজনা, এত ধৈর্যচ্যুতি আর কখনো সে দেখে নি। আসন্ন একটা দুর্যোগ যেন মাথার ওপর খাঁড়ার মতো ঝুলছে। পাঁচকড়ি আর সাদেক লাইট-আউট-এর পর চুপিসাড়ে অমলের বিছানায় এসে বসল। পাঁচকড়ি বললে, "৩৩৩ কোম্পানির খবর শুনেছ অমল?"

অমল আঁতকে উঠে বলে, "শুনেছি, কিন্তু কেন?"

সাদেক বলে, "আপনি বলুন অমলবাবু, দিই শালাদের সাবাড় ক'রে।" তার ঠোঁট দুটো বারকয়েক কেঁপে উঠে থেমে যায়, সমস্ত শরীর তার থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে। সাদেক বললে, "কি অমলবাবু, ডর লাগছে?"

"হ্যাঁ সাদেক, আমার খুব ডর লাগছে। আমি ভেবে ঠিক করতে পারছি না, কি করলে এ অবস্থার শেষ হয়।"

পাঁচকড়ি বললে, "তাহলে?"

"সেই কথাই বারবার ভাবছি। আজ বারবার জয়ন্তর কথা মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে, সে থাকলে বোধহয় একটা রাস্তা বাতলাতে পারত।"

সাদেক বললে, "তা ব'লে কি আমরা পড়ে পড়ে মার খাব?"

"নিশ্চয়ই না, কক্ষণো না—এ অবস্থাকে আমরা বদলাবই। কিন্তু একা একা কেউ কিছু করতে যেও না। সেদিন আমিও ভেবেছিলাম, কয়েদ মেনে নিয়ে আমি যে আত্মত্যাগ করলাম, তার মধ্যে দিয়ে কোম্পানিতে আসবে সুবিচার। কিন্তু সেদিন তুমিই আমার চোখ খুলে দিয়েছিলে সাদেক। কোম্পানির সমস্ত ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে লড়তে হবে—তবেই আমাদের জয়।"

কুড়ি

পরদিন সকালে যথারীতি পি. টি. হলো, কিন্তু নমুনাটা একটু অন্য ধরনের। প্রথমত মাইল দুয়েক একদমে দৌড়ে আসা—তার মধ্যে জনদুই অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর দুটো গাছের ডালে দড়ি বেঁধে, সেই দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে নালা পার হওয়া। বয়লার মেকার শশধর পড়ে গিয়ে হাতে চোট খেয়েছে। তার ডান হাতটা ধনুকের মতো বেঁকে গেছে।

পি. টি. ব্রেক-অফের সময় সুবেদার সাহেব ঘোষণা করলেন, "মেজর সাহেব খুশি হয়ে তোমাদের জন্যে একটা সুইমিং পুল মঞ্জুর করেছেন। সেই সুইমিং পুলের কাজ আজ থেকেই শুরু করতে হবে। আমি কথা দিয়েছি, এক সপ্তাহের মধ্যেই হয়ে যাবে। এই এক সপ্তাহ প্যারেড মাফ।"

ব্যারাকে ফিরতে ফিরতে একজন মন্তব্য করে, "প্যারেড তো মাফ, এদিকে কোদাল চালাতে চালাতে যে বাঁধন ছিঁড়ে যাবে। আসলে, শালারা আমাদের শাস্তি দিচ্ছে।

আর একজন বললে, "সুইমিং পুল আমাদের জন্যে হচ্ছে—না আর কিছু! ওখানে তো মেজর সাহেব তাঁর গোপিনীদের নিয়ে জলকেলি করবেন, আর আমরা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে দেখব।"

সুইমিং পুলের কাজ শুরু হলো। মাপ-জোক ক'রে, পেগ পুঁতে, দড়ি বেঁধে সীমানা ঠিক হলো। মাটি কাটার জন্যে আই. টি. এ. লেবার ক্যাম্প থেকে এল একশোটা কোদাল আর একশোটা ঝুড়ি। খগেন সকলের কানে কানে বলে গেল, "কোদালটা কেবল মাটিতে ঠুকবি, কিন্তু মাটি কাটবি না।" কোদালের কোপ পড়ছে ঘন ঘন, কিন্তু মাটিতেও এক ইঞ্চির বেশী ফলা বসছে না। হাবিলদার সাহব বললে, "কাটতে যখন হবেই, তখন যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে পার ততই ভালো।"

কে একজন বলে উঠল, "তাহলে যে মেজর সাহেব আরও বেশী খুশি হয়ে একটা নদী মঞ্জুর ক'রে বসবেন!"

সুবেদার সাহেব সাইকেল চড়ে সমস্ত ক্যাম্প এলেকায় যাবতীয় কাজ তদারক ক'রে বেড়াচ্ছেন। রোদে তাঁর মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। সুইমিং পুলের সামনে এসে সাইকেল থেকে নেমে বললেন, "এইভাবে কাজ চললে সাতদিন ছেড়ে সাত মাসেও কাজ শেষ হবে না।"

ফায়ারম্যান রহমান সেদিন সিক প্যারেডে ফল্-ইন করেছিল। কিন্তু মেজর সাহেবের হুকুম ১০০ ডিগ্রীর নীচে জ্বর হলে কাউকেও 'বি ডিউটি' (লাইট ডিউটি অর্থাৎ হাল্কা কাজ) দেওয়া হবে না। তাই রহমানকে ইউনিট মেডিক্যাল অফিসার দিয়েছেন এম এ্যাণ্ড ডি (মেডিসিন এ্যাণ্ড ডিউটি, অর্থাৎ ওষুধ খেয়ে কাজ)। কিন্তু রোদের তাপে রহমানের জ্বর বেড়ে যায়। ছেলেরাই তাকে বসিয়ে দেয়। সুবেদার সাহেব তার দিকে তেড়ে গিয়ে বললেন, "এই, তুই যে দিব্যি মজাসে বসে আছিস ?"

রহমান উঠে এ্যাটেনশান হয়ে বললে, "শরীরটা বড় খারাপ লাগতেছে, তাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম স্যার—"

"জিরিয়ে নিচ্ছিলে ? কে তোকে জিরোবার হুকুম দিয়েছে ?"

"হুকুম আর কি নেব—একটু জিরিয়ে আবার তো কাম করব—"

"কাম করবে ! নিজের মর্জিমাফিক কাম করবে নাকি ?" হঠাৎ সুবেদার সাহেব তার ঘাড়টা চেপে ধরলেন। রহমানের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে। সুবেদার সাহেবের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখে, সে তার কোদালটার দিকে যাওয়ার জন্যে পা তুললে। সুবেদার সাহেব তার ঘাড়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বললেন, "ওসব চোখ রাঙানি আমাকে দেখাস নি, বুঝলি ? তোদের চোখ রাঙানিকে আমি বুটের তলায় রাখি।"

রহমান ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, "ও বুট আমারও পায়ে আছে—"

"কি ?" সুবেদার সাহেব তেড়ে গেলেন রহমানের দিকে ঘুঁষি পাকিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠে রহমানকে আগলে দাঁড়াল।

সাদেক সুবেদার সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে, "মিলিটারীতে সকলেরই পায়ে বুট আছে স্যার—"

নানান দিক থেকে কলরব ফেটে পড়ে, "দে না শালাকে বুটটা দেখিয়ে।"

"হাত তুলে দেখুক তো একবার, শালার বাপের নাম ভুলিয়ে দেব—"

"দে না শালার খুলিটা ফাটিয়ে সুইমিং পুল বানিয়ে—"

সুবেদার সাহেব বিস্ফারিত চোখে ছেলেদের মুখের দিকে চেয়ে আছেন। ক্রমেই ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে উঠছে—রাশ তাদের আলগা হয়ে আসছে। পেছন থেকে তাঁর কানের পাশে একজন বলে উঠল, "নেলসনের কুত্তার সঙ্গে অত কথার দরকার কি—দাও ৩৩৩ কোম্পানি বানিয়ে—"

সুবেদার সাহেব আর ঘাড় ফেরালেন না, দৌড়ে গিয়ে সাইকেলটায় লাফিয়ে উঠলেন। পেছন থেকে ছেলের দল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। জনদুয়েক এন.

সি· ও· এতক্ষণ ভিড়ের মাঝখানে ঘাপটি মেরে ছিল, বললে, "তোমরা বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি ক'রে বসলে—"

একটি ছেলে বলে উঠল, "তোমাদের কোন ভয় নেই নায়েক সাহেব—ও শালাদের আমরাই শায়েস্তা করব।"

কোদাল ফেলে ছেলেরা জটলা শুরু ক'রে দিয়েছে। কিছুক্ষণ বাদে হাবিলদার সরকার এসে ছুটি দিয়ে দিলে। একজন বলে উঠল, "দেখলি তো, শালারা ভয় পেয়ে গেছে। বুঝলি না, যেমন কুকুর—তেমন মুগুর।"

ছুটি পেয়ে যাওয়ায় ছেলেরা ভীষণ খুশি। তাই ব্যারাকে বসে না থেকে কেউ কেউ স্নান করতে গেছে, কেউ গেছে কাপড়ে সাবান দিতে, কতক গেছে চুল ছাঁটতে—এমনিভাবে ছেলেরা পড়েছে ছড়িয়ে। এরই এক ফাঁকে হাবিলদার সরকার রহমানকে ডেকে নিয়ে গেছে অফিসে। খবর পেয়ে অমল, সাদেক, পাঁচকড়ি, স্বরাজ সকলেই গুম হয়ে বসে আছে। পর পর দুজন সিকিউরিটি এন· সি· ও· তাদের সামনে দিয়ে ঘুরে গেছে।

স্বরাজ বললে, "শালারা আমাদের ওপর নজর রাখছে।"

খগেন বললে, "তাহলে নিশ্চয়ই রহমানকে ফাঁসাবে।"

পাঁচকড়ি খেঁকিয়ে ওঠে, "তা না তো রহমানের ওপর খুশি হ'য়ে তাকে ল্যান্স-নায়েক বানাবার জন্তে নিয়ে গেছে নাকি?"

একজন কোয়ার্টার গার্ড সেণ্ট্রি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিলে, "রহমানকে আঠাশ দিনের ফিল্ড পানিশমেণ্ট দিয়েছে। অর্ডারলি রুমে রহমানকে ভীষণ মেরেছে। এখনও তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে।"

সাদেক বললে, "রহমানের ফিল্ড পানিশমেণ্ট আমরা হতে দেব না।"

অনন্ত বললে, "কেমন ভাবে?"

অমল বললে, "রহমানকে আমরা ছিনিয়ে আনব—"

পাঁচকড়ি লাফিয়ে উঠল, "ঠিক হ্যায়—আজই একটা হেস্তনেস্ত—" সেণ্ট্রিকে বললে, "তোমরা কি করবে?"

সেণ্ট্রির চোখদুটো চকচক ক'রে ওঠে, সে বললে, "গার্ড কমাণ্ডার বাদে সেণ্ট্রি আর কয়েদী মিলিয়ে আমরা একুশজন আছি।"

রহমানের ফিল্ড পানিশমেণ্ট—বেলা একটার সময়। রহমানকে শাস্তি দিয়ে মেজর নেলসন কোম্পানিতে একটা নমুনা খাড়া করতে চান, কোম্পানির

ছেলেদের শায়েস্তা করতে চান, আবার ডিসিপ্লিন ফিরিয়ে আনতে চান।

খেতে বসেছে ছেলেরা ডাইনিং হলে—লাইন বেঁধে পাশাপাশি। একটি ছেলে বলে, "কেন, ডিসিপ্লিন কি কোম্পানিতে নেই নাকি?"

তার পাশের ছেলেটি জবাব দেয়, "কোথায় আর ডিসিপ্লিন! আমরা যদি পোকা-মাকড়ের মতো ওদের বুটের তলায় পড়েই না রইলুম, তবে আর ডিসিপ্লিনটা কোথায়!

ফিসফিসানি চলেছে সর্বত্র। সকলেই শুনেছে রহমানের ফিল্ড পানিশমেণ্টের কথা। একজন জিজ্ঞেস করলে, "ফিল্ড পানিশমেণ্টটা আবার কি রকম?"

তার সাথী জানালে, "অফিসের কেরাণীবাবুরা বলেছে, এমন কিছুই নয়—কেবল একঘণ্টা দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখবে।"

ছেলেটি মুখে ভাত তুলতে যাচ্ছিল, আতঙ্কে তার হাত কেঁপে উঠল, ভাতগুলো ঝরঝর ক'রে মাটিতে পড়ে গেল। বললে, "তার মানে তো ফাঁসি! যাঃ, সে হতেই পারে না—শুধু শুধু রহমানকে এত কড়া শাস্তি দিতেই পারে না। হাজার হোক এরা মানুষ তো!"

সাথী তার ফুঁসে ওঠে, "এখনও এদের মানুষ মনে করিস? এরা মানুষ নয়—এরা অফিসার। আমরা খেটে মরি—এদের প্রমোশন হয়। আমরা প্রাণ দিই—এরা বীরত্বের মেডেল পায়। আর আমরা মাথা উঁচু করলে বুটসুদ্ধ লাথি মেরে আমাদের মাথা থেঁতলে দেয়।"

সুবেদার সাহেব একটা হাণ্টার হাতে খাওয়া পরিদর্শন করতে এসেছেন। সারবাঁধা ছেলেদের সামনে দিয়ে তিনি গটমট ক'রে হেঁটে চলে যান। রবীন কটমট ক'রে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। আমিন তাকে ঠেলা মেরে বললে, "কি রে, চোখ দিয়ে যে তুই গিলে ফেলবি দেখছি।"

রবীন বললে, "আমার কি ইচ্ছে করছে জানিস? ইচ্ছে করছে, লাফিয়ে ওই শালা কুত্তার টুঁটিটা কামড়ে ধরি—মবারকের যতটা রক্ত মাটির ওপর পড়েছিল, ঠিক ততটা চুষে নিয়ে মবারকের কবরের ওপর ছড়িয়ে দিই—"

খগেন ভাতের প্লেট নিয়ে রবীনের সামনে এসে বললে, "রবীন, রহমানের ফিল্ড পানিশমেণ্ট আমরা হতে দেব না—তাকে আমরা ছিনিয়ে আনব।"

সুনীল কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল। মুখটা তার ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। খগেনকে ডেকে বললে, "কি দরকার খগেন এতসব ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার! ঘরে ফিরবার দিন তো এগিয়ে এসেছে—আর এই ক'টা দিন কোনরকমে মুখ বুজে কাটিয়ে দিলে হয় না?"

খগেন কোন উত্তর না দিয়ে রবীনের কাছে ফিরে গিয়ে বললে, "সুনীলের ওপর নজর রাখবে রবীন, ভয় পেয়ে ও সমস্ত কথা ফাঁস ক'রে দিতে পারে।"

গার্ডরুম থেকে একজন সেন্ট্রি এসেছে ভাত নিতে। জনকয়েক তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করলে, "রহমান কেমন আছে রে?"

সেন্টি বললে, "রহমান চাঙ্গাই আছে। ভুলিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল অফিসঘরের মধ্যে। অনেক কথাই রহমানকে জিজ্ঞেস করেছে—ও কিন্তু একটা কথাও বলে নি। তাইতে ক্ষেপে গিয়ে মেজর সাহেব আর সুবেদার সাহেব দুজনে মিলে রহমানকে মেরেছে—এমন মেরেছে যে তার মুখ দিয়ে রক্ত ছুটেছে, তার দাঁতগুলো সব নড়বড়ে হয়ে গেছে। জানিস, রহমান ভাতের থালা মুখের সামনে নিয়ে ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলেছে—একমুঠো ভাতও মুখে দিতে পারে নি!

যারা শুনল, তারা স্তম্ভিত হয়ে সেন্ট্রির মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল। তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠল, "রহমান যখন খেতে পারে নি, তখন আমরাও খাব না। আগে এর একটা বিহিত করব—তবে ভাত মুখে দেব।"

হুড়মুড় ক'রে অনেকগুলো ছেলে ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে অফিসঘরের দিকে চলতে থাকে। পাঁচকড়ি তাদের বলে, "আর একটু অপেক্ষা কর ভাই—বেলা একটা পর্যন্ত—তারপর রহমান আমাদেরই সঙ্গে বসে খাবে—রহমানকে আমরা ছিনিয়ে নিয়ে আসব।"

সমস্ত কোম্পানিটা যেন ফুঁসে গর্জে উঠছে। খাওয়ার পালা শেষ ক'রে ছেলেরা ব্যারাকে ফিরেছে—তখনও প্রায় একঘণ্টা বিশ্রাম নেওয়ার সময় আছে। তবুও ছেলেরা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছে না, আরাম ক'রে শুতে পারছে না। কখনো বসছে, কখনো শুচ্ছে, আবার তখনই উঠে ব্যারাকের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত টইল দিচ্ছে।

কোয়ার্টার গার্ডের পেটা ঘড়িতে একটার ঘণ্টা পড়ল—ছেলেরাও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একজন দু'জন ক'রে ছেলেরা একে একে এক আর তিন নম্বর ব্যারাকে এসে জমা হচ্ছে। ওখান থেকে প্যারেড গ্রাউণ্ডের সবটাই দেখতে পাওয়া যায়।

মেজর নেলসন, সুবেদার নন্দী, হাবিলদার সরকার প্যারেড গ্রাউণ্ডের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। নায়েক রামজীবন রহমানকে কোয়ার্টার গার্ড থেকে নিয়ে আসছে। গার্ড কমাণ্ডার আসছে দড়ি-দড়া নিয়ে।

ছেলেরা দু'চোখ বিস্ফারিত ক'রে দেখছে রহমানকে—তাদের অতি আপনার জন রহমান। রহমানের সমস্ত মুখটা ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো তার টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। তবুও রহমান মাথা উঁচু ক'রে হেঁটে আসছে। না—না, রহমান ভয় পায় নি, ঘাবড়ে যায় নি—রহমান বোধহয় জানতে পেরেছে, আজ আর সে একা নয়। কোম্পানির প্রতিটি সাধারণ সৈনিক আজ তার ফিল্ড পানিশমেণ্ট প্রতিরোধ করবে—তারা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে—ফিরিয়ে নিয়ে আসবে তাদের গরম বুকের মধ্যে।

রহমানকে বাঁধাবাঁধির কাজ শুরু হয়ে গেছে। নির্জীব রহমান শুধু বার-কয়েক ব্যারাকগুলোর দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে। তার চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে—চোখ দুটো জ্বালা করতে শুরু করেছে।

নায়েক রামজীবন রহমানের হাত দুটো পিছমোড়া ক'রে গোলপোস্টের সঙ্গে বেঁধে দিলে। সুবেদার সাহেব এগিয়ে গিয়ে উদ্বৃত্ত দড়িটুকু দিয়ে রহমানের সমস্ত শরীরটা গোলপোস্টের সঙ্গে জড়াতে শুরু করলেন।

মেজর নেলসন নিঃশেষিতপ্রায় সিগারেটটা মাটিতে আছড়ে ফেলে, সুবেদার সাহেবের হাত থেকে দড়িটা টেনে নিয়ে বললেন, "এইসা নহি সুবেদার সাব—" বলে রহমানের গা থেকে দড়ির পাকগুলো খুলে ফেললেন। হাত দুটো পিছ-মোড়া ক'রে বাঁধা অবস্থায় টানতে টানতে গোলপোস্টের মাঝখানে নিয়ে গেলেন। ক্রস-বারের ওপর দড়িটা ছুড়ে দিয়ে বললেন, "হ্যাং দি ব্লাডি রোগ—"

সুবেদার সাহেব রহমানের পিছমোড়া বাঁধন খুলে, হাত দুটো মাথার ওপর জোড়া ক'রে বেঁধে দিলেন। ক্রস-বারের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়া দড়ির প্রান্তটা ধরে একটা টান দিয়ে মেজর নেলসন বললেম, "পুল—নন্দী—"

দড়িটা ধরে সুবেদার সাহেব টানতে লাগলেন। রহমানের শরীরটা সোজা টান টান হয়ে গেল—কিন্তু মাটির ওপর উঠল না।

মেজর নেলসন রহমানের সামনে এসে বললেন, "জাম্প—কুদো—"

নায়েক রামজীবন আর সুবেদার নন্দী পেছন দিকে হেলে পড়ে দড়িটা ধরে টানছেন। যন্ত্রণায় রহমানের মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠেছে—সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে।

মেজর নেলসন স্টাফটা নেড়ে মারতে যাওয়ার ভঙ্গিতে ধমক দিলেন, "আই সে, জাম্প—ব্লাডি তুম জলদি কুদো—"

রহমান লাফ দেওয়ার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না—সমস্ত শরীরটা তার থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। হাবিলদার সরকার ঠোঁট কামড়ে এক ধারে দাঁড়িয়ে

আছে। মেজর সাহেব তাকে ধমক দিলেন, "ক্যা, মজা দেখ তা? লিফ্‌ট হিম এবভ দি গ্রাউণ্ড—"

তিনজনে মিলে দড়ি ধরে টানছে। মনে হলো, রহমানের শরীরটা যেন আরও খানিকটা ওপরে উঠে গেল, কেবল পায়ের ডগাটা তখনো মাটিতে ঠেকে আছে। মেজর নেলসন স্টাফটা দিয়ে রহমানের পেটে একটা গুঁতো মেরে বললেন, "ব্লাডি তুম নহি ছুদেগা তো ম্যায় তুমকো ডাণ্ডা লাগায়গা—

রহমান আরও একবার চেষ্টা করলে। চেষ্টার নিদর্শন স্বরূপ তার দেহটা কেবল নড়ে উঠল। মেজর নেলসন তেড়ে গিয়ে তার হাঁটুর ওপর স্টাফ দিয়ে একটা ঘা বসিয়ে দিলেন। রহমান আর্তনাদ ক'রে উঠল, "ওঃ মা—"

স্থনীল বলে উঠল, "না—না, বসে বসে আর এ দৃশ্য দেখা যায় না—"

রবীন মুহূর্তের জন্যেও স্থনীলের পাশ থেকে নড়ে নি—দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "দেখতে ভালো না লাগে তো চোখ বুজিয়ে থাকুন।"

স্থনীলের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে, তার সমস্ত শরীর থরথর ক'রে কাঁপছে, অস্বস্তিতে সে ছটছট করছে। বারবার সে রহমানের দিকে তাকাচ্ছে, আবার তখনই ব্যারাকের মধ্যে ছেলেদের মুখের দিকে লক্ষ্য করছে।

গোল পোস্টের ক্রস বারটা ধনুকের মতো বেঁকে গেছে। মেজর নেলসন স্থবেদার সাহেবকে তাড়া দিয়ে উঠলেন, "নন্দী, জোরসে খিঁচো—

স্থবেদার নন্দী মাটিতে গোড়ালি লাগিয়ে, পেছন দিকে হেলে পড়ে এক হেঁচকা দিলেন। রহমানের শরীরটা মাটি ছেড়ে ওপরে উঠে গেল। রহমানের আর্তনাদ সমস্ত ক্যাম্পটাকে বিদীর্ণ ক'রে ফেললে, "উঃ মা—গো!"

স্থনীল মাচা থেকে লাফ মেরে নেমে পড়ল। রবীনের হাত ধরে টানতে টানতে বললে, "আর দেরী করছ কেন! চলো, শীগগির চলো—"

তিন নম্বর ব্যারাক থেকে আওয়াজ উঠল, "ব্রিটিশ—ভারত ছাড়।"

সঙ্গে সঙ্গে বাকী সবকটা ব্যারাক থেকে আওয়াজ ফেটে পড়ল, "ব্রিটিশ—ভারত ছাড়।" প্রত্যেকটা ব্যারাক থেকে আওয়াজ উঠছে, ছেলেরা উল্কার মতো দৌড়চ্ছে প্যারেড গ্রাউণ্ডের দিকে। মাঠের মাঝখানে সমস্ত কোম্পানিটা বজ্রনিনাদে ঘোষণা করল, "ব্রিটিশ—ভারত ছাড়।"

উন্মত্ত ছেলেরা রহমানকে ঘিরে ধরেছে, তুলে ধরেছে তাদের বুকের ওপর, চেপে ধরেছে তাদের গরম বুকের মাঝখানে। হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে দড়িটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলেছে, সকলে মিলে দিয়েছে তাতে আগুন লাগিয়ে। গোলপোস্টের বাঁশগুলো টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়েছে।

রহমানের সংজ্ঞাহীন দেহটাকে বুকের ওপর নিয়ে মাঠময় ছুটোছুটি করছে, লাফাচ্ছে, নাচছে, হাসছে, কাঁদছে, চেঁচাচ্ছে, চিৎকার করছে···

সমস্ত কোলাহলে ছাপিয়ে মেজর নেলসনের আর্তনাদ ভেসে উঠল, "সুবেদার সাব, সেভ মি—"

সুবেদার নন্দী দৌড়চ্ছেন, উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছেন কোয়ার্টার গার্ডের দিকে। গেটের সামনে পৌছতেই সেন্টি তার সমস্ত শক্তি গলায় ঢেলে দিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল, "হল্ট—"

———